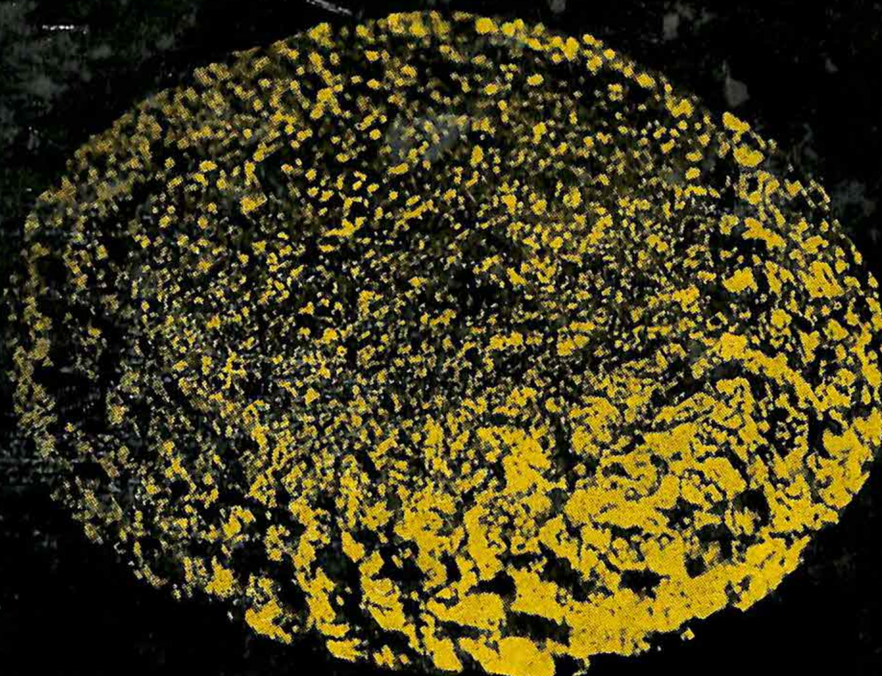
সাধন দাশগুপ্ত



আলো আরও আলো

আলো আরও আলো

সাধন দাসগুপ্ত

প্রত্যয় প্রকাশ
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
১৭/২, জয়দেব কুণ্ডু লেন, হাওড়া—৭১১১০১

বিক্রয় কেন্দ্র ঃ
শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯

ALO ARO ALO

A Saga of Physics

প্রথম প্রকাশ : দীপাবলী ১৯৭৬
দ্বিতীয় প্রকাশ : জন্মাষ্টমী ১৯৭৯
তৃতীয় প্রকাপ : দীপাবলী ১৯৭৯
চতুর্থ প্রকাশ : বইমেলা ১৯৮২
পঞ্চম প্রকাশ : বইমেলা ১৯৮৯

কুড়ি টাকা

প্রকাশ : অধীর চক্রবর্তী, প্রত্যয় প্রকাশ ১৭/২ জয়দেব কুণ্ডু লেন, হাওড়া-৭১১১০১
মুদ্রাকর : অশোক চেধুরী, দীপ্তি প্রিন্টিং ওয়ার্কস পি-২১ সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট, কলি-৬

ডক্টর সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় ডি· এস-সি·

অধ্যক্ষ
বসু বিজ্ঞান মন্দির
৯০/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

আমার এই বইটির পাণ্ডুলিপি পড়বার সুযোগ হয়েছিল। লেখকের প্রয়াস নিঃসন্দেহে উৎসাহব্যঞ্জক। বিশেষতঃ একটি কঠিন তথ্যবহুল বিষয় তিনি চেষ্টা করেছেন সকলের পক্ষে সহজগম্য ও সরস করে তুলতে। অনেকাংশে তিনি সফল, তবুও কোথাও কোথাও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সূক্ষ্মতা সম্পূর্ণরূপে হয়তো-বা রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। বিজ্ঞান বিষয়ক বই-এর সাহিত্যের পর্যায়ে স্থান পাওয়া সময় ও উদ্যম সাপেক্ষ। বাংলা ভাষায় লেখা এই রচনাটি তারই প্রথম পদক্ষেপ বলা যেতে পারে।

সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

২১।৯।৭৬

গৌরচন্দ্রিকা

বিজ্ঞান, বিশেষত পদার্থবিদ্যা, কতগুলো condition-এর ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে—এই হলো বিজ্ঞানীদের বক্তব্য। condition মানে অবস্থা, স্তর, পরিবেশ বা শর্ত। আবার এই ইংরিজি condition শব্দটির অর্থ 'পদমর্যাদা' এবং 'মেজাজ'। একদিন বিজ্ঞানের লেখা মহিমা ও মর্যাদা নিয়ে আমেরি মেজাজে মুষ্টিমেয় বিদগ্ধ পাঠক-দরবারে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। অন্যদিকে ধীরে ধীরে বিজ্ঞান আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে ; তাকে জানার ইচ্ছা, বোঝার আকাঙ্খা স্বভাবতই মানুষের মনে জেগে উঠল। condition-এর বাঁধনে বাঁধা বিজ্ঞান-রচনা হঠাৎ একদিন আম-জনতার মজলিশে দিব্বি এসে হাজির হলো। একে পরিচিত করার কৃতিত্ব যদিও অনেকের, তবুও জর্জ গেমো প্রধান এবং অনন্য। মানস সরোবরের বদ্ধ জলাশয় থেকে গেমো সরস বিজ্ঞান সাহিত্য রচনায় সিন্ধু-ব্রহ্মপুত্র নদ দিগ্বিদিকে বইয়ে দিলেন! তাঁর রচনার উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও খোশগল্পের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এলো তাঁর নিজের আঁকা ছবিগুলি। গেমোর পর এলেন আরো অনেকে। হয়েল, রিচার্ডসন, ম্যাক্সবোর্ন প্রভৃতি। সরসতার দিক দিয়ে বিজ্ঞান-সাহিত্য লোকায়ত হয়ে উঠল ; তবুও এই সাহিত্য সম্পূর্ণ কবিদের নিরঙ্কুশত্ব পায় নি ; বিদগ্ধদের দরবারে বিজ্ঞান রচনা তখনো স্বমহিমায়, পরিপূর্ণ মর্যাদায়, খানদানি ঘরোয়ানার সহবতে ভরা! এই ঐতিহ্য ভাঙলেন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী গ্লিসন। সুইডিশ নোবেল একাদমিতে তার ভাষণ চিরাচরিত ঐতিহ্যের আগল ভেঙে সরল সরসতায়, সহজ উপমায় দীপ্ত হয়ে জ্বলে উঠল। কঠিন বিজ্ঞানের বিষয় তার হাতে শানিত হয়েছিল ; এবার তা' বক্তব্যে, পরিহাস উজ্জ্বলতায় পরিশীলিত হয়ে দাঁড়াল।

একটি Text Book Library'র সভ্যদের সঙ্গে আলোচনার সময় বিজ্ঞান-সাহিত্যের এই নতুন মেজাজের কথা তুলে ধরেছিলাম। আর এই সভ্যদের অনুরোধে তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের কথা কিছু কিছু বলি। সভ্যদের বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়, এবং বয়সের কথা ভেবে বক্তব্যটা সহজ করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই খানিকটা স্বাধীনতার সুযোগ নিই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিজ্ঞান রচনায় যে উপমা ব্যবহার করেছিলেন, তা হয়তো বৈজ্ঞানিক সত্য পূর্ণভাবে প্রকাশ করে নি, তবুও নিঃসন্দেহে সহজভাবে বিজ্ঞানকে সাধারণ্যে তিনি তুলে ধরেছিলেন। আমার সেই ভরসা ছিল! সত্য যে কঠিন—। তবু তাকে মধুর বলেই ঋষিরা জেনেছেন ; জেনেছেন অবিদ্যা বা বিজ্ঞান দিয়ে মৃত্যুকে অতিক্রম করে অমৃতকে পাওয়া যাবে। মৃত্যুর কঠিন পথ পার হওয়া সহজ নয়। এই বিষয়ে লেখার

কথা তখন দানা বাঁধে ; অথচ উর্দু কবিরা যাকে গম এ রোজগার বা পেশার গ্লানির কথা বলেছেন, তারই জালে বাঁধা পড়ে' হয়ে ওঠে নি।

লেখা হলো আরো পরে। কিছুটা লিখে ভাটনগর পুরস্কার বিজয়ী বন্ধুবর ডক্টর বীরেন্দ্রবিজয় বিশ্বাসকে দেখাই। তিনি উৎসাহ দিয়ে পুরোটা লিখতে বলেন। আরো উৎসাহ এলো ডক্টর রাধাকান্ত মণ্ডল ও ডক্টর সুশ্বেতা বিশ্বাসের কাছ থেকে। লেখা হলো। সে লেখা একদিন সহানুভূতি নিয়ে দেখে দিলেন অগ্রজ প্রতিম শ্রদ্ধেয় ডক্টর আনন্দমোহন ঘোষ। এঁদেরই উৎসাহে বইটি ছাপার উদ্যোগ হয়। প্রত্যয় প্রকাশ-এর শ্রীঅধীর চক্রবর্তীর আনুকূল্যে ছাপা হলো, অন্তরাল থেকে সাহায্য করলেন শ্রীঅশোক দাস ও শ্রীসুনীল ঘোষ। আরো দুটি কিশোর বন্ধুর কথা বলি ; এদের দাবিতে প্রতি পর্বের শেষে বা মাঝে ছড়ার টুকরো ছড়িয়ে দিতে হলো—এতে তাদের মনে রাখার সুবিধে।

সবচেয়ে গর্বের দিন সেদিন এলো, যেদিন বইটির ভূমিকা লিখে দিলেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় ডক্টর সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়। এঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। বইটির যেটুকু ভাল, তার ষোলআনা এঁদের প্রাপ্য।

এই বইটি তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার একটি পালা, এরই জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ে বা নির্দিষ্ট পৃষ্ঠা সংখ্যায় একটিতে বাঁধতে চেয়েছিলাম। মহাবিশ্বের, রহস্য তার বিশালত্ব নিয়ে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয়, একে সহজেই পাশ কাটানো গেছে। তবু এ পালা কোথায় শেষ হবে সেখানে দ্বিধা-সংশয় ছিল। কোয়ার্ক তত্ত্ব ও তার গাণিতিক ব্যবহারে বিস্তারিত প্রকাশ নিয়ে ভাবনা ছিল। এ সময়ে হাতে একটি বই আসে—শ্রীদীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের 'মৌলকণা'। সব দ্বিধা সঙ্কোচ দূর হয়—এই বই যে মৌলকণার অনেক কৌতূহলই নিরশন করছে! পালা সমাপ্তির দাঁড়ি সহজেই টানা গেল।

রবীন্দ্রনাথ কণাতরঙ্গ তত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে উচ্চিংড়ের লাফের উপমা এনেছিলেন ; হোয়াইটহেড ভেবেছিলেন অগণিত ক্যাঙারুর লাফ! লাফ যারই হোক, এই লাফিয়ে চলা বিজ্ঞানের গতি আজকে দ্রুত অতি দ্রুত। এই দ্রুত গতিতে একটি ছবির ফ্রেমে আটকানো যাবে না। তবুও কথকতার এই পালায়, এই ধাবমান গতি যদি কিছুটা ধরা পড়ে, তবে এই পালাকার নিজেকে সার্থক মনে করবে।

যে বিজ্ঞানীরা সত্যক খুঁজেছেন, যাঁরা খুঁজছেন, এবং ভবিষ্যতে যাঁরা খুঁজবেন তাঁদের সকলের জন্য আমার প্রণাম-অভিবাদন রইল।

সাধন দাসগুপ্ত

দীপাবলী, ১৩৮৩

রঙ্গদ্বার

পদার্থবিদ্যার পাঁচালি 'আলো আরও আলো'র পুনর্মুদ্রন হলো।

পাঁচালিটি প্রকাশের পর গুণীজন অযাচিত ভাবে তাঁদের মন্তব্য, বক্তব্য জানিয়েছিলেন। পাঁচালিকার তাই অভিভূত। তবু, ইচ্ছে থাকলেও এই সংস্করণে পাঁচালিটিকে সুসংস্কৃত করা যায়নি। কারণ, কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা এবং বিপর্যস্ত বেসামাল ছাপাখানার মাধ্যমে সেই কাগজের মসিলিপ্ত রূপান্তরের উৎক্রম। আলাদা করে পরিভাষার সংকলন দেয়া গেল না এবং হয়তো বা, বইটি ত্রুটিশূন্য হলো না। এরা আছে বই-এর পাতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পালাগানের স্বরবিচ্যুতির মতো। ইতিমধ্যে এই বইটির পরিপূরকভাবে প্রকাশ হয়েছে রসায়নের কথকতা—"রোমাঞ্চকর রসায়ন"।

প্রথম দেশীয় ভাষায় আধুনিক বিজ্ঞানের রচনা লেখেন গেলিলিও গেলিলি—ইটালি ভাষায় প্রকাশ করেন তাঁর ডায়ালোগ গ্রন্থটি। গ্রন্থটির সূর্যকেন্দ্রিক গ্রহরাজ্যের মতবাদ সেকালীন যাজক সমাজের যতটা গাত্রদাহের কারণ হয়েছিল তার চেয়েও বেশী মানোকষ্টের কারণ ঘটেছিল ভাষাবিদ পণ্ডিত সমাজে। দেশী ভাষায় অধার্মিক বিজ্ঞান লেখা—একি? তাঁদের সেকালীন মতবাদটিকে কবি জয়দেব যেন তাঁর গীতগোবিন্দমের শ্লোকে জানালেন ঃ

স্বাধ্বী মাধ্বীক চিন্তা ন ভবতি ভবতঃ শর্করে কর্করসি দ্রাক্ষে দ্রক্ষান্তি কে ত্বামমৃত মৃতমসি ক্ষীরং নীরং রসন্তে।

হায় মধু, তোমার আর মধুরতা নেই ; হে শর্করা তুমি কাঁকরের মতো কঠিন, বিস্বাদ ; ওগো দ্রাক্ষাফল, তোমার দিকে কে আর তাকাবে? হে অমৃত, তুমি মৃত। হায়রে ক্ষীর জলের মতোই তোমার স্বাদ।

তবু বিজ্ঞানের রচনা প্রাদেশিক ভাষায় হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। কারণ বিজ্ঞানের যে সত্য সেই সত্য শাশ্বত, মানুষের চিরন্তর প্রশ্নের উত্তরের মধ্য দিয়ে যাকে খোঁজার জানার ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতাটিকে প্রকাশ না করলে মানুষের অগ্রগতির সীমাচিহ্নটি কী করে জানা যাবে?

পালাকার তাই, প্রারম্ভেই ভরতবাক্য উচ্চারণ করে জানাচ্ছে, ইয়মপি বিশ্বং কৃৎস্নাং বিজ্ঞানঃ প্রশাস্তু নঃ। আমাদের এই বিশ্বলোককে বিজ্ঞান উদ্ভাসিত করুক। অলমিতি

দীপাবলী ১৩৮৬ সাধন দাশগুপ্ত

অনুসরণী

কথা আরম্ভ

আদিতে অন্ধকার ছিল ; গড বললেন, আলো হোক। তা এল আলো। এই গল্প আমরা বাইবেলে পড়েছি। আলো পাবার পর সৃষ্টি সহজ হল। তৈরি হল ব্রহ্মাণ্ড, পৃথিবী, মানুষ। এই মানুষই আবার আলো খুঁজতে গিয়ে অজানার দ্বারে পৌঁছেছে।

সৃষ্টির আদিতে আলো, সৃষ্টির মূল খোঁজার হাতিয়ারও আলো। দার্শনিক কনফুসিয়াস বললেন, কী জানি আর কী জানি না—এটা স্পষ্ট করে জানাই জ্ঞান। অভিজ্ঞতা থেকে যাচাই করে উঠেছে জ্ঞান। সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর বিচার বিবেচনা করে দার্শনিক সৃষ্টির রহস্য ব্যাখ্যা করেছেন, পরম সত্যকে জানাতে চাইছেন। বিজ্ঞানীও সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সঠিক তত্ত্ব জানার চেষ্টা করেছেন, তথ্য বিশ্লেষণ করে খাড়া করছেন তত্ত্ব, তাঁদেরও একই চেষ্টা, সেই পরম সত্যকে জানতে চাওয়া, বুঝতে চাওয়া, যা নিয়ন্ত্রণ করছে অণু-পরমাণু থেকে প্রকাণ্ড মহাবিশ্ব। পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর তত্ত্ব,এর উপরেই বিজ্ঞান দাঁড়িয়ে আছে ; আর আধুনিক বিজ্ঞানের চৌকাঠে আছে আলো।

সনাতন বিজ্ঞান বা classical science-এর দুয়ার পেরিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের নাচ দুয়ারে কবে এলাম ? এ সম্বন্ধে কোনো দ্বিমত নেই—সেটা 1896 সাল। ভিলহেল্ম্ কনরাড রণ্টগেন সে বছর এক্স-রে আবিষ্কার করলেন। এক্স-রে, যাকে সাদা বাংলায় আমরা রঞ্জন রশ্মি বলি, রণ্টগেন সাহেবের নামে নাম।

এক্স-রে বিজ্ঞানের ধারণায় ওলট-পালট ঘটাল। সে যুগে পদার্থবিদ্‌দের ঘরোয়ানায় পরমাণু বা এটম ছিল না। তাঁদের গায়কীতে অণু বা মলিকিউল (molecule) ছিল। এলকেমিস্টরা এটম বা পরমাণুতত্ত্ব চর্চা করতেন ; ভাবতেন মৌলিক পদার্থের পরিবর্তন সম্ভব। শুধু পরমাণুর পরিবর্তনেই লোহাকে সোনা করা যাবে—দরকার শুধু অনুঘটক পরশমণির। এঁদের উত্তরসূরী রসায়নবিদ্‌রা পরমাণু তত্ত্ব মানতেন। তাঁরা ভাবতেন, প্রতিটি মৌলিক পদার্থ একই রকম এটমে তৈরি, আর এই এটম একটা বিশিষ্ট আকৃতিকে মিলে মিশে একটা মলিকিউল তৈরি করবে। কী করে যৌগপদার্থ তৈরি হবে, তার সুন্দর সম্ভাব্য ব্যাখ্যাও এই এটমতত্ত্ব দিয়ে জানানো সহজ হলো—দুটো হাইড্রোজেন এটম বা পরমাণু একটি অক্সিজেন এটম বা পরমাণুর সঙ্গে মিলে একটি জলের অণু বা মলিকিউল তৈরি করবে।

এঁরা জানালেন, মৌলিক পদার্থের এটম ওজন আলাদা, তাদের রাসয়নিক গুণও আলাদা। অন্যভাবে বললে, 2 গ্রাম হাইড্রোজেন 16 গ্রাম অক্সিজেনের সঙ্গে মিললে হবে 18 গ্রাম জল। আরও দেখলেন, প্রতিটি মূল পদার্থের এটমের ওজন আলাদা হলেও, কোনো কোনো মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক গুণের মধ্যে কোথাও একটা মিল আছে। 1869 সালে দ্মিত্রি মেণ্ডেলিয়ভ এই ওজন আর গুণের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য পেলেন ;

তিনি সবকটি মূল পদার্থ নিয়ে একটি পর্যায়-চক্রের (periodic table) পরিকল্পনা করলেন। এখানে এটমের ওজন আর রাসায়নিক গুণ এদুটিই হলো সাজানোর উপাদান।

মেণ্ডেলিয়ভ প্রথমে সবকটি মৌলিক পদার্থের একটা তালিকা করলেন। তাদের এটমের ওজন আর গুণাবলীও পাশে-পাশে লিখে রাখলেন। এদের সাজাতে গিয়ে মেণ্ডেলিয়ভ একটা আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করেন—মূল পদার্থগুলি রাসায়নিক গুণ অনুসারে একটি নির্দিষ্ট অন্তর পর পর সামঞ্জস্যে আসছে !

আরো একটু বিশদভাবে দেখা যাক।

হাইড্রোজেন, যার এটমিক ওজন সবচেয় কম, মেণ্ডেলিয়ভ তাকে আলাদা বিশেষ শ্রেণীতে রাখলেন। তালিকা শুরু হলো লিথিয়াম দিয়ে। লিথিয়ামের একটি বিশেষ গুণ এই যে, এটি ক্ষার বা alkali জাতীয় পদার্থ তৈরি করতে পারে। সাতটি মূল পদার্থের পর পাওয়া গেল সোডিয়াম এবং আরও সাতটির পর পটাশিয়াম। এদুটিও ক্ষার তৈরি করে। লিথিয়ামের পর ওজন হিসাবে পাওয়া গেল বেরিলিয়াম। এর সাতটি মূল পদার্থের পর এবং সোডিয়ামের ঠিক পরে পাওয়া যায় ম্যাগনেশিয়াম। পটা-শিয়ামের পর ওজন হিসাবে আসে ক্যালসিয়াম। এই তিনটি পদার্থেরও রাসায়নিক গুণে মিল আছে।

এই গুণের মিল দেখে মেণ্ডেলিয়ভ সাতটি শ্রেণীতে মৌলিক পদার্থগুলি সাজাতে শুরু করলেন। সাতটি শ্রেণীর নীচে আরও কয়েকটি সমান্তরাল শ্রেণী। একজাতীয় বা সমগুণের মৌলিক পদার্থগুলির একটির নীচে আরেকটি সাজালেন ; যেমন, লিথিয়াম—সোডিয়াম—পটাশিয়াম, বা বেরিলিয়াম—ম্যাগনেসিয়াম—ক্যালসিয়াম। ভারি ওজনের পদার্থগুলো সাজানো অত সহজে কিন্তু হলো না।

ভারি ওজনের মৌলিক পদার্থগুলি সাজানোর সময় সাতের গুণিতক খাটল না। গোলমালটা তৃতীয় সারির থেকেই ধরা পড়ল। আরো একটা আশ্চর্য ব্যাপার মেণ্ডেলিয়ভ লক্ষ্য করলেন সাত নয়, দশটি পদার্থের পর পাওয়া গেল একটা মূল পদার্থ, যার রাসায়নিক গুণ ঐ শ্রেণীর আগের দুই সারির পদার্থের কাছাকাছি। কিন্তু পরের শ্রেণীতে আবার সাতের তফাতে কিছুটা গুণের কাছাকাছি পদার্থ পাওয়া যাচ্ছে। এরপর আবার দশের তফাত, তারপর সাত। অর্থাৎ প্রথম দুই সারিতে যদিও সাতটি করে পদার্থ সাজানো গেল, তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম আর ষষ্ঠ সারিতে জায়গা হবে 17টি করে মূল পদার্থের। এরা সাজবে দশ আর সাত এই দুই সারিতে।

শ্রেণীগুলিতেও তৃতীয় সারি থেকে জায়গা হলো দুটি পদার্থের। এদের মিল শুধু এক জায়গায়—অন্য কোনো পদার্থের সঙ্গে মেল-বন্ধন কালে এদের পরমাণুর সংখ্যা হবে একই রকম—অর্থাৎ যোজ্যতা (valency) এক। এই দুটি পদার্থের একটি আগের সারির মৌলিক পদার্থের সঙ্গে মিল খুঁজে পাবে, অপরটি কিন্তু পরের সারির একই শ্রেণীর দ্বিতীয় পদার্থগুলির সঙ্গে একটি মিল তৈরি করবে। এই মিল আর গরমিল বোঝানোর জন্য একই শ্রেণীর দুটি পদার্থকে মেণ্ডেলিয়ভ একই সারিতে বসালেও এদের

ঠিক ওপরে-নীচে রাখলেন না—সাজালেন একটু তির্যক করে। ফলে পয়লা শ্রেণীর তৃতীয় সারিতে পটাশিয়ামের সঙ্গে এল তামা। পটাশিয়াম সোডিয়ামের ঠিক নীচে; আর তামাও সোডিয়ামের নীচে, একটু তির্যকভাবে তার অবস্থান। ভাবটা যেন হারমোনিয়মের সাদা-কালো রিড—একটি সুরের কোমল শুদ্ধ ভাগ। চতুর্থ সারিতে পটাশিয়ামের নীচে এলো রুবিডিয়াম, আর তামার নীচে রুপো। মিল আছে পটাশিয়াম আর রুবিডিয়ামে এবং তামা ও রুপোয়।

ব্যাপারটা ফুল সাজানোর মতো। কেন্দ্রে রাখা হলো হাইড্রোজেন ফুল। চার দিকে তার সাত রঙের সাতটি ফুল। পরের সারিতেও একই রকমের সাতটি ফুল—আগের সারির সঙ্গে রঙ মিলিয়ে সাজানো। এর পরের থাকগুলিতে রইল সতেরটি ফুল পাতা, তার মধ্যে চৌদ্দটি ফুল দুটি করে সাত রঙের। একই রঙের ফুলগুলি পাশাপাশি আগের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে সাজানো—এদের একটি হবে আগের জাতির, অন্যটি ভিন্ন। আর সাত রঙের চৌদ্দটি ফুলের শেষে তিনটি রঙিন পাতা। সমস্তটা মিলে যেন একটি জাপানী ইকাবেনা।

এই পদ্ধতিতে সাজাতে গিয়ে মেণ্ডেলিয়ভ দেখলেন, জানাশোনা সবকটি মূল পদার্থ ঠিক মতো চক্রে আসছে না। গুণে প্রভেদ থাকছে। যেমন ক্যালসিয়ামের পর ওজন হিসাবে আসে টাইটেনিয়াম। কিন্তু টাইটেনিয়াম গুণের দিকে থেকে বোরোন বা অ্যালুমিনিয়ামের সমান নয়; বরং পরের শ্রেণীর কার্বন ও সিলিকনের কাছাকাছি। মেণ্ডেলিয়ভ তাঁর চক্রে টাইটেনিয়ামকে ফেললেন কার্বন-সিলিকনের শ্রেণীতে এবং ক্যালসিয়াম আর টাইটেনিয়ামের মাঝের জায়গায় বসালেন একটি অনাবিষ্কৃত মূল পদার্থ, যার নাম দিলেন "একা-বোরোন" (Eka-Boron)। শুধু তাই নয়, এই নতুন পদার্থের ওজন কী হবে, কী হবে তার রাসায়নিক গুণ, তার পূর্বাভাসও মেণ্ডেলিয়ভ জানালেন। এ রকম একটি বা দুটি নয়, তাঁর চক্রের ছক থেকে তিনি তিনটি মূল পদার্থের উপস্থিতি ঘোষণা করলেন; এরা হলো একা-বোরোন (Eka-Boron), একা-অ্যালুমিনিয়াম (Eka-Aluminium) এবং একা-সিলিকন (Eka-Silicon)।

দিন যায়, বছর যায়, ঐ তিন জায়গায় বসতে পারে এমনতর কোনো মূল পদার্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। অবশেষে 1875 সালে লেকক (Francois Lecoq) পেলেন একা-অ্যালুমিনিয়ামের দেখা, যার নাম দিলেন গ্যালিয়াম। 1879 সালে ফ্রেডরিক নিলসন (Fredrik Nilson) আবিষ্কার করলেন একা-বোরোন, যার নাম স্ক্যাণ্ডিয়াম। সবশেষে ক্লিমেন্স উইনক্লার (Clemense Winkler) পেলেন জারমেনিয়াম নামে একা-সিলিকন, সেটা 1886 সালে।

তবে তো এটম আছে!

তবুও সেদিন পদার্থবিদ্‌রা এটম নিয়ে মাথা ঘামান নি। রসায়নতত্ত্বে এর উপস্থিতি প্রমাণ হলেও পদার্থবিদ্‌দের ওড়ব রাগের গানে তখন এটি বিবাদীস্বর। এর প্রয়োগ ওস্তাদির কারুকৃতে, সাধারণভাবে একে সরিয়ে রাখা হলো। পদার্থের ব্যবহারিক দিকে,

মেণ্ডেলিয়ভের পর্যায়চক্র (১৮৯৮ সাল)

I	11	III	IV	V	VI	VII	VIII
লিথিয়াম (Li-7·03)	বেরিলিয়াম (Be—9·08)	বোরোন (B—10·95	কার্বন (C—12·0)	নাইট্রোজেন (N—14·04	অক্সিজেন (O—16 0)	ফ্লোরিন (F—19·06)	
সোডিয়াম (N-23·04)	ম্যাগনেসিয়াম Mg-24 3)	অ্যালুমিনিয়াম (Al-27·1)	সিলিকন (Si 28·4)	ফসফরাস (P 31·02)	সালফার (S 32·1)	ক্লোরিন (Cl 35·45)	
পটাশিয়াম (K-39·11) কপার (Cu 63·6)	ক্যালসিয়াম (Ca-40·1) জিঙ্ক (Zn-65·4)	স্ক্যাণ্ডিয়াম (Sc 44·1) গ্যালিয়াম (Ga 69·9)	টাইটেনিয়াম (Ti 48·2) জারমেনিয়াম (Ge 72·5)	ভ্যানাডিয়াম (V 51·4) আর্সেনিক (As 75·0)	ক্রোমিয়াম (Cr 52·14) সেলেনিয়াম (Se 79·0)	ম্যাঙ্গানিস (Mn 55·0) ব্রোমিন (Br 80·0)	আয়রন কোবাল্ট নিকেল (Fe-56·0) (Co-58·9) (Ni-58·1)
রুবিডিয়াম (Rb-85·4) সিলভার (Ag 107·9	ষ্ট্রনসিয়াম (Sr 87·6) ক্যাডমিয়াম (Cd 112·0)	ইট্রিয়াম (Y 89·0) ইণ্ডিয়াম (In 113·9)	জিরকোনিয়াম (Zr 90 4) টিন (Sn 119·1)	নিওবিয়াম (Nb 93·7) এন্টিমনি (Sb 120 4)	মলিবডেনাম (Mo-96·0) টেলুরিয়াম (Te 127·5	আইওডিন (I—126·9)	রুথেনিয়াম রোডিয়াম প্যালেডিয়াম (Rn 101·7) (Rh-103·0) (Pd 106·4)
কেসিয়াম (Ca 132·9) ——	বেরিয়াম (Ba 137·4) ——	ল্যানথানাম (La 138·6 টারবিয়াম (Tb 159)	সেরিয়াম (Ce 140·2) ——	—— ট্যানটালাম (Ta 182·8	—— টাংস্টেন (W 184 8)	—— ——	অসমিয়াম ইরিডিয়াম প্ল্যাটিনাম (Os 191·0) (Er 193·1) (Pt 194 8)
গোল্ড (Au-197 2) ——	মার্কারি (Hg 200·0) ——	থালিয়াম (Tl 204·1) ——	লেড (সিসা) (Pb 206·4) থোরিয়াম (Th 232·6)	বিসমাথ (Bi 208·1) ——	—— ইউরেনিয়াম (U 239·6)	——	

যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের দিকে তখন নজর পদার্থবিদ্‌দের। এটম রইলো রসায়নের ভিয়েনে।

এক্স-রে পদর্থবিদ্‌দের সেই অলস সুখের স্বর্গ তছনছ করল।

অথচ এক্স-রে আবিষ্কার করেন যে রণ্টগেন সাহেব, তিনি একজন পদার্থবিদ্‌। আর আবিষ্কারও ঘটে হঠাৎ, যাকে বলা যেতে পারে দৈবাৎ বা অ্যাকসিডেণ্ট।

আবিষ্কারের অনেক ঘটনাই ঘটে দৈবাৎ। লুই পাস্তুর একদা বলেছিলেন, যে-মন প্রস্তুত, দৈব তাকে সাহায্য করে। নইলে রণ্টগেন যেভাবে আবিষ্কার করেছিলেন এক্স-রে, সেই ঘটনা আগেও তো ঘটেছিল।

সে কথা যাক! গল্প শুরুর আগে থাকে প্রস্তুতি, প্রদীপ জ্বালার আগে থাকে সলতে পাকানোর পালা। মাঝের থেকে শুরু করলে 'হ য ব র ল'র উদোর গল্প বলাই হবে। আমাদের গল্প শুরু হোক—এক যে ছিল··· দিয়ে।



মেণ্ডেলিয়ভ



মাইকেলসন



নিউটন



মেক্সওয়েল



ফেরাডে

সলতে পাকানোর পালা

১. মাপকাঠি

পাঁচটি শারীরিক ইন্দ্রিয়, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় আর মন, এই এগারটির ক্রিয়ায় আসে অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যায় পাই বিজ্ঞান, শাস্ত্রে একথা বলে। বিজ্ঞান হল কৌতূহল, বিজ্ঞান জানবার ইচ্ছা। এই কৌতূহল আর জিজ্ঞাসা থেকে বাড়ে অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতা দেবে তথ্য, আর তার বিশ্লেষণে পাব সিদ্ধান্ত বা তত্ত্ব। বিজ্ঞানের অগ্রসরের এই সিধে রাস্তা।

আদি যুগেও মানুষের আলো নিয়ে কৌতূহল ছিল, জিজ্ঞাসাও ছিল—এটা কী? এক যুগে যাঁরা পণ্ডিত বলে সর্বজনগ্রাহ্য হতেন, জনসাধারণ বিশ্বাস করত, তাঁরা সব প্রশ্নের উত্তর জানেন। এরিস্টোটল প্রাচীন গ্রীসে পণ্ডিত বলে পরিচিত ছিলেন; সুতরাং, আলো কী?—এই প্রশ্নের সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়েছিল। এরিস্টোটল বললেন, আলো এক শ্রেণীর কণা, যার সৃষ্টি চোখে। চোখ থেকে এই কণা বেরিয়ে বস্তুর উপর পড়ে, তারপর আবার ফিরে আসে চোখে। ফলে বস্তুটিকে আমরা দেখি।

সেই যুগে মানুষের কৌতূহল সহজেই নিবৃত্ত হতো, কাজেই এরিস্টোটল আর কোনো কূট প্রশ্ন শোনেন নি। এরিস্টোটলের উত্তরটি যেন দার্শনিক তত্ত্ব। বহু যুগ পেরিয়ে এরই প্রতিধ্বনি শুনি রবীন্দ্রনাথের গানে—'চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে।' এরিস্টোটলের তত্ত্বের শুধু একটা দিকই আমাদের কৌতূহলী করে, তা আলোর কণা আকারে বর্ণনা। বিজ্ঞানের জগতে এই তত্ত্ব শুধু একটি ইতিহাস। পবিত্র আলোক তত্ত্ব বা Divine Theory of Light নামেই এর পরিচয়।

নিউটন আর তাঁর অনুগামীরা ভাবতেন, আলোর কণা আছে, আর তার গতি থেকে আলো বিস্তার লাভ করে। তাঁরা জানতেন, আলো সরল রেখায় চলে। ইউক্লিডের জ্যামিতির সাহায্যে ছায়া, প্রতিফলন, বা প্রতিসরণের ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। মরীচিকা কেন হয় তা আর অবোধ্য রইল না। এই জগতের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা যেমন ছায়ার আকৃতি, লেন্স বা বক্রী আয়নার প্রতিফলন, এবং প্রতিবিম্বের বিকৃতি ইত্যাদি সবই সরল রৈখিক গতির নিয়ম থেকেই বোঝা যাচ্ছে।

তবু কিছু বিষয় ঘটে যা বিস্ময়; জ্যামিতির সরল রেখার তত্ত্ব দিয়ে এদের বোঝা গেল না। অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়ে যে আলো যায়, অতি সূক্ষ্ম ঝাঁঝরির ভেতর দিয়ে যে আলো আসে, তারা যে প্যাটার্ন তৈরি করে—তা যেন নিয়ম ভাঙা, চেনা-জানার সীমানার বাইরে।

অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়ে যে আলো আসে তা পাখার মতো ছড়িয়ে পড়ে, জ্যামিতিক সূত্র অনুযায়ী বিস্তৃত হচ্ছে না। এই অস্বাভাবিক বিস্তৃতির নাম দেওয়া হলো ব্যবর্তন বা diffraction।

অতি সূক্ষ্ম ঝাঁঝরি দিয়ে যে আলো যায় তারা সূক্ষ্ম সাদা কালো রেখায় প্রতিফলিত হলো। তেলে-জলে মেশানো পাত্রে আলোর প্রতিফলনও স্বাভাবিক। এখানে পেলাম আলো-আঁধারির ঝালর। বিজ্ঞানী এই অস্বাভাবিকতার নাম দিলেন ব্যতিচার বা interferance।

এই যে অস্বাভাবিকতা—এও আলোর ধর্ম। সরলরেখার তত্ত্ব দিয়ে এর প্রমাণ মিললো না। নিউটনের কালেই হাইগেন্স (Huygens) মত প্রকাশ করলেন, আলো তরঙ্গ বিশেষ। প্রায় দুশো বছর পর ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে আলোর তরঙ্গরূপ স্বীকৃতি পেল। কণাবাদ বাতিল হলো।

কিন্তু তরঙ্গ কোনো মাধ্যম ছাড়া টি঳কতে পারে না। তার গতি, তার বিস্তৃতির জন্য প্রয়োজন মাধ্যমের। জলে ঢেউ থাকে, কারণ জল আছে। শব্দেরও ঢেউ আছে। শব্দও তরঙ্গ। এই তরঙ্গের গতি—প্রসারণ বাতাসের মধ্য দিয়েই। বাতাসই তার মাধ্যম। মাধ্যম শূন্য জায়গায় শব্দ নেই। কারণ তার গতি রুদ্ধ। আলোর তরঙ্গ কিন্তু বায়ু শূন্য পাত্রের মধ্য দিয়েও যাবে, পার হয়ে আসবে অসীম অনন্ত মহাশূন্য মহাবিশ্ব—যেখানে বায়ু নেই। আলোর তরঙ্গ বায়ুর উপর নির্ভর করে না। তবে কী তার মাধ্যম?

বিজ্ঞানীরা বললেন, এটি আলোক-পরিবাহী ইথার। ইথার এমন একটা বস্তু যা সর্বত্র সমান ভাবে ছড়িয়ে আছে সারা বিশ্বে, এমন কি পরমাণুর অভ্যন্তরে। ইথার সর্বত্র প্রসারী, কোনো বস্তু, কোনো পদার্থ এর বাধা নয়। ইথারের স্পন্দন আছে। আর এই স্পন্দনের ফলেই আলোক-তরঙ্গ গতি পায়।

ইথার কী? কী তার গুণ? বিজ্ঞানীরা এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজেন।

এক শ্রেণীর কুযুক্তির ইংরিজি নাম begging the question—অর্থাৎ যা প্রশ্ন তা একটু ঘুরিয়ে উত্তর হিসাবে বলা। যেমন, প্রশ্ন—কাঠ পোড়ে কেন? উত্তর—কারন কাঠ দাহ্য পদার্থ। দাহ্য মানে—যা পুড়তে পারে; অর্থাৎ উত্তরটি দাঁড়াচ্ছে এই যে, কাঠ পুড়তে পারে তাই পোড়ে। ইথার কী—প্রশ্নের উত্তরও এই রকম অস্পষ্ট। যার ভিতর দিয়ে আলোর তরঙ্গ যায় তাই ইথার।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা একটি ভুল করে বসলেন। ইথার যার সম্ভাবনা আমরা ভাববাদী রীতিতে স্বীকার করছি, তার গুণাবলী বলতে গিয়ে আমরা সাধারণ বস্তুগ্রাহ্য গুণের কথাই ভাবলাম। ব্রহ্ম সম্বন্ধে জানতে গিয়ে যেমন উপনিষদ ভাবে, তার স্নায়ু রক্ত শরীর কিছু নেই, তিনি নিরাকার অথচ আকার আছে, তিনি নির্গুণ আবার সগুণ, ইনি বিপরীত গুণের আধার—আলোক পরিবাহী ইথার সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা সেই বিপরীত গুণের কথাই ভাবলেন। তাঁরা বললেন, ইথার স্পন্দনশীল কঠিন পদার্থ, যার ভিতর দিয়ে আলোক তরঙ্গ যাবে। তাঁরা আরও বললেন, ইথার আবার খাঁটি ফ্লুইড বা অকঠিন পদার্থ, যা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি বস্তুর গতিবেগে কোনও বাধা হবে না। ইথার কঠিন, সে শুধু আলোর গতিবেগের কাছে—তাই তার গতি সরল রৈখিক। ইথার অতি নরম, গ্রহনক্ষত্রের কাছে—যার গতিবেগ আলোর চেয়ে অনেক কম।

এই যে অসঙ্গতি, ইথার-তত্ত্বের এইটি দোষ। ইথার একটা অদ্ভুত কিছু, যা আমাদের চেনা-জানা কোনো প্যাটার্নেই খাপ খাচ্ছে না। একে আমরা বলতে পারি বস্তু বা substance, কারণ এর স্পন্দন আছে। আবার একে বলতে পারি দেশ বা space, কারণ এর বিস্তৃতি আছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় আলোক-পরিবাহী ইথার আর প্রাকৃতিক দেশ (physical space) সমার্থক।

এই যুগে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যে তথ্য পাওয়া যায় নি, তার স্বীকৃতিতে বিজ্ঞানীদের প্রচণ্ড অনীহা দেখা যায়। এই মতের প্রবলতম প্রবক্তা স্বয়ং আইজাক নিউটন। তিনি কিন্তু তাঁর গতিবিজ্ঞানের মূল বিষয়গুলি সম্পূর্ণ স্থির (absolute rest) বস্তুর হিসাব ধরে তৈরি করেন। এখন এই সম্পূর্ণ স্থির কোথায় পাওয়া যাবে? এই পৃথিবীতে নয়, কারণ পৃথিবীর বার্ষিক আর আহ্নিক—এই দুই গতি আছে। আছে হয়তো মহাবিশ্বে কোনো নক্ষত্র-লোকে। কিন্তু দেখা গেল স্থির নক্ষত্র বলে কিছু নেই। প্রত্যেক নক্ষত্রেরই নিজস্ব গতি আছে। পরে ভাবা হল, কোনো নক্ষত্রের পরমাগতি (absolute speed) ঠিক করে তারই পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ স্থির বস্তুর কথা ভাবা যাবে। কিন্তু মূলেই গলদ। নিউটনের গতি-বিজ্ঞানের কাঠামো দিয়ে কোনো বস্তুর পরমাগতি মাপা যায় না।

এ সময় তড়িৎ-চুম্বক তত্ত্ব প্রকাশ হয়েছে। তড়িৎ আর চুম্বকের মধ্যে একটা গুণগত মিল পাওয়া গেছে। বহু তথ্য এই তড়িৎ-চুম্বক তত্ত্ব দিয়ে বোঝানোও যাচ্ছে। কাজেই ভাবা হলো, তড়িৎ-চুম্বক তত্ত্ব অনুসারে হয়তো কোনো বস্তুর পরমাগতি নির্ণয় করা সম্ভব হতে পারে। যে ইথার সারা মহাবিশ্বে ছড়িয়ে আছে, যে স্থির অথচ স্পন্দনশীল, যার স্পন্দনের ভিতর দিয়ে আলো, তাপ, তড়িৎ-চুম্বক বিকিরণ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায়, সেই ইথারের বিধৃতিতে পৃথিবীর পরমাগতি হয়তো মাপা সম্ভব হবে।

আলোর গতি কিন্তু এর আগেই মাপা হয়েছে। আলোর গতি মাপার চেষ্টা প্রথম করে গেলিলিও গ্যালিলি, সপ্তদশ শতকে। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর এই চেষ্টা বিফল হয়। গেলিলিও শুধু বোঝেন, পার্থিব নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে আলোর গতি মাপা কঠিন নয়—প্রায় অসম্ভব। কারণ আলোর গতি অতি দ্রুত।

এর পর বৃহস্পতিগ্রহের চন্দ্রের গ্রহণকাল পৃথিবীর উপবৃত্তের বিভিন্ন অবস্থান থেকে দেখে রোমার বিভিন্ন সময় পান। রোমার এর ব্যাখ্যা পৃথিবী ও বৃহস্পতির দূরত্ব এবং আলোর নির্দিষ্ট গতি থেকেই দিলেন। এইভাবে আলোর আনুপাতিক গতি মাপেন সেকেণ্ডে 1,85,000 মাইল।

পরিশেষে ফিজু (Fizeau) তাঁর নিজের তৈরি যন্ত্র দিয়ে মাপেন আলোর গতি। তাঁর হিসাবে এই গতি হলো সেকেণ্ডে 3,00,000 কিলোমিটার বা 1,86,000 মাইল। রোমারের হিসাবও প্রায় কাছাকাছি।

আলোর গতি বহু জন বহুভাবে মেপেছেন। বর্তমানে এই গতিকে আমরা ধরি সেকেণ্ডে 2,99,776 কিলোমিটার বা 1,86,300 মাইল। পৃথিবীর গতি সেখানে মাত্র সেকেণ্ডে 30 কিলোমিটার।

মাইকেলসন (Michelson) ও মরলে (Morley) আলোর গতি একই সঙ্গে পৃথিবীর গতির দিকে ও তার লম্বের দিকে কতটা হবে তার তুলনা করতে চাইলেন।

আগেই দেখেছি উপনিষদে ব্রহ্মের ব্যাখ্যার মতো ইথার ওতপ্রোতভাবে পৃথেবীর সঙ্গে মিলেমিশে আছে। যদিও এই ইথার স্থির, তবুও পৃথিবীর গতির জন্য আমরা ইথার বায়ুর গতির আভাস পাব। এই আভাস কোন-মতেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হবে না, কারণ ইথার প্রতি অণু-পরমাণুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত এবং আমাদের শরীর সহজেই ভেদ করে যাবে। এই ইথার বায়ুর গতির আভাস আমরা শুধু আলোর গতি বিভিন্ন অবস্থানে মেপে পেতে পারি।

যেমন ধরা যাক, শব্দ। এও তরঙ্গ, এর মাধ্যম হচ্ছে বাতাস। বাতাসের গতির দিকে শব্দের গতি অনেক দ্রুত, এর বিপরীতে গতি সহজেই হ্রাস পায়। যা শব্দের ও বাতাসের পক্ষে সত্য তা আলো ও ইথারের পক্ষেও নিশ্চয় সত্য হবে।

মাইকেলসন ও মরলের যন্ত্রে আলোর গতি পৃথিবীর সোজাসুজি কিছু দূরত্ব যাওয়া ও ফিরে আসা এবং পৃথিবীর গতির আড়াআড়ি সমদূরত্ব যাওয়া ও ফিরে আসার তুলনা করা হলো। এই যাতায়াতের সময়ের মাপ কী হতে পারে উদাহরণ দিয়ে বোঝা যাক।

ধরা যাক, একটি নৌকো স্রোতের মুখে সোজাসুজি এগিয়ে খানিকটা দূরত্ব গিয়ে আবার স্রোতের বিপরীতে চলে আগের দূরত্বেই ফিরে এল। আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে স্রোতের মুখে যাবার কালে নৌকোটি যে সময় বাঁচিয়েছিল বিপরীত মুখে ফেরার কালে সেই সময়টাই হারাবে। অর্থাৎ যাতায়াতের সময় স্রোতহীন কালে যাবার সময়েই সমান হবে। অথচ বাস্তবে তা হয় না। যদি ধরা যায় নৌকোর গতি ও স্রোতের বেগ সমান, তবে যাবার সময় নৌকোটি দ্রুত গেলেও ফেরার কালে মোটেই ফিরতে পারবে না।

অঙ্কের জটিলতার মধ্যে না গিয়ে আমরা দেখতে পারি যে—স্রোতের বেগ থাকার দরুন যাতায়াতের সময়, স্রোতহীন কালের যাতায়াতের সময়ের তুলনায় আনুপাতিক সমীকরণের হার বাড়বে—

$$\frac{1}{1-\left(\frac{a}{b}\right)^2}$$

এখানে $a =$ স্রোতের বেগ

$b =$ নৌকোর গতিবেগ

আবার আড়াআড়িভাবে সমদূরত্ব যাতায়াতের সময়। একইভাবে নীচের সমীকরণ অনুযায়ী বাড়বে—

$$\sqrt{\frac{1}{1-\left(\frac{a}{b}\right)^2}}$$

এখন এই সমীকরণে 'a'-কে যদি ধরা হয় পৃথিবীর গতিবেগ, যা ইথারে সঞ্চারিত হচ্ছে এবং 'b' যদি আলোর গতিবেগ হয় তবে এই দুদিকের হিসাবে দেরীর হার যথাক্রমে শতকরা 0·01 এবং 0·005 ভাগ মাত্র হবে। অর্থাৎ সোজাসুজি এবং আড়াআড়ি এই দুভাবে পাঠানো আলোকরশ্মি একই সঙ্গে পাঠানো হলেও একই সঙ্গে ফিরবে না।

কোনো তফাত কিন্তু পরীক্ষার ফলে পাওয়া গেল না। অর্থাৎ পরীক্ষার আগে মাইকেলসন ও মরলে যে ফল আশা করেছিলেন পরীক্ষায় তার সম্পূর্ণ উল্টোটা পাওয়া গেল। আলোর পৃথিবীর গতির দিকে নির্দিষ্ট দূরত্বে যাতায়াতের সময় আর পৃথিবীর গতির আড়াআড়ি দিকে সমদূরত্বে যাতায়াতের সময় এক। কোনোও প্রভেদ নেই। ইথার বায়ু আলোর গতিকে ভ্রষ্ট করছে না। আপেক্ষিকভাবে পৃথিবীর পরমাগতি আর সম্পূর্ণ স্থির বস্তুর নির্ণয় সম্ভব হলো না।

মাইকেলসন কোনোও প্রভেদ না পেয়ে আশ্চর্য হলেন। পরীক্ষাটি বার বার তিনি করলেন। পুনরাবৃত্তির ফলও এক— কোনো তারতম্য নেই। প্রভেদ নেই।

ক্ষুধিত পাষাণের পাগলা মেহের আলির মতো মাইকেলসন বলতে চাইলেন সব ঝুট হ্যায়, তফাত যাও। পরীক্ষার ফল কিন্তু আগের মতোই নির্বিকার। প্রভেদ পাওয়া গেল না। ইথার বায়ুর খোঁজ পাওয়া গেল না। ইথারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ শুরু হোলো। অথচ ইথারকে থাকতে হবে। ইথার আছে এই সিদ্ধান্ত না মানলে মহাবিশ্বে বা পার্থিব জগতে আলোক, তাপ ইত্যাদি তরঙ্গ কীভাবে প্রসারিত হবে? ইথার তখন অতি প্রয়োজনীয়। ইথার নেই ভাবা যাবে না। কাজেই মাইকেলসনের পরীক্ষার বিফলতার কারণ খোঁজা হল অন্যত্র। চারটি সম্ভাবনার কথা ভাবলেন বিজ্ঞানীরা।

প্রথম সম্ভাবনা অবশ্য ধরে নেওয়া যে, পৃথিবী ইথারের মতো নিশ্চল স্থির হয়ে আছে। মহাবিশ্বে আর সব কিছু পৃথিবী এবং ইথারের সাপেক্ষে চলেছে। পৃথিবী স্থির, কাজেই ইথার বায়ু পৃথিবীতে নেই। যা হোক, এই সম্ভাবনা আদৌ গ্রহণীয় নয়। পৃথিবী যে একটা গ্রহ, এ তো একটা ধ্রুব সত্য।

দ্বিতীয় সম্ভাবনায় বলা হলো, পৃথিবী তার গতির সঙ্গে ইথারকে আকর্ষণ করে টেনে নেয়। গায়ের চাদরের মতো ইথার পৃথিবীর সঙ্গে এঁটে আছে—কাজেই ইথার বায়ু থাকতে পারে না। এই সম্ভাবনাও মানা হলো না। পৃথিবী যদি ইথারকে টানে, তবে যে আলো ইথারের মধ্যে তার গতি পায়, সেও ইথারের সঙ্গে পৃথিবীর টানে একইভাবে সরে আসবে। এ সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয় তবে দূরের তারার আলো সব সময় একই দিক থেকে আসবে। কোনো বিচ্যুতি হবে না। বাস্তবে কিন্তু বিচুতি পাওয়া গেল। দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে তারাদের দূরত্ব মাপার সময় দেখা গেল, ছ' মাসের ব্যবধানে পৃথিবীর পরাবৃত্তের দুই অংশে তারার অবস্থান ঠিক এক জায়গায় পাওয়া যায় না। এর কারণ তারার আলোকের তুলনায় পৃথিবীরও সেকেণ্ডে 19 মাইল বা 30 কিলোমিটারের একটা গতিবেগ আছে। ইথার পৃথিবীর সঙ্গে একসঙ্গে চললে, তারার আলো ইথারের সঙ্গে একইভাবে সরে আসত। দিক পরিবর্তনও দেখা যেত না। যেহেতু দিক পরিবর্তন পাওয়া যায়, সেজন্য এ সম্ভাবনাও অচল হলো।

তৃতীয় সম্ভাবনায় এই কথা বলা হলো যে, আলোর উৎসের গতির পরিপ্রেক্ষিতে আলোর গতি সব সময় এক থাকবে। অর্থাৎ আলোর উৎস জোরেই চলুক বা আস্তে চলুক, উৎসের কাছে আলোর গতি সব সময় একই মনে হবে। এর কোনোও পরিবর্তন

হবে না। এ সম্ভাবনাটি আলোচনা করলে একটা সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, ইথারের মাধ্যমে আলোর গতির পরিবর্তন হবে, নইলে উৎসের কাছে আলোর গতি একই হতে পারে না। এ সিদ্ধান্ত কিন্তু তরঙ্গ-তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাছাড়া, জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে তখন জানা গেছে যে, আলোর গতি উৎসের গতির উপর মোটেই নির্ভর করে না। যমক তারার গতিবেগ মাপতে গিয়ে এটা আরও স্পষ্ট হলো।

মহাকাশে কাছাকাছি থাকা দুটি প্রায় সমান আকারের তারা খুঁজে পাওয়া যায় ; এরা উভয়েই উভয়ের চারদিকে জোরে ঘুরপাক খাচ্ছে। এদের বলা হয় যমক তারা। যেমন একটি ডামবেল, দুটি সমান আকারের গোলক ছোট একটি দণ্ডে বাঁধা। এখন এই ডামবেলটিকে উপরে ছুঁড়ে দেওয়ার পর যদি এটি গোলক দুটির এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরতে ঘুরতে নামতে থাকে, তবে আমরা ঐ ডামবেলটির মধ্যেই যমক তারার একটি মডেল খুঁজে পেতে পারি।

এই তারা দুটি ঘুরতে থাকার দরুন আমরা যদি এদের এক প্রান্তের দিকে নজর রাখি, তাহলে দেখব একটি তারা আমাদের কাছে আসছে আর অন্যটি দূরে সরে যাচ্ছে। পরে আবার দ্বিতীয় তারাটি কাছে আসবে, প্রথমটি যাবে দূরে। এখন যদি ধরা হয় যে, এই তারা দুটির আলোর গতিবেগ তারা দুটির কাছে আসা বা দূরে যাওয়ার গতিবেগের উপর নির্ভরশীল তাহলে তারা দুটি যখন কাছে আসবে তখন তাদের ঘোরার গতি হবে অনেক দ্রুত, অথচ ফেরার পথে এই গতি মনে হবে অনেক ধীর।

পরীক্ষায় কিন্তু গতির পরিবর্তনের কোনোও প্রভেদ ধরা পড়ল না। তৃতীয় সম্ভাবনাও নাকচ হলো।

কেন পাওয়া গেল না এই প্রশ্নের উত্তরে যে চতুর্থ সমাধানটি পাওয়া গেল তা যেমন জটিল, তেমনি আশ্চর্যের। সব বস্তুই তার গতির দিকে কিছুটা সঙ্কুচিত হয়, ফিট্‌জ-জিরাল্ডের (Fitzgirald) এই সঙ্কোচন-তত্ত্বকে আশ্রয় করে লরেন্স (Lorentz) সনাতন পদার্থবিদ্যার পদ্ধতি অনুযায়ী জটিল হিসাব করে এই অসঙ্গতির ব্যাখ্যা দিলেন।

একথা সত্যি, কোনো বাধার মধ্য দিয়ে যদি কোনো বস্তু যেতে চায়, তবে তার কিছুটা সঙ্কোচন আমরা আশা করি। এই সঙ্কোচন ঐ বস্তুটির উপাদানের উপর নির্ভর করবে। যদি উপাদান ঘাত-সহ হয়, শক্ত হয়, তবে সঙ্কোচন হবে কম। উপাদান নরম হলে সঙ্কোচনও বেশী হবে। কিন্তু আগের পরীক্ষায় সে সঙ্কোচনের ধারণা আমরা করেছি তা বস্তু-নিরপেক্ষ, উপাদান-নিরপেক্ষ—শুধু গতির উপর নির্ভরশীল। গতির পরিমাপ অনুযায়ী যে কোন বস্তুর সঙ্কোচন সব সময়েই এক।

অর্থাৎ যে কোনো বস্তু একই ভাবে বেগের হিসাব অনুযায়ী গতির দিকে সঙ্কুচিত হবে এটি একটি চিরন্তন সত্য।

এ সত্য সনাতন বিজ্ঞান যা পরিদৃশ্যমান জগতের উপর নির্ভরশীল, তাকে সচকিত করল। বিজ্ঞানী কৌতূহলে উজ্জীবিত হলেন।

মাইকেলসান-মরলে পরীক্ষায় পাওয়া তথ্যটাকেই যেন প্রমাণ করতে ফিট্‌জ্‌জিরাল্ড

1893 সালে তাঁর সঙ্কোচন-তত্ত্ব প্রচার করলেন। লরেন্স এই তথ্যের একটা নির্ভরযোগ ব্যাখ্যা সনাতন বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে দিতে পারলেন। সেটা 1895 সাল। লরেন্স বললেন, সব বস্তুই বিদ্যুৎ-চার্জে তৈরি। এইসব চার্জ আবার তড়িৎ বা চুম্বক ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে। এই চার্জ এবং তাদের ক্ষেত্র সমকালীন তড়িৎ-চুম্বক ক্ষেত্র তত্ত্ব অনুযায়ী ইথারেই থাকবে। লরেন্স বললেন, কোনো বস্তু ইথারের মধ্যে দিয়ে যখন যাবে, তখন বস্তু যা শুধু চার্জ দিয়ে তৈরি, তা ইথারের মধ্যে তৈরি করবে তড়িৎ-চুম্বক ক্ষেত্র। বস্তুটির গতি এই ক্ষেত্রটিকে প্রভাবিত করবে। ফলে চার্জগুলি বিকর্ষণের দরুন গতির বিপরিত দিকে সরে যাবে এবং বস্তুটিও সঙ্কোচন হবে। এই সঙ্কোচনের মাপ ফিট্জ্-জরাল্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হবে।

ফিট্জ্ জিরাল্ড-লরেন্সের তত্ত্ব ঠিক না বেঠিক, কোনো পরীক্ষায় তার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গেল না। পরে 1905 সালে আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্বে এই সঙ্কোচনের একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা করেন।

1895 সাল শেষ হল। ইথার আছে বা নেই, এই প্রশ্নের উত্তর মিলল না। ইথারের অস্তিত্বে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস ; তবু নেই কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ।

শতাব্দীর প্রথম দিনের সূর্য ইথারকে প্রশ্ন করেছিল কে তুমি ? উত্তর মেলে নি। শতাব্দীর শেষ সূর্য একই প্রশ্ন করল, কে তুমি ? এবারও উত্তর মিলল না।

তবুও সঙ্কোচন-তত্ত্বটি মানতে হলো। গতির ফলে বস্তুর এই সঙ্কোচন কবিদেরও চিন্তার খোরাক হয়ে দাঁড়ালো। একজন অজ্ঞাত কবি লিখলেন—

There was a young fellow named Fisk,
Whose fencing was exceedingly brisk.
So fast was his action,
The Fitzgirald contraction
Reduced his rapier to a disk.

অস্যার্থ ঃ

এক ছিল ওস্তাদ বাহাদুর জং
তরোয়াল ঘোরাতেন অতিদ্রুত মনোরম।
কিমাশ্চর্যম সঞ্চালন!
ফিট্জ্ জিরাল্ডী সঙ্কোচন
অসিটিরে খাটো করে রাখে শুধু হাতলম্॥

যা কিছু বিস্ময়ের তাই বিজ্ঞানীদের কাছে কৌতূহলের। আদি মানুষের কাছে চুম্বক ছিল বিস্ময়। বিজ্ঞানীর কাছে কৌতূহল।

অদ্ভুত এই চুম্বক। লোহাকে এ আকর্ষণ করে। দুই প্রান্তে আছে দুটি মেরু। ঝুলিয়ে রাখলে উত্তর দক্ষিণে লম্বমান হবে। আবার সমান মেরু মিলবে না কিছুতেই। সমান মেরুতে বিকর্ষণ আর অসমান মেরুতে আকর্ষণ।

1600 সালের আগে বিদ্যুৎ আর চুম্বক দুইই ছিল অজানা বস্তু। খেলনার দোকানে আলমারির ভিতরে পুতুলের মতো তা ছিল আকর্ষণের। খেলনাটি তখন হাতে আসে নি।

1600 সালে গিলবার্ট (Gilburt) আর 1640 সালে নিক্কোলো সাবিও (Niccolo Cabeo) বিদ্যুৎ আর চুম্বক তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দুইয়ের মধ্যে পেলেন সাদৃশ্য আবার বৈসাদৃশ্যও। বিদ্যুতেও খুঁজে পাওয়া গেল দুই মেরু তত্ত্ব। বিদ্যুৎ-আহিত বস্তু বিদ্যুৎ-অনাহিত বস্তুকে আকর্ষণ করবে। অথচ দুটি বিদ্যুৎ আহিত বস্তু পরস্পরকে করবে বিকর্ষণ।

খেলনাটা মজার, তবু হাতে আসে নি।

এরপর এল 1650 সাল থেকে 1750 সাল—100টি বছর। এ সময় ইউরোপ বেরিয়ে পড়ল দিগ্বিদিকে জাহাজ হাঁকিয়ে। বিজ্ঞানীও বেরিয়ে পড়লেন অজানাকে জানতে। এই একশ বছরে অনুসন্ধানী বিজ্ঞানীরা আলো গতি-তাপ আর বিদ্যুৎ তত্ত্ব খাড়া করলেন। রসায়নে ধারণা এল মূল পদার্থের। আর সঙ্গে সঙ্গে আবছা অস্পষ্ট একটা বোধ এল—হয়তো আলো, তাপ আর বিদ্যুতের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। সূর্যের আলো তাপ দেয় এবং তাপ দেয় বিদ্যুৎ। আবার উত্তপ্ত বস্তু আলো বিকিরণ করে। কোথাও একটা মিল আছে সমস্ত গরমিলের মধ্যে।

ধাপে ধাপে বিজ্ঞানীরা এগিয়ে চললেন।

1791 সালে বিজ্ঞানী গেলভানি (Galvani) বিদ্যুৎ-তরঙ্গ দিয়ে ব্যাঙের পা নাচালেন। গেলভানির নামই সেদিন হলো ব্যাঙ-নাচানো অধ্যাপক। এর ন'বছর পর 1800 সালে ভোল্টা (Volta) প্রকাশ করলেন বিভব প্রভেদ বা potential difference তত্ত্ব। এই তত্ত্বে রসায়ন ও বিদ্যুং তত্ত্বের একটি মিলের আঁচ পাওয়া যায়। ব্যাঙ-নাচানো গেলভানির ধারণা ছিল, ব্যাঙের শরীরে আছে বিদ্যুৎ। ভোল্টা বললেন, তা নয়। দুটি বিভিন্ন ধাতুর সংস্পর্শের জন্য বিদ্যুৎ তৈরি হবে। ভোল্টা তৈরি করলেন তড়িৎ কোষ বা electrical cell। তাঁর পরীক্ষায় পাওয়া গেল রাসায়নিক শক্তি বদলি বিদ্যুৎ শক্তি। কী ভাবে এ বিদ্যুৎ শক্তি এল তার ব্যাখ্যা পাওয়া গেল আরও প্রায় তিরিশ বছর পর 1832 সালে, ব্যাখ্যা-কর্তা ফেরাডে (Faraday)।

ফেরাডে পদার্থবিদ্। অণুরা molecule তত্ত্ব তাঁর হাতিয়ার। কিন্তু তড়িৎ কোষ বোঝাতে তিনি রসায়নের পরমাণু বা atom-কে ব্যবহার করলেন। দ্রবণ solution-এর ভিতর পদার্থ তার অণুর অংশে থাকে না ; অণুরা পরমাণুভাবে ভাগ হয়। এই হলো ফেরাডের সিদ্ধান্ত। অণু কেন যে পরমাণুতে ভাগ হবে, ফেরাড সে সমস্যার সমাধান করেন নি। কিন্তু সিদ্ধান্তটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ আকারেই দেওয়া হলো।

বিদ্যুৎ কোষে বিদ্যুৎ আসছে কোথা থেকে ? বিজ্ঞানীরা বললেন, পরমাণুর সঙ্গে বিদ্যুৎ শক্তির সম্পর্ক আছে। প্রতিটি পরমাণু একটি নির্দিষ্ট বিদ্যুৎ শক্তির আধার। ফেরাডে যা বললেন তাকে যদি একটা মডেলে দাঁড় করানো যায় তবে যা পাই তা হলো এই ঃ

প্রত্যেকটি পরমাণু একটা নির্দিষ্ট বিদ্যুৎ আধান বা charge বহন করে। রসায়নের যৌগে আমরা আগে দেখেছি, একটি মূল পদার্থের নির্দিষ্ট সংখ্যক পরমাণু আরেকটি পদার্থের নির্দিষ্ট সংখ্যক পরমাণুর সঙ্গে শুধু মিলবে। যেমন দুটি হাইড্রোজেনের পরমাণু একটি অক্সিজেন পরমাণুর সঙ্গে মিলে তৈরি করবে একটি জলের অণু। এই মিল ঘটাবার ক্ষমতা প্রত্যেক পদার্থের একটা গুণ। কতটা পরমাণু মিল ঘটবার জন্য যোগ দেবে তার ধর্ম বোঝা যায় পদার্থটির যোজ্যতা বা valency দিয়ে। হাইড্রোজেনের যোজ্যতা এক, অক্সিজেনের দুই। ফেরাডের মডেলে পরমাণুর চার্জও তার যোজ্যতার উপর নির্ভরশীল। যেমন হাইড্রোজেনের চার্জ এক এবং অক্সিজেনের চার্জ দুই। ফেরাডে আরও দেখালেন, পদার্থগুলির কতগুলো নেগেটিভ বা ঋণাত্মক এবং কতগুলি পজিটিভ বা ধনাত্মক। মেণ্ডেলিয়ভের মূল পর্যায় চক্র বা periodic table থেকে ফেরাডে দেখালেন চক্রের সারির প্রথম দিকের পদার্থগুলি নেগেটিভ চার্জ বহন করে আর শেষের দিকের গুলি পজিটিভ। শুধু তাই নয়, আপেক্ষিকভাবে এক সারির পাশাপাশি দুটি পদার্থেরও অবস্থানের তারতম্যের জন্যে চার্জের প্রভেদ আছে, ধর্মেরও প্রভেদ আছে। লিথিয়াম বেরিলিয়ামের চেয়ে বেশী নেগেটিভ হবে এবং ফ্লোরিন অক্সিজেনের চেয়ে বেশী পজিটিভ। ফেরাডে আরও দেখালেন যে, তড়িৎ বিশ্লেষণ বা electrolysis প্রক্রিয়ায় পরমাণু দল বেঁধে আসে, প্রত্যেকের সঙ্গে থাকে নির্দিষ্ট চার্জ।

চুম্বক আর বিদ্যুতের একটি বিশেষ ধর্ম, আবেশ বা induction। চুম্বক যাকে আকর্ষণ করবে সেই পদার্থের মধ্যে খানিকটা চুম্বকগুণ ছড়িয়ে দেবে। তেমনি বিদ্যুৎ আহিত বস্তু অন্য বস্তু যা বিদ্যুৎ আহিত হতে পারে, তার মধ্যেও সঞ্চার করবে বিদ্যুতের চার্জ। চুম্বকের বেলা আবিষ্ট বস্তু যেমন পাবে বিপরীত মেরু, বিদ্যুতের চার্জও তেমনি আবিষ্ট বস্তুকে দিবে বিপরীত চার্জ।

এ গুণটিকে দেখে বিদ্যুৎ আর চুম্বকের সামঞ্জস্য আছে কিনা বিজ্ঞানীরা ভাবেন।

1820 সালে অরস্টেড (Orsted) আবিষ্কার করেন যে, তড়িৎ-প্রবাহ চুম্বক ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে। স্বাভাবিক ভাবেই বিজ্ঞানীরা ভাবলেন, এর উল্টোটা কি সম্ভব ? অর্থাৎ চুম্বক ক্ষেত্র তড়িৎ-প্রবাহ সৃষ্টি করতে পারবে কি ?

মাইকেল ফেরাডে 1831 সালে তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ আবিষ্কার করেন। চুম্বকও পারে বিদ্যুৎ তৈরি করতে। এক্ষেত্রে শক্তির রূপান্তরিত অবস্থা দ্বিমুখী হলো।

ফেরাডের এই আবিষ্কার তড়িৎ বিজ্ঞানে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন এনেছে। এই আবিষ্কারের ফলেই তড়িৎ-যন্ত্রের উদ্ভাবন সম্ভব হলো। ব্যবহারিক দিকে বিজ্ঞান একটা বিরাট পদক্ষেপ করল।

এসব আবিষ্কার কিন্তু বিদ্যুৎ বা চুম্বকের তাত্ত্বিক দিকটা বোঝাতে পারে নি। এ সম্বন্ধে একটা ধারণা প্রথম পাই ভিলহেল্ম্ ওয়েবারের (Wilhelm Waber) কাছ থেকে। ওয়েবার চুম্বক তত্ত্বের কারণ দিয়েছিলেন অতি ক্ষুদ্র চুম্বক অণুর উপস্থিতি কল্পনা করে। তিনিই কল্পনা করলেন, তারের মধ্য দিয়ে যে কারেন্ট যায় তা অতি ক্ষুদ্র পজিটিভ আর নেগেটিভ কণার গতির ফলেই হয়। দুটি ক্ষেত্রেই ওয়েবার কণার উপস্থিতি ঘোষণা করলেন। তাঁর এই তত্ত্ব দিয়ে চুম্বক ক্ষেত্র পরিবর্তনের ফলে যে কারেন্ট পাওয়া যায় তার গাণিতিক সমীকরণও করা সম্ভব হল। কিন্তু এই মত বিচিত্র পথে গেলেও সর্বত্রগামী হল না।

তড়িৎ-চুম্বক তত্ত্বের সঠিক ধারণা দিলেন জেমস ক্লার্ক মেক্সওয়েল (James Clerk Maxwell)। 1850 সারের কাছাকাছি সময়ে আলোর তরঙ্গাকৃতি স্বীকৃতি পেয়েছে। ইথার সম্পর্কে ধারণাও গড়ে উঠেছে। জানা গেছে আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে 3×10^8 মিটার। দৃশ্য আলোকের তরঙ্গও মাপা হয়েছে। এদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 10^{-5} থেকে 10^{-4} সেণ্টিমিটারের মধ্যে। ইথার ও আলোক তরঙ্গের মডেল মেক্সওয়েলকে অনুপ্রেরণা যোগাল। বিদ্যুৎ কারেণ্ট, চার্জ এবং চুম্বকের ক্ষেত্রে—এদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ফেরাডে এবং তাঁর অনুগামীরা ব্যবহারিক দিকে দেখিয়েছেন। এদের নতুন করে তরঙ্গতত্ত্বে সাজানো কি যাবে?

পূর্বসূরীদের নিয়মগুলি মেক্সওয়েল অন্যভাবে সাজালেন। সহজ গণিতের ছকের বদলে আনলেন কেলকুলাস ও ভেক্টর—উচ্চ গণিতের দুটি শাখা। এই নূতন করে সাজানো নিয়ম আর সমীকরণগুলি থেকে মেক্সওয়েল বহু সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলেন। তিনি বললেন, বিদ্যুৎ বা চুম্বক ক্ষেত্রে সামান্যতম বিশৃঙ্খলা আলোর গতি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসবে। তিনি আরও বললেন, যদি এই বিশৃঙ্খলার উৎপত্তি কেন্দ্রটি স্পন্দনশীল বা oscillatory হয়, তবে এই বিশৃঙ্খলার আলোর গতির সমান একটি তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গ হয়ে বেরিয়ে আসবে। এই তরঙ্গের ধর্ম আলোর ধর্মের মতোই হবে। এদেরও থাকবে প্রতিসরণ এবং প্রতিফলন। আলোর মতো এরাও পোলারাইজ্‌ড্ বা সমবর্তন হবে, শক্তি বহন করবে, এবং শক্তি সঞ্চার করবে। তা ছাড়া থাকবে ভরবেগ বা momentum।

মেক্সওয়েলের এই ধারণা বিজ্ঞানীরা সোজাসুজি মেনে নিতে পারলেন না। তাঁর ধারণা সত্য কিনা দেখতে গিয়ে হেনরিক হার্টৎস্ (Heinrich Hertz) বিদ্যুৎ-চুম্বক তরঙ্গ পেলেন। তিনি দেখলেন, অতিদ্রুত স্পন্দনশীল বা অসিলেটরি বিদ্যুৎ-চার্জ মেক্স-

ওয়েলের মত অনুযায়ী বিদ্যুৎ-চুম্বক তরঙ্গের সৃষ্টি করছে। এদের ধর্ম ও গুণ মেক্সওয়েলের সিদ্ধান্ত অনুসারী। লেবরেটরিতে হার্টৎস্ বেতার তরঙ্গ পেলেন। রেডিও আবিষ্কার সহজ হল।

সনাতন বিজ্ঞান তিনটি বিশেষ নিয়মের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এরা হলো নিউটনের গতিবিজ্ঞান, মেক্সওয়েলের বিদ্যুৎ-চুম্বক-তরঙ্গ তত্ত্ব এবং তাপ-গতিবিজ্ঞানের নিয়ম দুটি। এই তিনটি হাতিয়ার দিয়ে বিজ্ঞানীরা পার্থিব নিয়ম শৃঙ্খলা বুঝতে চাইলেন। তাঁদের ধারণা হলো, জ্ঞানের চাবিকাঠি হাতে এসেছে ; ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের প্রগতি শুধু আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে এবং তথ্যের উপর বিজ্ঞানের তত্ত্ব প্রয়োগ করেই জানা যাবে।

বিদ্যুতের পরিচালন কী করে হয়, সে সমস্যার সমাধান ইথার দিয়ে সর্বত্র হলো না। তড়িৎ বিশ্লেষণে বিদ্যুতের সৃষ্টি অণুর চার্জ দিয়ে প্রমাণ হয়েছিল। মেক্সওয়েল তাই তাঁর সিদ্ধান্তগুলি ইথারের উপস্থিতি ধরে করলেও, সমীকরণগুলি লিখলেন এটম বা কণার আবির্ভাব ধরে। মেক্সওয়েলের এই দ্বান্দ্বিক মডেল একটা বলিষ্ঠ কল্পনা। যত দিন যায় ততই মেক্সওয়েল এটম বা কণার গতিতেই যে বিদ্যুৎ, সে তত্ত্বে ঝুঁকছেন। ইথার তাঁর কাছে প্রয়োজনীয় হচ্ছে না। বস্তুর অকঠিন অবস্থা অথবা কণা স্বাভাবিকভাবে চাপের পরিবর্তনে এবং সাধারণ মাধ্যম বা ডাই-ইলেক্ট্রিকের ভরের প্রভেদ গতি পাবে। এ গতি ইথার থাকলেও হবে, না থাকলেও কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। চিন্তার এই অবস্থায় সংশয়ের দৃষ্টি নিয়ে ইথারকে দেখা শুরু হয়। এর অনেক পরে 1902 সালে মাইকেলসন বলে ওঠেন, ইথার নিজেই বিদ্যুৎ অথবা অন্যভাবে বলা যায় ইথারের চাপের পরিবর্তন বা ইথারের অবস্থার পরিবর্তনের অন্য নাম বিদ্যুতের কারেন্ট।

একথা অনেক পরের। তখনও বিদ্যুৎ-কে কখনও ভাবা হচ্ছিল পদার্থ কণা, কখনও তরঙ্গ। 1881 সালে হেল্‌ম্‌হোৎস্ (Helmholtz) জানালেন, মূল পদার্থ এটমে তৈরি। এই সিদ্ধান্ত যদি মেনে নেওয়া যায় তবে বিদ্যুৎ, তা পজিটিভই হোক বা নেগেটিভ হোক, অতি ক্ষুদ্র অংশে ভাঙা সম্ভব হবে। তাদের বলা যেতে পারে বিদ্যুতের এটম।

ওয়েবারের তত্ত্বকে আবার যেন প্রতিষ্ঠিত করা হলো। শুধু বিদ্যুৎ নয়। আরও একটা ঘটনা বিজ্ঞানীদের ভাবিয়ে তুলল। এদের কণারূপ আর তরঙ্গরূপ আছে। এই দ্বান্দ্বিক ধারণায় বিজ্ঞানীরা তখন দিশেহারা।

অনেক, অনেক আগে 1705 সালে দেখা গিয়েছিল, বিদ্যুৎ যন্ত্রের থেকে যে স্পার্ক বেরোয় তা তরল বায়ুস্তর থাকলে সহজে ছড়াবে। সাধারণ বায়ুর চাপে এটা কিন্তু হয় না। 1838 সালে ফেরাডে একটা কাচের নলে নিম্নচাপে বায়ু ভরে বিদ্যুৎতরঙ্গ পাঠালেন। তিনি পজিটিভ ইলেকট্রোড বা এনোড থেকে প্রায় নেগেটিভ ইলেকট্রোড বা কেথড পর্যন্ত লম্বা একটা নীল-লোহিত আলোর শিখা দেখলেন। কেথডেও একটা দীপ্তি দেখা গেল। আর কেথডের দীপ্তি ও নীল-লোহিত শিখার মাঝে কিছু জায়গা অন্ধকার। এই অন্ধকার জায়গার নাম দেওয়া হলো, ফেরাডের অন্ধকার স্থান বা ফেরাডের dark space। ফেরাডের এই পরীক্ষার ফলে আমরা নিওন সাইনের সূচনা দেখলাম।

ফেরাডের পরীক্ষার পর দীর্ঘদিন কেটেছে। এই পরীক্ষার আর উন্নতি হয় নি। অভাব তখন ছিল একটাই, বায়ুর চাপ কমানো। ভাল ভেকুয়াম পাম্প তখনও তৈরী হয় নি। অবশেষে 1855 সালে, মেক্সওয়েলের বিদ্যুৎ-চুম্বক-ক্ষেত্র তত্ত্ব আবিষ্কারের বছরে গাইসলার তৈরি করলেন নতুন ধরনের ভেকুয়াম পাম্প্। ফেরাডের সেই পরীক্ষা আবার নতুন করে শুরু হলো।

প্লুকার (Plucker), হিটোর্ফ (Hittorf), গোল্ডস্টেইন (Goldstein) এবং সব-শেষে ক্রুকস (Crookes) এই কেথডের দীপ্তি নিয়ে কাজ করলেন। যত নলের ভেতর বাতাসের চাপ কমানো গেল, ততই দেখা গেল কেথডের দীপ্তি প্রসারিত হচ্ছে, ফেরাডের অন্ধকার স্থানও হচ্ছে দীর্ঘ।

এদের পরীক্ষার ফলে জানা গেল, এই রশ্মি বা রে (ray) সরলরেখায় চলে, কাচকে প্রদীপ্ত করতে পারে চুম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগে এ রেখা আনত হয়।

আরও দেখা গেল, এই রে যে-কোনো কেথডের গা থেকে লম্বভাবে বেরোবে। কাজেই বক্রী আয়নার মতো বক্র কেথড থেকে যে রে বেরোবে তাদের একটি বিন্দুতে আনা যেত পারে।

কেথড কী বস্তুর তৈরি তার উপর কেথড-রে নির্ভর করে না। আবার, এই রে রাসায়নিক সংযোগে সাহায্য করে।

ক্রুক্স্ দেখলেন ঐ সব গুণ ছাড়াও কেডথ রে শক্তি বহন করে—পাতলা পাতকে এ উত্তপ্ত করতে পারে ; আবার এর ভরবেগ বা momentum আছে।

সব কিছু দেখভাল করে ক্রুক্স্ বললেন, কেথড-রে অণুর স্রোত। তাঁর মতে কাচের নলের ভেতর যে সামান্য বাতাস পড়ে থাকবে, তারই অণু যখন কেথডকে আঘাত করবে তখন কেথড থেকে এরা খানিকটা নেগেটিভ চার্জ নিয়ে ছিটকে বেরিয়ে আসবে। জোরে বেরিয়ে আসার সময় কাছাকাছি অন্যান্য বায়ুর অণুগুলিকে এরা আঘাত করবে, তারা প্রদীপ্ত হবে। কেথড থেকে দূরে যে বায়ু-অণুগুলি থাকবে তাদের গতি এই চার্জ-পাওয়া বায়ু-অণুর থেকে অনেক কম। চার্জবাহী অণুগুলি মন্থরগতি এই অণুগুলিকে আসতে বাধা দেবে। সেখানে তাই থাকবে অন্ধকার। অথচ অন্ধকার স্থানের বাইরে দেখা যাবে হালকা আলোর আভাস। চার্জবাহী অণু কিছু বায়ুর অণুকে প্রদীপ্ত করতে পারবে।

ক্রুক্স্ যা দেখেছিলেন, তার সবটাই তার মডেলের সিদ্ধান্তে প্রমাণ করতে পারলেন। কিন্তু দেখার বাইরেও প্রশ্ন থাকে। একটা প্রশ্ন হচ্ছে, এই আলো যদি অণুর দ্রুত সঞ্চারে হয়ে থাকে, ডপলারের নীতি (Doppler Effect) কি এদের উপর খাটবে ?

ডপলারের নীতিটা কী ? শব্দের বেলা দেখেছি শব্দ যত কাছে আসে তত জোরে শোনা যায়। যতদূরে শব্দের উৎপত্তি তত আস্তে তা শোনা যাবে। আলোর ব্যাপরে দেখা যাবে আলো যত কাছে আসবে তত তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দর্শকের কাছে আপাতত কমে যাবে বলে মনে হবে। এই যে ডপলারের নীতির ফলশ্রুতি এটা শব্দ বা আলোর উৎস বস্তুর বেগ আর শব্দ বা আলোর তরঙ্গের বেগের অনুপাতে বাড়বে বা কমবে। চলন্ত

রেলের হুইস্‌ল্ বাইরে দাঁড়ানো শ্রোতার কাছে যেমন লাগবে, চলন্ত রেলের আলোর দীপ্তি সে রকম মনে হলেও আপাতত দর্শকের কাছে আলোর রঙের কোনো পরিবর্তন নজরে আসবে না। কারণ আলোর গতিবেগ শব্দের চেয়ে অনেক বেশী। এই যে আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘের পরিবর্তনের কথা বলছি, এটা শুধু আলোর বর্ণালী রেখা পরীক্ষা করেই ধরা পড়ে। তেকোণা কাচের ভিতর আলো পাঠালে যে বর্ণালী আমরা সাধারণত পেয়ে থাকি, ডপলারের নীতি অনুযায়ী তাদের কিছু জায়গা বদল হবে। পরীক্ষায় কিন্তু বর্ণালীর রেখার জায়গা বদল দেখা গেল না। এর থেকে একটা প্রমাণই পাওয়া গেল, অণুর থেকে আলো আসছে তাদের গতি দ্রুত নয়।

জার্মানির গোল্ডস্টেইন এবং হার্ট্‌ৎস ভাবলেন কেথড-রে তড়িৎ-চুম্বক-তরঙ্গ হবে। এই সিদ্ধান্তে ক্রুক্‌সের মডেলের থেকে মাত্র দুটি ধর্মে মিল থাকছে না।

এক, কেথড-রে কেথডের গা থেকে যে কোনো দিকে বেরোতে পারবে (কেবল লম্বভাবে নয়)। দুই, কেথড-রে চুম্বক ক্ষেত্রে আনত হবে না (বাস্তব পরীক্ষায় এই আনত অবস্থা দেখা গেছে)। এই দুটি ধর্ম সাধারণ আলোর ধর্ম। অথচ পরীক্ষায় কেথড-রে'র ব্যবহার অন্য রকম। এঁরা বললেন, আলো যে লম্বভাবে বেরোচ্ছে, সেটা বিশেষ করে আলোর উৎস তাপশক্তি না হয়ে বিদ্যুৎশক্তি হবার ইচ্ছে হয়েছে। আর চুম্বক ক্ষেত্রে আনত হওয়া সেটাও সম্ভব, কারণ ইথার, যার বহু গুণ আমরা আগেই দেখেছি, তার আরও একটা গুণ আছে বা থাকতে পারে—তা হলো কোনো বিশেষ রশ্মি যদি ইথারের মধ্যে দিয়ে যায় তবে ইথারের কিছু বিকৃতি চুম্বক-ক্ষেত্রের ও রশ্মির ব্যবহারের ফলে লক্ষ্য করা যেতে পারে ; ঐ বিকৃতির রশ্মির আনত হবার কারণ।

অতএব দুটি তত্ত্ব পাওয়া গেল। ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা ক্রুক্‌সের পক্ষে, জার্মান বিজ্ঞানীরা হার্ট্‌ৎসের দলে। এই কেথড-রে নিয়ে বিজ্ঞানীরা ব্রিটিশ আর জার্মান—এই দুই শিবিরে ভাগ হয়ে গেলেন। 1859 সাল থেকে শুরু করে 1893 সাল পর্যন্ত দুই শিবির নিজের নিজের বক্তব্যের সমর্থনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে গেল।

1893 সালে ব্রিটিশ পদার্থবিদ্ জে, জে, টমসন (J. J, Thomson) কেথড-রের গতিবেগ মাপার চেষ্টা করেন। টমসন ব্রিটিশ শিবিরের বিজ্ঞানী, জার্মানীর তরঙ্গ-তত্ত্ব তাঁর পছন্দ নয়। চুম্বক-ক্ষেত্রে ইথারের বিকৃতির ধারণা তাঁর মনে লাগে না। তাঁর ধারণা, বিদ্যুৎ চুম্বক তরঙ্গ ক্ষেত্রে যদি ইথারের বিকৃতি ঘটে তবে ইথারে ফ্লুইড তত্ত্ব বা অকঠিন ভাব থাকবে না। ইথার বরং হবে মিহিদানার মতো ছোট ছোট দানার সমষ্টি। ইথারের প্রত্যয়ে এই ধারণা সম্পূর্ণ উল্টো। টমসন অবশ্য মনে করেন যে, কেথড-রে'র একটা প্রদীপ্ত করার ক্ষমতা আছে। এমনকি কেথড-রে নল বা টিউব থেকে কিছু দূরের আরও একটি কাচের নল তিনি প্রদীপ্ত হতে দেখেছিলেন। এই যে দেখা, টমসন তা নিয়ে আর মাথা ঘামালেন না। বায়ুশূন্য নলের ভেতর থেকে যে রশ্মি বেরোচ্ছে তা যে দূরের বস্তুকেও প্রদীপ্ত করতে পারে—এই যে একটা নতুন বিস্ময় এটা কৌতূহলী করে রণ্টগেন সাহেবকে। টমসন এ নিয়ে ভাবলে, হয়তো রণ্টগেনের আগেই আবিষ্কার করতেন এক্স-রে।

অতি বেগুনি রশ্মিরও প্রদীপ্ত করার ক্ষমতা আছে। অতি বেগুনি রশ্মি মেক্সওয়েলের বিদুৎ-চুম্বক তত্ত্ব মানে। তার গতিবেগও জানা।

টমসম কেথড রে'র গতিবেগ মাপলেন। বললেন, বেগ সেকেণ্ডে 2×10^5 মিটার। অতি বেগুনি রশ্মির বেগ আলোর গতির সমান—সেকেণ্ডে 3×10^8 মিটার। সুতরাং কেথড-রে বিদ্যুৎ চুম্বক তরঙ্গ নয়, গতিবেগ অনেক কম।

এ ঘটনা ঘটে 1895 সালে। বিরাট একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন নিয়ে বছর শেষ হলো। জানা গেল না, কেথড-রে কণা না তরঙ্গ।

আলোর ধর্ম নিয়ে যখন বিজ্ঞানীরা ভাবছেন, তখন পদার্থবিদ্যার অন্য শাখাগুলিতেও অন্য বিজ্ঞানীরা ব্যস্ত। সতের শতক থেকে যন্ত্র বিজ্ঞানের উন্নতি হতে শুরু হল। সবারই চেষ্টা ভালো আরো ভালো যন্ত্রের আবিষ্কার। এই চেষ্টা করতে গিয়ে দেখা গেল যন্ত্রগুলোর নিয়ম জানা, তাদের কার্যকারিতার সীমা বোঝা একান্ত দরকার। বিজ্ঞান তাই এ যুগে তথ্য-ভিত্তিক। পাঁচটি মূল প্রশ্ন, কে-কী-কেন-কবে-কোথায়, এসব ছেড়ে বিজ্ঞান কেমন করে এর জবাব খুঁজতেই ব্যস্ত।

গেলিলিওর পর নিউটনই বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক অংশের দিক্‌পাল। একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। যে বছর গেলিলিও মারা যান নিউটনের জন্ম সেই বছর। যেন বিজ্ঞানের অগ্রগতির রিলে রেসে গেলিলিও তার দৌড়ের শেষে নিউটনের হাতে ব্যাটনটি তুলে দিলেন।

নিউটন বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন। অভিজ্ঞতা-প্রসূত জ্ঞানকে একটা সুসঙ্গত আকারে তিনি দাঁড় করালেন। দেখা গেল এই পৃথিবীর বস্তুর যে নিয়ম অথবা বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার যে নিয়ম সেই একই নিয়ম খাটছে সৌরজগতে। গ্রহ-উপগ্রহের গতির তত্ত্ব বোঝা সহজ হলো। মাপকাঠি হাতে দিলেন নিউটন।

গতিবিজ্ঞান পদার্থের অন্য শাখাতেও হাত বাড়াল। গতিবিজ্ঞান আর তাপ তত্ত্বের বিশ্লেষণ করে গড়ে উঠল তাপ-গতিবিজ্ঞান বা thermo-dynamics।

স্টিম ইঞ্জিনের আবিষ্কার হয়েছে। এসেছে পেট্রোল আর ডিজেল ইঞ্জিন। এই সব যন্ত্রের কাছে পাওয়া তথ্য থেকে জানা গেল তাপ-গতিবিজ্ঞানের একটি সত্য—বস্তু সকলের মোট শক্তির পরিবর্তন হয় না। শক্তি নিত্য। মোট শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি নেই। যা ঘটে তা শক্তির রূপান্তর মাত্র।

যেমন তাপ একটি শক্তি। জল তাপের ফলে বাষ্প হলো। বাষ্প চালাবে যন্ত্র যেখানে তাপশক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে।

এ যুগে মানুষের ধারণা ছিল যে, এমন যন্ত্র আবিষ্কার করা সম্ভব হবে যা একবার চালু হলে, নিজেই নিজের থেকে শক্তি তৈরি করে আবহমান কাল চলতে পারবে। শক্তির এই রূপান্তর তত্ত্ব এই ধারণার ফানুস ফাটিয়ে দিল। বাইরে থেকে শক্তি যুগিয়ে গেলেই তো যন্ত্র দেবে রূপান্তরিত শক্তি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় শতকে পরীক্ষার ফলে জানা গেল বাষ্পচালিত যন্ত্রগুলিতে যতটা বাষ্পের তাপ দেওয়া হচ্ছে তার সম্পূর্ণটা কিন্তু কখনই ব্যবহার করা যাচ্ছে না।

কাজেই তাপ গতিবিজ্ঞানের আগের যে সূত্রটির কথা বলা হলো—মোট শক্তি অপরিবর্তনীয়—তা যন্ত্রে খাটছে না। হিসাব অনুযায়ী যন্ত্রের যে কার্যকারিতা হবার কথা, প্রাপ্তি তার চেয়ে কম। সুতরাং তাপ গতিবিজ্ঞানের আগের সূত্রটির ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজন হলো আরও একটি অতিরিক্ত নতুন সিদ্ধান্তের। নানান বিজ্ঞানী সিদ্ধান্তটির প্রকাশ করলেন। ভঙ্গী তাদের ভিন্ন, অর্থের দিক থেকে মোটামুটি এক। এদের মধ্যে ক্লাউসিয়াসের দেওয়া তত্ত্বটিই মোটামুটি বিজ্ঞানীদের কাছে উপযোগী মনে হলো।

এটি ক্লাউসিয়াসের এনট্রপি (entropy) তত্ত্ব। এনট্রপি কী বোঝার আগে, বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্তগুলো একটু পরীক্ষা করে দেখা যাক।

কেলভিন (Kelvin) বললেন, পারিপার্শ্বিক শীতলতম বস্তুর চেয়েও শীতল কোনো বস্তুকে আরও ঠাণ্ডা করলে তাপশক্তি কিছুতেই গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হবে না। সহজ কথায় যে শীতে একেবারে কাবু, সে জবুথবু হয়েই থাকবে, তাকে নড়ানো যাবে না।

ক্লাউসিয়াস বললেন, বাইরের সাহায্য ছাড়া কোন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র একটি শীতল বস্তু থেকে একটি উষ্ণ বস্তুতে তাপ সঞ্চারিত করতে পারবে না।

আমাদের বাইরের জগতেও এ তত্ত্ব প্রযোজ্য ; উত্তমর্ণ যতই মেজাজ দেখান, আদালতের সাহায্য ছাড়া ঠাণ্ডা ঘোড়েল অধমর্ণের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে পারবে না।

এ দুটি সিদ্ধান্ত একটা কথায় জানাচ্ছে—গরম বস্তু থেকে তাপ ঠাণ্ডা বস্তুতে নিজের থেকেই যেতে পারে। কিন্তু ঠাণ্ডা বস্তুকে আরও ঠাণ্ডা করে গরম বস্তুকে আরও গরম করতে হলে দরকার বাইরের সাহায্য।

অর্থাৎ তাপের প্রবাহ একমুখী। বিপরীতমুখী করতে হলে দরকার বাইরের শক্তি।

এই সিদ্ধান্তগুলি ক্লাউসিয়াস এক সূত্রে প্রকাশ করলেন। এটি ঘটে 1875 সালে। ক্লাউসিয়াসের ধারণা মতো ভাবা হয় যে, শক্তির মতো সব বস্তুর আরও একটা মূল ধর্ম আছে। একে বলা হয় বস্তুর এনট্রপি। অন্তরিত (closed) বস্তুর পরিবর্তনে এনট্রপির পরিবর্তন হয় না—অন্যথায় এটি বাড়ে। সূত্রাকারে বলা হল—পুরোপুরি অন্তরিত বস্তুর এনট্রপি, বস্তুর কোনও রূপান্তরেই কমে না। এটি তাপ- গতিবিজ্ঞানের দ্বিতীয় সূত্র, যাকে এনট্রপি সূত্রও বলা হয়।

এনট্রপি কী? দর্শনশাস্ত্রে এনট্রপি একটা অবস্থা। বিশ্বের সব বস্তু আর শক্তি অন্তিমকালে তুচ্ছ হয়ে যে নিশ্চল সাম্য অবস্থা পায় তাই এনট্রপি। এ অবস্থার বর্ণনা ঋগ্‌বেদে নাসাদীয় সূক্তে বলা আছে।

নাসাদাসীন্নো সদাসীৎ তদানিং……ইত্যাদি।

—"তখন অস্তি ছিল না, নাস্তিও ছিল না, অন্তরীক্ষ ছিল না, আর তার অতীত আকাশ ছিল না। কে আরবণ করল? অথবা কোথায় এবং কী সুখে? অনন্ত গহীন পারাবারই কি তখন ছিল? তখন মৃত্যুও নেই, নেই অমৃত। রাত্রি বা দিনের ভেদ ছিল না ; শুধু সেই একজন আপন শক্তি দিয়ে বায়ুহীন কালে নিশ্বাস নিয়ে বর্তমান ছিলেন। তিনি ছাড়া আর কিছুই ছিল না।"

এই ঋগ্‌টিতে সৃষ্টির আগে কী ছিল তাই বলা হচ্ছে। এই যে শান্ত নীরবতা, এ যেন ঝড়ের আগের স্তব্ধতা—a lull before a storm। অন্তিম কালের বর্ণনাতেও সেই স্তব্ধতা।

তাপগতি-বিজ্ঞানের এনট্রপি কিন্তু একটা মাপ। যেমন আমরা মাপি চাপ (pressure), ঘনত্ব (density) বা তাপাঙ্ক (temperature), এনট্রপিও বস্তুর অবস্থার পরিমাপ। ক্লাউসিয়াসের বক্তব্য অনুযায়ী আগের সূত্রটিকে এভাবে লেখা যেতে পারে।

সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ বা অন্তরিত (closed) তাপ-গতিবিজ্ঞানের প্রণালীতে যদি কোনো কাজ হয় তবে সেই অবস্থার রূপান্তরিত শক্তির ঘাটতির মাপই এনট্রপি। এই পরিমাপ তাপের বৃদ্ধির মাপের আনুপাতিক হারেই বাড়বে। শুধু হিসাবটা হবে absolute temperature বা শূন্যাঙ্কের চেয়ে 273° নীচে তাপাঙ্কের গণনায়। কারণ ঐ তাপাঙ্কে এই পরিমাপ সম্পূর্ণ শূন্য অবস্থা বা entropy অবস্থা হতে পারে। আরো সহজ কথায় ঘাটতির যে মাপ আমরা সাধারণ সময়ে বস্তুর শক্তির পরিবর্তিত অবস্থাতে দেখেছি তা চরম শূন্য তাপমাত্রায় বা absolute temperature-এ থাকছে না, চরম শূন্যে কোনও জঙ্গমতা নেই, সব কিছুই স্পন্দনশীল-স্থির,—কাজ নেই, সুতরাং শক্তির মাপের ঘাটতিও নেই।

চরম শূন্যে পরম শৃঙ্খলা। বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় চরম শূন্য অবস্থার উপরেই। তখন বস্তুর অণু বা molecule-গুলি নিয়মভাঙ্গা দল গড়ে তোলে। তাদেরই কতকগুলি লুকিয়ে চুরি করে নেয় পরিবর্তনকারী শক্তির কতকটা। সেটাই ঘাটতি।

ধরা যাক রাষ্ট্রে নিয়ম-শৃঙ্খলা আইনকানুন কড়াভাবে খাটছে। রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রবল প্রতাপে সবকিছু ঠাণ্ডা, গোলযোগ নেই, গোলমাল নেই। রাষ্ট্রযন্ত্র হঠাৎ যদি শিথিল হয়, তবে রাষ্ট্রের লোকজন প্রথমে হয়তো অবাক হবে। তারপর লাইনভাঙা ড্রিলের ছাত্রদের মত ছোটখাট জটলা শুরু করবে। নানা দল, নানা ভাগ। তাদের যে কাজ করতে দেওয়া হবে, তারা কাজটা ঠিকই করবে, কিন্তু কোনো দল হয়তো ফাঁকি দেবে, যতটা কাজ পাবার কথা, তা পাওয়া যাবে না।

চরম শূন্যাঙ্কের উপরে কাজের পদ্ধতিও তাই। বিশৃঙ্খলার সুযোগে কোন এক গুচ্ছ অণু তাদের কাজ করবে না ; যতটা পাওয়া উচিত, কাজ পাওয়া যাবে তার চেয়ে কম। এটাই ঘাটতি আর এর পরিমাপই এনট্রপি।

এনট্রপির ধারণা শক্তির ঘাটতি থেকে, গোলমেলে অবস্থাতেই এর জন্ম। সেই গোলমাল দেখা গেল একে গণিতের কাঠামোয় সাজাতে গিয়ে। এনট্রপির পরিবর্তন সব সময় একমুখী। সাধারণ গণিতের সঙ্কেতে এনট্রপিকে লিখলে দেখা গেল একটি অসমীকরণ অঙ্ক আসছে। অথচ বিজ্ঞানের সব মূলসূত্র লেখা সমীকরণের সাহায্যে। এই যে বিরোধ এবং বৈশিষ্ট্য সেটাই বিজ্ঞানীদের কৌতূহলের কারণ হয়ে দাঁড়াল।

ঐ যুগ ছিল তথ্যভিত্তিক, সব কিছু যন্ত্রের মডেলের মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করার একটা চেষ্টা চলছিল। তাসের দেশের তাসদের মতো সব কিছু চলছিল নিয়ম মত্তে গতি-

বিজ্ঞানের নিয়মে। এই গতিবিজ্ঞানের সাহায্যে এনট্রপি সূত্রের ব্যাখ্যার চেষ্টা হয়। বোল্টৎসম্যান (Boltzmann) এবং ক্লাউসিয়াস কেলকুলাসের সাহায্যে গতি-বিজ্ঞানের কাঠামোয় কয়েকটি ব্যাখ্যা দেন। সেটি কিন্তু সে আমলের বিজ্ঞানীদের, এমন কি ব্যাখ্যাকার বোল্টৎসম্যান নিজেরও পছন্দ হয় নি।

গতি-বিজ্ঞান এনট্রপির পছন্দসই রূপ দিতে ব্যর্থ হলো। এই সময়ে বোল্টৎসম্যান এবং আমেরিকার বিজ্ঞানী গিবস (Gibbs) অণুতত্ত্বের সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করতে উদ্যোগী হলেন।

অণু বা molecule পদার্থবিদ্যার চেনা জিনিস। পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ, যেখানে পদার্থটির রাসায়নিক গুণ অপরিবর্তিত থাকবে, তাই অণু। সাধারণ অবস্থায় অণুরা নিশ্চল নয়, এরা অনবরত ছোটাছুটি করছে। এই অণুর গতি-প্রকৃতি ধরে 1856 সাল থেকে 1860 সালের মধ্যে ক্রয়োনিগ (Kroyonig), ক্লাউসিয়াস, বোল্টৎসম্যান আর মেক্সওয়েল তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের কতগুলো ধর্মের ব্যাখ্যা দেন। এঁদেরই চেষ্টায় গড়ে ওঠে সাংখ্যায়নিক পদার্থবিদ্যা বা Statistical Physics।

এই অণুতত্ত্বের আলোচনার প্রথমদিকে বোল্টৎসম্যান অণুদের আকার, তাদের ক্রিয়া-অণুক্রিয়া ঘাত-প্রতিঘাত ইত্যাদি বিস্তারিত প্রকল্প ধরে নিয়ে গতি-বিজ্ঞানের সাহায্যে সাংখ্যায়নিক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্যাসে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পাওয়া অনেক তথ্য ব্যাখ্যা করেন। গিবস কিন্তু কোনো বিস্তারিত প্রকল্পের কথা ভাবলেন না ; তিনি শুধু অণুরা গতিশীল, এই সিদ্ধান্ত ধরে এনট্রপির ব্যাখ্যা দিলেন।

গিবস দেখলেন, অণুদের আকার এক, ধর্মও এক, কাজেই একটি দলের বা গুচ্ছের অণুদের আলাদা আলাদা করে চেনা যাবে না। শক্তির তারতম্য অনুসারে এই অণুরা বিভিন্ন দলে থাকবে। এই দলগুলিকে চিনলেই জানা বা বোঝা সহজ হবে। গিবস চাইলেন দলগুলিকে জানতে, অথচ সনাতন গতি-বিজ্ঞানের ধারণায় প্রত্যেক অণু একটা নির্দিষ্ট গতিপথে চলবে। এবং বিভিন্ন অণুর গতিপথ আলাদা আলাদা করে চেনা যাবে। কাজেই অণুর দলের আলোচনায় সনাতন গতি-বিজ্ঞানের প্রয়োগে একটা বিরোধিতা থাকছে।

বোল্টৎস্ম্যান আর গিবস এই দুই বিজ্ঞানী এনট্রপির আলোচনায় সনাতন গতি-বিজ্ঞানের পদ্ধতি থেকে কিছুটা সরে এলেন। এই যে ব্যক্তি থেকে সমষ্টির চিন্তা আর সবকটি ধর্মের কথা না ভেবে বিশেষ কটি মূল ধারণা নিয়ে সমগ্র অবস্থার ব্যাখ্যা করা, বিজ্ঞানের ইতিহাসে এটা একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

হাঁড়ির একটি ভাত টিপে চালের অবস্থা বোঝার চেষ্টা রান্নাঘরে স্বাভাবিক। বিজ্ঞানের রসুইঘরে একই প্রণালী ব্যবহার করলেন এই দুই বিজ্ঞানী। এঁদের এই পদ্ধতি বিজ্ঞানীদের আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু এর গুরুত্ব 1924 সালের আগে সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে নি।

পদার্থগুলিকে অণুসমষ্টি ধরে নিয়ে সনাতন গতি-বিজ্ঞানের সাহায্যে সাংখ্যায়নিক

হিসাব আর যুক্তি দিয়ে তাপ-গতিবিজ্ঞান এবং অন্যান্য বিজ্ঞানের শাখাতেও অনেক তথ্যের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া গেল। বোল্টংস্‌ম্যান আর গিবস এই দুই বিজ্ঞানীর অবদানই এখানে বেশী। এই সাংখ্যায়নিক পদ্ধতি কি অন্য কোথাও খাটবে না? কৌতূহলী বিজ্ঞানীরা আলো ইত্যাদির বিকিরণ এবং পদার্থ ও বিকিরণের ঘাত-প্রতিঘাত ইত্যাদি বিষয়ে পাওয়া পরীক্ষিত তথ্যগুলি একই পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ শুরু করলেন।

মেক্সওয়েল বিদ্যুৎ-চুম্বকতরঙ্গ-তত্ত্ব প্রচার করেছেন। এ তত্ত্বের সাহায্যে অনেক তথ্য ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে। কিন্তু বিদ্যুৎ-চুম্বক বিকিরণ কি শুধুই তরঙ্গ? কৃষ্ণ বস্তুর বা black body-র বিকিরণে এই তথ্য খাটল না।

কৃষ্ণ বস্তু মানে কালো রঙের বস্তু। সাধারণত কালো রঙ তাপ শুষে নেয়। এটা সাধারণ সত্য। গ্রীষ্মকালে তাই কালো ছাতার উপরে সাদা আচ্ছাদন, এককালে, আমাদের দেশে, দেবার প্রচলন ছিল। তবে বিকিরণের তাপ গতিবিজ্ঞানের কৃষ্ণ বস্তু বলতে বোঝায় একটা ফাঁপা বস্তু। তাপ শোষণ করার মতো বিদ্যুৎ চুম্বক বিকিরণ সম্পূর্ণ শোষণ করতে এ পারে; তারপর নিজেই বিকিরণ শুরু করে। আর এই বিকিরণ নির্ভর করে বস্তুটি কতটা উত্তপ্ত তার উপর।

ফার্নেসের অভ্যন্তরের কথা যদি আমরা ভাবি তবে এই কৃষ্ণবস্তুর ব্যাপারটা সহজে বুঝতে পারব। ফার্নেসের ভেতর ফাঁকা জায়গাটা বিকিরণে ভরা। আর আছে খুব সামান্য কয়েকটি বস্তুকণা বা অণু যারা এই ভিতরের বিকিরণকে একটা সাম্য অবস্থায় আসতে সাহায্য করবে। এখন এই ফার্নেসের দেয়ালে যদি খুব ছোট একটা ছিদ্র থাকে তবে তার ভেতর দিয়ে সামান্য বিকিরণ বেরিয়ে আসবে। কিন্তু এই বেরিয়ে পড়া বিকিরণ এত সামান্য যে ভেতরের সাম্য অবস্থার কোন উনিশ-বিশ ঘটবে না। সমুদ্র থেকে এক ফোঁটা জল নিলে সমুদ্রের কোনো পরিবর্তন ঘটে না।

এই যে ছিদ্র দিয়ে বিকিরণ বেরিয়ে আসে তাকে বলা হয় কৃষ্ণবস্তু বিকিরণ বা black body radiation আর বস্তুটিকে বলা হয় black body বা কৃষ্ণবস্তু। এই বর্ণালি বিকিরণের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা গেল সনাতন তাপগতি-বিজ্ঞানে-এর ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না।

সবাই জানি একটা তেকোণা কাচের ভিতর দিয়ে সূর্যের সাদা আলো পাঠালে যে আলো সাতটি রঙে ভেঙে যাবে। একে বলা হয় আলোর বর্ণালি। বেগুনী, নীল, আকাশী, নীল, সবুজ, হলুদ, কমলা আর লাল,—এই সাতটি রঙের রামধনুতে সাদা রঙ গড়ে উঠল। বিজ্ঞানীরা বললেন, এই চোখে দেখা রঙিন আলোর রেখার বর্ণালিটি সবটুকু নয়। এর দুদিকে ছড়িয়ে আছে, আরো অনেক রশ্মি। লালের পর আছে অবলাল, তারপর তাপ বিকিরণ, তার পরে বেতার তরঙ্গ। বেগুনীর পর আছে অতিবেগুনী, তারপর রঞ্জন-রশ্মির স্তর। এই সবকটি স্তর অবশ্য তখনও ধরা পড়ে নি। x-ray বা রঞ্জন-রশ্মির আবিষ্কার তো আরও পরে।

দেখতে পাওয়া আলোর রশ্মির বর্ণালি আছে। পরীক্ষা করে দেখা গেল, এর কোনো

অংশ উজ্জ্বল, কোনোটা বা মিটমিটে। বিজ্ঞানীরা বললেন, ঔজ্জ্বল্যের মাপ নির্ভর করবে রশ্মি কতটা শক্তি বহন করছে তার উপর। বুদ্ধিদীপ্ত চোখের মতই বর্ণালির দীপ্তি-শক্তি নির্ভর অর্থাৎ শক্তির বণ্টনের প্রশ্নটাই বর্ণালির দীপ্তির ঔজ্জ্বল্যের পরিমাপ। দেখা রশ্মির মতো অদেখা রশ্মিতেও আছে বর্ণালি।

আছে বিকিরণেও। বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া বিকিরণ, তাদের বর্ণালি আলাদা। আদর্শ হিসারে নেওয়া হলো কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণকে। কারণ সে তো সব বিকিরণই গ্রহণ করে নেয় ; কোনো কিছু ফেলে দেয় না। ক্লাসে সে ছেলেই তো আদর্শ যে মাস্টারের সব কিছু বক্তব্যই গ্রহণ করতে পারে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণের বর্ণালির শক্তি বণ্টনের সূত্র আর তার ব্যাখ্যা দেবার একটা চেষ্টা চলেছিল। কিন্তু কোনো চেষ্টাতেই সম্পূর্ণ বর্ণালির শক্তি বণ্টনের কোনো সূত্র পাওয়া যায় নি। বর্ণালির একদিকে রেলে-জিন্‌সের (Rayleigh-Jeans) সূত্র দিয়ে কিছু অংশের আর অন্যদিকে ভীনের (Wein) সূত্র দিয়ে কিছুটা অংশের শক্তি বণ্টনের ধারণা করা যায়। কিন্তু সমস্ত বর্ণালির শক্তি বণ্টনের সঠিক সূত্র কোনো ভাবেই পাওয়া যায় নি। জিন্‌স্‌ দেখালেন যে, সনাতন বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে সাংখ্যায়নিক যুক্তি দিয়ে বর্ণালির শক্তি বণ্টনের সমস্যার ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না।

এ সমস্যা সনাতন বিজ্ঞানের চেনা-জানা নিয়মের বাইরে।

গোধূলির কাল

বিজ্ঞানীরা নতুন বাধার মুখোমুখি হলেন। সনাতন বিজ্ঞান প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছে না। পৃথিবীর দৃশ্যমান বস্তু, বড়জোর সৌরজগৎ, সনাতন নিয়ম মানছে। দূরের তারায়, নীহারিকায়, মহাবিশ্বে খাটছে না সনাতন নিয়ম। নিয়ম দিয়ে বাঁধা যাচ্ছে না বিকিরণের বর্ণালির সব অংশটিকে। বোঝা যাচ্ছে, নতুন পদার্থ যা কেথড-রে-তে পাওয়া গেল। গতির সঙ্গে বস্তুর সঙ্কোচন ফিটজ্‌জিরাল্ডীর ব্যাখ্যায় আভাস পাওয়া গেল। কিন্তু তবু রইল সুসঙ্গতির অভাব। তবে কি সনাতন গতি-বিজ্ঞান অপূর্ণ?

জানার দুয়ারটুকু পার হয়ে অজানার পথে পা বাড়াতে তখনো কিছুটা সংশয় ছিল। জানা রাস্তার সিধে পথটা অনেক দূর যাবার পর দেখা গেল শেষ হয়ে গেছে। এবার তৈরি করতে হবে নতুন পথ; ঘাট-আঘাটার মধ্য দিয়ে বন-উপবন ভেঙে। এই সংশয় শুধু ক্ষণিকের। পথ ভাঙতে দেরী হয়নি, পথ গড়তেও না।

নাটকের প্রস্তাবনা শেষ হলো। কোরাস তাদের বক্তব্য বলে চলে গেলেন। যবনিকা কম্পমান, এবার নতুন অঙ্ক শুরু হচ্ছে; কুশীলবেরাও প্রায় নতুন, বিষয়বস্তুও আধুনিক। দর্শকরা আগ্রহে প্রতীক্ষায় চঞ্চল।

এল 1896 সাল।

প্রদীপ জ্বালানোর পালা

১. শঙ্খধ্বনি

1895 সালের শেষ ভাগের কথা। য়ুরৎসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকটর এবং সেখানকার Physical Institute বা পদার্থবিজ্ঞান মন্দিরের ডিরেকটর ভিলহেল্‌ম্‌ কনরাড রণ্টগেন (Wilhelm Conrad Rontgen) কেথড রশ্মি নিয়ে কাজ করছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখলেন, কেথড টিউব থেকে দূরে একটি প্রতিপ্রভ (fluorescent) ধাতু মাখানো কার্ডবোর্ড টিউবটি চালু থাকার কালে বিচ্ছুরিত হয়ে উঠল। টমসনও এ ব্যাপার আগে লক্ষ্য করেছিলেন, তবে এ বিষয়ে তিনি মাথা ঘামান নি। রণ্টগেন ছাড়বার পাত্র নন। ব্যাপারটা নিয়ে পরীক্ষায় তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কেথড-রে সরে থাকল ; অজানা রশ্মি তখন তার ধ্যান-জ্ঞান।

রশ্মিটি কী করে হলো, কীভাবে এর উৎপত্তি—তিনি বারকরলেন। দেখলেন রশ্মিটির পথ সরলরৈখিক, কতকগুলো ধাতু সহজে ভেদ করে যেতে পারে, আবার কতগুলো এর বাধা। ফটোগ্রাফির প্লেটে ছবি ওঠাবে এ রশ্মি। বছরটির শেষ দুমাস নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মেতে রইলেন রণ্টগেন। অবশেষে 1896 সালের পয়লা জানুয়ারি একটা দশ পাতার পুস্তিকা ছাপিয়ে বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানী-মহলে তাঁর আবিষ্কারের কথা জানালেন, সঙ্গে এই অজানা রশ্মি বা এক্স-রের সাহায্যে তাঁর তোলা কিছু ছবি।

এক্স-রে আবিষ্কার বিজ্ঞান-জগতে আলোড়ন তুলল ; কিন্তু তার চেয়েও কোলাহল উঠল চিকিৎসক মহলে। মানুষের শরীরের ভেতরের ফটো তাহলে তোলা যেতে পারে।

আবিষ্কারের পর তার প্রয়োগ সঙ্গে সঙ্গে হয় না। 1860 সালে মেক্সওয়েল তড়িৎ-চুম্বক তত্ত্ব প্রচার করলেন। 1880 সালে তত্ত্বের প্রয়োগে হার্টৎস্‌ বেতার-তরঙ্গ পেলেন। আর 1896 সালে মার্কনি বেতারযন্ত্র আবিষ্কার করলেন ; তত্ত্ব থেকে প্রয়োগের কালের তফাত 36 বছর। এক্স-রের প্রয়োগ প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। 1895 সালের ডিসেম্বরে পরীক্ষা শেষ। 1896 সালের পয়লা জানুয়ারি আবিষ্কারের ঘোষণা। আর এর ঠিক উনিশ দিন পরে 20শে জানুয়ারি 1896 সালে ডার্টমাউথের এডি মেকার্থির ভাঙা হাত এক্স-রের সাহায্যে ঠিক করা হলো। বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা জগতে এডি তার ভাঙা হাতের জন্য বিখ্যাত হয়ে রইলেন।



মাদাম কুরি



রণ্টগেন্



আইনস্টাইন



আর্নেস্ট, রাদারফোর্ড



ম্যাক্সপ্ল্যাঙ্ক

শুধু হাত ভাঙা নয় ; সে যুগে এই হাড়ের ফটো তোলানোটা কেউ বিশেষ পছন্দ করে নি। ব্রিটিশ পত্রিকা পাঞ্চ (Punch) তো সরাসরি রণ্টগেনের এই জ্যান্ত মানুষের কঙ্কাল দেখানোটা অপছন্দ করল। পাঞ্চ লিখল—

O, Rontgen, then the news is true
And not a trick of idle rumour
That bids us each beware of you
And of your grim and graveyard humour. etc

একথা তাহলে সত্য, রঞ্জন সাব
নয় তবে এ অলস গুজব রটনা
তোমারে রাখিব দূরে এই মোর বাসনা
ব্যঙ্গে তব দুঃসহ শ্মশানের ছাপ। ইত্যাদি···

একজন হিসেবি প্রেমিক তার প্রেমিকার উদ্দেশ্যে লিখলেন—

যতো বলো তবু নাহি মানি, সুন্দরী,
আর নাহি আমি কভু তব গুণ ধরি ;
রঞ্জন রশ্মি প্রেম দিল ভস্মি'
নিটোল ঐ তনুর হাড়ে ঘুণ ধরি।

সত্যি, প্রেমিকার হাড়ে ঘুণ আছে জানলে প্রেম করা কি যায় !

জন্ম সূত্রে এক্স-রের ঘরোয়ানা খানদানি। 1896 সালেই রণ্টগেন দেখিয়েছেন এক্স-রে, কেথড-রে নয়, অতিবেগুনী রশ্মিও নয়। রণ্টগেন এক্স-রের প্রতিফলন, প্রতিসরণ বা সমবর্তন পান নি, তাই ভেবেছিলেন এ সব গুণ এক্স-রের নেই। রণ্টগেন যেখানে থামলেন, অন্য বিজ্ঞানীরা সেখান থেকে কাজ শুরু করলেন। আবিষ্কারের কয়েক মাসের মধ্যেই টমসন আর তার ছাত্র আর্নেস্ট রাদারফোর্ড (Ernest Ratherford) এক্স-রের আয়নয়িত করার ক্ষমতা হিসাব করলেন। বেকরেল (Becqurel) প্রতিপ্রভ পদার্থ আর এক্স-রের তুলনামূলক পরীক্ষা করলেন। জানা গেল, প্রতিফলন, প্রতিসরণ বা সমবর্তন এক্স-রের আছে। সুতরাং এও তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গ। জানা গেল এর গতি আলোর গতির সমান এবং তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অতি ছোট, মাত্র $0{\cdot}5\times10^{-8}$ সেণ্টিমিটার বা 0·5 আঙস্টর্ম (Angstorm) 1 আঙস্টর্ম $=10^{-8}$ (সেণ্টিমিটার)। দৃশ্যমান আলোক তরঙ্গের দৈর্ঘ্য বেশ কয়েক হাজার আঙস্টর্ম। সব ঘটনাই ঘটে গেল 1908 সালের মধ্যে —মাত্র বারো বছর ব্যবধানে।

এক্স-রের আবিষ্কার আরেকটা কারণের জন্য বিখ্যাত। এর আবিষ্কারই এটমের মডেল তৈরি করতে সাহায্য করল। সে গল্প এবার শুরু হোক।

যে কোনো ঘটনা একেক জনের কাছে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ধরা দেয়। কালবৈশাখী উঠলে জেলেরা চাইবে নৌকো নিয়ে ঘরে আসতে, ছেলেরা ছুটবে আম কুড়োতে, কবি লিখবেন বর্ষশেষ কবিতা, আবহাওয়াবিদ্ মাপবেন কোথায় কতদূরে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে, কতটা হবে ঝড়ের বেগ। এক্স-রেও বিজ্ঞান জগতে নানা চিন্তার আলোড়ন তুলেছিল। সবাই যখন এক্স-রে কী, কী তার ধর্ম বা কী হবে তার প্রয়োগ ভাবতে ব্যস্ত, ফ্রান্সের বিজ্ঞানী আঁরি বেকরেল-এর (Henri Becquerel) ভাবনাটা ভিন্ন। তিনি ভাবলেন, এক্স-রের আছে প্রতিপ্রভ করার ক্ষমতা। উল্টোদিক দিয়ে ভাবলে, যে পদার্থের বা ধাতুর প্রতিপ্রভ হবার ক্ষমতা আছে, অতিবেগুনী আলোর আঘাতে কি তারা এক্স-রে সৃষ্টি করতে পারবে ? বেকরেল তার লেবরেটরিতে কাজ শুরু করলেন। একমাস কোনো ফল পাওয়া গেল না, তারপর এল অবাক হবার পালা।

বেকরেল কাজ করছিলেন, ইউরেনিয়াম-পটাশিয়াম-সালফেটের কেলাস নিয়ে। এই পদার্থটির প্রতিপ্রভ হবার ক্ষমতা আছে। অতিবেগুনি-রশ্মি প্রতিপ্রভ বস্তুগুলিকে উজ্জ্বল করে তোলে। সূর্যের আলোয় আছে অতিবেগুনি রশ্মি, সুতরাং একটা ফটোপ্লেট কালো কাপড়ে ঢেকে তার উপরে তিনি রাখলেন সালফেটের কেলাসগুলি। সূর্যের আলো তিনি ফেললেন কেলাসের উপর। কয়েক ঘণ্টার পর ফটোর প্লেটটি ডেভলাপ করা হলো ; সালফেটের কেলাসের ফটো পর্দাঢাকা প্লেটে ধরা পড়েছে। অতএব আছে এক অজানা রশ্মি।

খুশ মেজাজে বেকরেল তার তথ্য জানালেন ফ্রান্সের বিজ্ঞানীমহলে। সপ্তাহও কাটল না, একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। সে বছর ফেব্রুয়ারি মাসের ছাব্বিশ-সাতাশ তারিখে পারি (Paris) শহর মেঘে ঢাকা, সূর্যের মুখ দেখা যায় না। কাজেই বেকরেলের পরীক্ষা বন্ধ, সূর্য না হলে অতিবেগুনি আলো পাওয়া যাবে কি করে ? অতএব কাগজে ঢাকা ফটো প্লেট ড্রয়ারে রেখে তার উপর কেলাসগুলিকে বসিয়ে তিনি ড্রয়ার বন্ধ করে রাখলেন। আঠাশ তারিখেও সূর্যের দেখা নেই ; পয়লা মার্চ, কেন না জানি, বেকরেল ফটো প্লেটটি ড্রয়ার থেকে বের করে ডেভলাপ করলেন। অবাক কাণ্ড ? কেলাসের ছবি স্পষ্ট প্লেটে ধরা পড়েছে। এই ছবি আগের চেয়েও অনেক স্পষ্ট, অনেক পরিষ্কার। অতএব, অতিবেগুনী রশ্মি ছাড়াও ঐ কেলাসের অজানা রশ্মি বিকিরণ করার ক্ষমতা আছে।

বেকলের চমকালেন, কিন্তু থামলেন না। আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তিনি বুঝলেন এই অজানা রশ্মি বিকিরণের ক্ষমতা ইউরেনিয়ামের সব যৌগ পদার্থেরই আছে। এই রশ্মির বিকিরণও একটানা এবং ইউরেনিয়ামই রশ্মির উৎস।

ব্রিটেনে কেভেণ্ডিস লেবরেটরিতে তখন জে. জে. টমসন তার কেথড-রে'র কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। 1896 সালে তিনি চার্জ কণার মডেলের কথা ভাবতে শুরু করেছেন ;

কেথড-রে কণার চার্জ মেপেছেন ; মেপেছেন তার গতি ;—চার্জ কণাগুলিতে তিনি পেয়েছেন নেগেটিভ চার্জ। চার্জ ও ভরের হারও তিনি মেপেছেন—এই হার সব সময়েই এক, রশ্মির উৎসের উপর নির্ভর করছে না। টমসন বললেন, এই চার্জ কণা বস্তুর মূল উপাদান, হয় তো বা এটমের মূল উপাদান। এদের নাম দেওয়া হলো ইলেকট্রন।

বেকরেলের ঘোষণার পর এই টমসন আর তার সঙ্গী রাদারফোর্ড বেকরেলের অজানা রশ্মির গ্যাসকে আয়নায়িত করার ক্ষমতা মাপতে শুরু করলেন। রাদারফোর্ড দেখলেন, রশ্মি একটা নয়, দুটো। একটা ভেদ করার ক্ষমতা কম, তার নাম দেওয়া হলো আলফা-রে ; দ্বিতীয়টির ভেদ করার ক্ষমতা অনেক বেশী, এর নাম হলো বিটা-রে। চার বছর পর 1900 সালে তৃতীয় আরও একটি রশ্মি পাওয়া গেল ; ভিলার্ড (P. Villard)-এর আবিষ্কর্তা। আলফা-বিটার সঙ্গে নাম মিলিয়ে এই রশ্মির নাম দেওয়া হলো গামা-রে।

বেকরেলও চুপ করে ছিলেন না। ইউরেনিয়ামের যৌগ পদার্থগুলির প্রত্যেকটিরই এই রশ্মি বিকিরণ করার ক্ষমতা আছে দেখা যাচ্ছে। কাজেই মূল ধাতু ইউরেনিয়ামের এই ক্ষমতা আছে কিনা দেখা দরকার। খাঁটি ইউরেনিয়ামের পার্থিব অস্তিত্ব নেই। যা পাওয়া যায় তা শুধু যৌগ পদার্থ। যা হোক, এই সময়ে আঁরি মোআসাঁ (Henri Moissan) খাঁটি ইউরেনিয়াম তৈরি করার চেষ্টায় ছিলেন। বেকরেল দুটো মাস অপেক্ষা করলেন ; মে মাসে মোটামুটি চলনসই ইউরেনিয়াম পাওয়া গেল—বেকরেল তার পরীক্ষা শুরু করলেন। খাঁটি ধাতুতে বিকিরণ অনেক বেশী পাওয়া গেল। অবাক বেকরেল এই গুণটির নাম দিলেন তেজ বিকিরণ-ক্রিয়া বা radiation active। নামটা পালটালেন মাদাম কুরি ;—নাম দিলেন তেজস্ক্রিয় (radioactive)। এই নামটাই চালু হলো।

মাদাম কুরির কুমারী নাম মারিয়া স্ক্লোডাউস্কা (Marya Sklodowska)। রাশিয়া শাসিত পোলাণ্ডের ওয়ারশ সহরে জন্ম। ফ্রান্সের পারি শহরের সোর্বণ বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে ডিগ্রি নিয়ে যখন পি. এইচ. ডি-র জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন সেই সময়ে বেকরেলের আবিস্কারের খবর পাওয়া গেল। ইতিমধ্যে মারিয়া বিয়ে করেছেন পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পিয়ের কুরীকে (Pierre Curie)। একটা ফুটফুটে ছোট মেয়েও হয়েছে তাঁদের। পিয়ের আর তাঁর ভাই জাক (Jacques Curie) দুজনে ইলেকট্রিক চার্জ মাপার একটা যন্ত্রও তৈরি করেছেন। সব ঠিকঠাক চলছিল। শুধু মাদাম কুরি তার থিসিসটা শেষ করে চাইছিলেন ডক্টরেট পেতে।

বেকরেল তার কাজ প্রকাশ করেছেন ; কিন্তু তার রশ্মিতে হাড়ের ফোটো এক্স-রের মতো তোলা গেল না। সুতরাং এইসব ইউরেনিয়ামের তেজ বিকিরণ নিয়ে বিজ্ঞানীরা ব্যস্ত হলেন না। ব্রিটেনে তখন টমসন্ কেথড-রের কাজের শেষ সময়-সীমায় এসেছেন। জানা গেছে কেথড-রে অতিক্ষুদ্র নেগেটিভ চার্জবাহী কণা। টমসন এদের বলেছেন, ইলেকট্রন। জানিয়েছেন, এরা আকারে এটমেরও ছোট, হয়তো এটমের উপাদান। টমসন্ আরও বললেন, এই ইলেকট্রন বেরিয়ে গেলে উৎস পদার্থের পজিটিভ চার্জ বাড়ে।

এককথায় টমসন্ পদার্থবিদ্যার জগতে এটম-কে এনে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে আছে

এক্স-রে—তাকে নিয়ে বিজ্ঞান জগৎ ব্যস্ত। বেকরেল রশ্মি তখন অবহেলিত। মাদাম কুরি দেখলেন বেকরেলের রশ্মি নিয়ে কেউ কাজ করছে না—এই শাখায় প্রতিযোগিতা কম। অতএব পি-এইচ. ডি. পাবার সুযোগ এই রশ্মি নিয়েই বেশী হবে।

1897 সালের শেষ ভাগ ; মাদাম কুরি কাজ শুরু করলেন। পিয়ের আর জাক-এর তৈরি চার্জ মাপা যন্ত্র নিয়ে মাপতে শুরু করলেন ইউরেনিয়ামের বিভিন্ন যৌগ বা ধাতুর চার্জ। এই পরীক্ষায় ধরা পড়ল যে থোরিয়ামও ইউরেনিয়ামের মত তেজস্ক্রিয়। মাদাম কুরির দুর্ভাগ্য কয়েক সপ্তাহ আগে বিজ্ঞানী স্মিদ (Schimidt) থোরিয়ামের এই গুণের কথা প্রকাশ করেছেন। যা হোক, মাদাম কুরি দেখলেন তেজস্ক্রিয়তা থোরিয়াম আর ইউরেনিয়ামের মিশেলের হারের উপর নির্ভর করেছে ; অর্থাৎ থোরিয়াম বা ইউরেনিয়ামের বিকিরণ মাত্রা স্থির। রাসায়নিক বিশ্লেষণে বা কোন অবস্থাতেই এই বিকিরণে পরিবর্তন হচ্ছে না। অতএব তেজস্ক্রিয়তা পরমাণু সংক্রান্ত ব্যাপার।

এই পর্যন্ত বেশ চলছিল, গোলমাল বাধল কয়েকটা আকর নিয়ে—যেমন, পিচব্লেণ্ড (pitchblende), চ্যালকোলাইট (chalcolite) কারনোটাইট (carnotite) বা অটুনাইট (autunite)। দেখা গেল এদের তেজস্ক্রিয়তা ইউরেনিয়ামের চেয়ে, এমন কি খাঁটি ইউরেনিয়ামের চেয়েও ঢের বেশী।

মাদার কুরি লেবরেটরিতে কৃত্রিম চ্যালকোলাইট তৈরি করলেন। দেখলেন, আকরিক চ্যালকোলাইটের তেজস্ক্রিয়তা লেবরেটরিতে তৈরি করা যৌগের চেয়ে অনেক বেশী। তবে কি আকরে এমন কোনো পদার্থ আছে, যার তেজস্ক্রিয়তা ইউরেনিয়ামের চেয়ে বেশী ? পর্যায় চক্র (periodic table) ঘেঁটে থোরিয়াম আর ইউরেনিয়ামের ছাড়া আর কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থ পাওয়া গেল না। অথচ আকরে থোরিয়াম নেই। তবে অনাবিষ্কৃত কোনো ধাতুর খোঁজ পাওয়া গেল কি ?

মাদার কুরি ধরতে এসেছিলেন পুঁটিমাছ, অথচ বঁড়শিতে ধরা পড়ার সম্ভাবনা হলো বড় রুই-কাতলার। ঘাই সামলাতে আরো সাহায্য দরকার ; পিয়ের কুরি এগিয়ে এলেন, সঙ্গে রসায়নবিদ গুস্তাভ বেমোঁ (Gustave Bemont)। মাদাম আর পিয়ের দুজনেই পদার্থবিদ্‌ ; কাজেই রসায়নবিদের সাহায্য চাই বই কি !

রসায়নের বিশ্লেষণ শুরু হলো, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি ভাগের প্রতিটি ধাপের চার্জ মাপা, রাসায়নিক গুণ পরীক্ষা ইত্যাদি। অতন্দ্র প্রহরের প্রতীক্ষার অবসান একদিন ঘটল। একটা নয়, দুটো নতুন মূল পদার্থের খোঁজ পাওয়া গেল, দুইটিই তেজস্ক্রিয়। একটির নাম দেওয়া হলো মাদাম কুরির জন্মভূমি পোলাণ্ডের নাম অনুসারে পোলোনিয়াম (polonium), আর দ্বিতীয়টি রেডিয়াম (radium)। পর্যায় চক্রে পোলোনিয়ামের জায়গা হোল বিস-মাথের ঘরে। আর রেডিয়াম বেরিয়ামের সঙ্গে। আরো সাহায্য এলো ; ইউজিন দেমার্কে (Eugene Demarcay) রেডিয়ামের বর্ণালী বিশ্লেষণ করলেন, মাদাম কুরি এর এটমের ওজন বার করলেন 225 (বর্তমানে এর ওজন অবশ্য ধরা হয় 226·06)। 1898 সালে কুরি দম্পতি তাঁদের আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করলেন—নতুন তেজস্ক্রিয় পদর্থের

উদয় হলো।

উনিশ শতকের শেষভাগে বিজ্ঞান জগতে যেন ভৌগোলিক ব্যবধান আর থাকছে না। জার্মানিতে রণ্টগেন, ফ্রান্সে বেকরেল আর কুরি দম্পতি, ব্রিটেনে টমসন্, রেমজে আর আমেরিকায় রাদারফোর্ড—এঁরা যেন একই সঙ্গে কাজ করছেন। একজন খেলোয়াড় যেমন বল নিয়ে ড্রিব্‌ল করতে করতে এগিয়ে গিয়ে বল ঠেলে দেয়, আর কজন তাকে খেলতে খেলতে এগিয়ে গিয়ে হয়তো প্রথম খেলোয়াড়কে আবার পাশ দেয়, বিজ্ঞান জগতে সেই রকম যেন জানা-বোঝার খেলা চলছিল। কুরিদের হাত থেকে খেলাটা এবার এল রাদার-ফোর্ডের কাছে।

রাদারফোর্ড, আর্নেস্ট রাদারফোর্ড, আমাদের অপরিচিত নন; টমসনের ছাত্র আর সহযোগী হিসাবে তাকে এক্স-রে আর বেকরেলের অজানা রশ্মি নিয়ে কাজ করতে দেখেছি। রঙ্গমঞ্চে প্রথম অঙ্কে তার প্রবেশ থাকলেও ভূমিকাটির গুরুত্ব যেন তখন ছিল না। দ্বিতীয় অঙ্কে তার পুনঃপ্রবেশ। এবার তার ভূমিকা মূল গায়েনের। তিনি নিজে অভিনয় করছেন চমৎকার; আবার সহযোগীদের নিয়ে চমৎকার কাজ করলেন; এক কথায় টিমওয়ার্ক অপূর্ব—দর্শকেরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে রইল।

টমসনের সঙ্গে কাজের সময় তিনি ইউরেনিয়ামের তেজস্ক্রিয় বিকিরণ থেকে দুটি রে বা রশ্মি পেয়েছিলেন, এরা আল্ফা আর বিটা-রে। আবার এক্স-রে আর ইউরেনিয়ামের অন্যান্য রশ্মির মধ্যে একটা মিল পেয়েছিলেন; অনেক গরমিলের মধ্যে শুধু একটি বিশেষ মিল—এই দুই রশ্মির সৃষ্ট আয়নগুলো মূলত এক।

1898 সাল। তখনো কুরি দম্পতি তাদের নবাবিষ্কৃত পোলোনিয়াম নিয়ে ব্যস্ত। রাদারফোর্ড সেই সময় ইংলণ্ড ছেড়ে কানাডার মনট্রিলে ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটিতে কাজ নিয়ে রওনা দিলেন। পৌঁছুতেই যা দেরী; স্থিতু হয়ে বসেই তেজস্ক্রিয় থোরিয়াম নিয়ে কাজ শুরু করে দিলেন।

ত্রিভুজের খেলা শুরু হলো। বেকরেল তার ইউরেনিয়াম নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। কুরি দম্পতির আছে রেডিয়াম। এবার রাদারফোর্ড বেছে নিলেন থোরিয়াম।

মনট্রিলে রাদারফোর্ডের প্রথম সহযোগী একজন ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার। নাম ওয়েন্স (R. B. Owens)। টমসনের পদ্ধতি ধরে রাদারফোর্ড তাকে তেজস্ক্রিয়তার চার্জ মাপার কাজে লাগালেন। ওয়েন্স-এর কাজ বেশ চলছিল, তবু হঠাৎ দেখা গেল যন্ত্রের মধ্যে কোনো রকমে যদি বাতাস বয়ে যায়, তবে চার্জের ঘাটতি ঘটে, বুঝি বাতাস কিছু চার্জকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বায়ুরুদ্ধ বাক্সে ওয়েন্স তার পরীক্ষা চালালেন। স্থির বাতাসে মাপটা সহজ হলো। কিন্তু যখনই বাতাসে বেগ থাকে—আয়নের শক্তি কমে, মিনিট পনের পর আবার শক্তি ফিরে পায়। যাহোক, ওয়েন্স তার পরীক্ষার পর একটা জিনিস দেখলেন—এক্স-রে বা রেডিয়াম ইউরেনিয়াম যে ধরনের আয়ন সৃষ্টি করে, থোরিয়াম সেই একই ধরনের আয়ন সৃষ্টি করছে—আয়নদের ধরন-ধারণ এক।

এরপর টমসনের সঙ্গে কাজ করবেন বলে ওয়েন্স ইংলণ্ডে চলে যান, আর রাদারফোর্ড

ভাবতে বসেন। এক দমকা হাওয়া যে এই থোরিয়ামের আয়নায়িত করার শক্তি ভাসিয়ে নিয়ে গেল সেই শক্তি কোথায় যায়? প্রশ্নের উত্তর পরীক্ষায়-নিরীক্ষায় রাদারফোর্ড যা পেলেন তা আরও আশ্চর্যের। দুটো কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থের ধারণা তিনি পাচ্ছেন অথচ তাদের না যায় দেখা, না পাওয়া যায় তাদের স্বাদ বা গন্ধ, না মাপা যায় ওজন! তারা আছে জানা যায়, বোঝা যায়। হয়তো তাদের একটা গ্যাস, অন্যটি কঠিন পদার্থ।

রাদারফোর্ড তাদের দেখেন নি, অথচ তাদের বোঝার জন্য প্রাণ-মন দিয়ে বসলেন। মূল থোরিয়াম থেকে বেরিয়ে আসছে নতুন একটা তেজস্ক্রিয় পদার্থ, তারও আয়নায়িত করার ক্ষমতা আছে। পদার্থটা কী হতে পারে? রাদারফোর্ড দেখলেন তুলোর ভেতর দিয়ে, বাতাসের মধ্য দিয়ে, জল বা এসিডের বাধা কাটিয়ে এই পদার্থ যাচ্ছে—একি কণা অথবা একি গ্যাস? বোঝা গেল না। রাদারফোর্ড এর নাম দিলেন নির্গলন (emana-tion)। সহজে বোঝা গেল না, অতএব তাকে বোঝার জন্য যত সময় লাগে দিতে হবে —রাদারফোর্ড সোজাসুজি এটা জানেন। অতএব আরো পরীক্ষায় লেগে পড়। এবার দেখলেন, নির্গলন তেজস্ক্রিয়. আবার কিছু সময় পর এই তেজস্ক্রিয়তা ক্ষয় হয়। ক্ষয় না হয় হলো—তবে শক্তি যায় কোথায়? সুতরাং আবার কাজে লাগো।

এবার দেখলেন, ক্ষয়ের হার প্রথমে বেশী, পরে ধীরে ধীরে কমে এবং এরও একটা মাপ পাওয়া গেল। প্রথম মিনিটে ক্ষয়ের হার অর্ধেক, দ্বিতীয় মিনিটে বাকির অর্ধেক, তৃতীয় মিনিটে যা আছে তার অর্ধেক, একই ভাবেই। অর্থাৎ, অঙ্কের ভাষায় যাকে বলা হয় গুণোত্তর প্রগতি (geometrical progression)—ক্ষয়ের সময়ের হিসাব সেই ছকেই পাওয়া গেল।

যেন প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের হার; বেশী উপার্জন হলে বেশী দিতে হবে, কম রোজগারে হার এক থাকলেও প্রাপ্তি হবে কম। রাদারফোর্ড দেখলেন, নির্গলনের তেজস্ক্রিয় শক্তি একই পদ্ধতিতে বাড়ে। যে শক্তি বের হয়ে আসবে তার খানিকটা ক্ষয় হবে; যা ক্ষয় হবে দ্বিতীয় মিনিটে হিসেব নিকেশের পর তার অর্ধেক জমার খাতায় পাওয়া যাবে. তৃতীয় মিনিটে তার অর্ধেক। অর্থাৎ ছকে আঁকলে আগের ছবির উল্টোটা দেখা যাবে। এদিকের স্টপার জোরে যে ভাবে বলটা কিক করল সেই ভাবেই রিটার্ন কিক করে বলটা ফেরত পাঠাল ওদিকের ফুল ব্যাক—কিক ভাল, তবে একটু কমজোরী।

বেশ চলছিল পরীক্ষা হঠাৎ রাদারফোর্ড দেখলেন তার সব যন্ত্রপাতি তেজস্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। উৎসটা নিশ্চয় ঐ থোরিয়াম। ওরই তো আছে কাছাকাছি বস্তুকে তেজস্ক্রিয় করার ক্ষমতা। নির্গলনের উৎসও তো সে। অথচ থোরিয়াম-কে যদি বেশ উত্তপ্ত করা যায় তখন এই নির্গলনের প্রবাহ থাকে না, এবং তেজস্ক্রিয় করার ক্ষমতাও কমে যায়। সুতরাং নির্গলন প্রবাহেই লুকিয়ে আছে তেজস্ক্রিয় করার ক্ষমতা।

রাদারফোর্ড আবার দেখলেন, এই কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি নেগেটিভ চার্জ আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণের হিসাব কষে রাদারফোর্ড ক্ষয়-ক্ষতির হিসেবটা পেলেন। দেখলেন নির্গলন প্রবাহে যে তেজস্ক্রিয়তা পড়ে থাকছে তারই হারে পাওয়া যাচ্ছে ঐ কৃত্রিম

তেজস্ক্রিয় পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা। এই নির্গলন প্রবাহ হয়তো-বা অন্য পদার্থগুলিকে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তায় উত্তেজিত করেছে। রাদারফোর্ড বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে এই উত্তেজনার ক্রিয়াটা লক্ষ্য করলেন।

পরমহংসদেব বলতেন, মলয় বাতাস বইলে সব গাছই চন্দন হয়ে ওঠে, কেউ কম, কেউ-বা বেশী—শুধু কলাগাছ হয় না। অর্থাৎ গাছের সারবত্তার উপর চন্দন হওয়া নির্ভর করবে। সেই রকম ধরে নেওয়া যাবে পদার্থের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করবে তেজস্ক্রিয় হবার সম্ভাবনা। পরীক্ষায় কিন্তু সব পদার্থের একই দশা দেখা গেল। তারা যে রশ্মি বিকিরণ করল তাদের ভেদ করার ক্ষমতা এক। নির্গলনের প্রেমে সব বস্তুই সমান উত্তেজিত, সর্বত্রই একই উদ্দীপন।

রাদারফোর্ড দেখলেন, এই যে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা এ যেন ভগবদ্‌গীতার আত্মা, একে ভাঙা যায় না, পোড়ান যায় না, ঝেড়ে ফেলে দেওয়া যায় না। নাইট্রিক এসিড বা এল-ক্যালিতে গলানও যায় না। অথচ লঘু সালফিউরিক এসিড বা হাইড্রোক্লোরিক এসিডে এই শক্তি হঠাৎ অদৃশ্য হয়—আবার ঐ এসিড উবে গেলে, পাত্রের নীচে একে ধরা যায়। যেন জলে গলা চিনি, জল উবে গেলে পাত্রে আবার চিনিই পড়ে থাকে।

1899 সালে রাদারফোর্ড তার নির্গলন তত্ত্ব আর কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তার তথ্য প্রকাশ করলেন। কুরি দম্পতিও একই কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা দেখলেন ; দেখলেন রেডিয়াম নিয়ে কাজ করতে করতে। এই কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা সময়ের সঙ্গে ধীরে ধীরে তার এই শক্তি হারায়। হয়তো কোথাও একটা এই শক্তির স্থানান্তর ঘটছে। অথচ নির্গলন প্রবাহ তাদের পরীক্ষায় ধরা গেল না।

একটা তফাত পাওয়া গেল। থোরিয়াম—রেডিয়াম দুটো আলাদা-আলাদা মৌলিক পদার্থ বলেই কি এই তফাত ; না কারণটা আলাদা ?

তেজস্ক্রিয় পদার্থ যত সহজ মনে হয়েছিল, তত সহজ ঠেকছে না।

এদিকে তেজস্ক্রিয় পদার্থের আবিষ্কার শুধু রেডিয়াম-পোলোনিয়ামেই থামল না। 1899 সালের মধ্যে অন্তত আরও বিশটা তেজস্ক্রিয় পদার্থ পাওয়া গেল। 1900 সালে স্যার উইলিয়াম ক্রুকস্ (Sir William Crooks) ইউরেনিল নাইট্রেট থেকে একটা নতুন পদার্থ পেলেন, সেটা ইউরেনিয়াম নয়, অথবা রেডিয়াম বা পোলোনিয়ামও নয়। অথচ এরও ফটোপ্লেটে ছবি ওঠানোর ক্ষমতা আছে। এই পদার্থের তিনি নাম দিলেন ইউরেনিয়াম-এক্স।

রাদারফোর্ড এবার রেডিয়াম নিয়ে কাজ শুরু করলেন এবং তিনি রেডিয়াম-এর নির্গলন প্রবাহ পেলেন। আরও দেখা গেল উত্তপ্ত করলে এই প্রবাহ বেড়ে যায়। থোরিয়ামেও একই ব্যাপার ঘটছে, তফাত শুধু প্রবাহের হঠাৎ বৃদ্ধির পর থোরিয়ামে আর কোনো নির্গলন প্রবাহ যাবে না। 1900 সালে রাদারফোর্ড সহযোগী পেলেন রসায়নবিদ সোডিকে (Frederik Soddy)। থোরিয়াম নিয়ে কাজ করার সময় সোডি স্যার ক্রুকসের মতো একটা নতুন তেজস্ক্রিয় পদার্থ পেলেন ; তার নাম দিলেন থোরিয়াম-এক্স—ইউরে-

নিয়াম এক্স-এর সঙ্গে মিলিয়ে রাখা নাম। থোরিয়াম-এক্স-এরও নির্গলন ক্ষমতা আছে।

1901 সাল এল। পদার্থবিদ্যায় প্রথম নোবেল প্রাইজ পেলেন রণ্টগেন সাহেব তাঁর এক্স-রের আবিষ্কারের জন্য। আগের বছর দুটো নতুন পদার্থ পাওয়া গেছে—ক্রুকসের ইউরেনিয়াম-এক্স আর রাদারফোর্ড-সোডির থোরিয়াম-এক্স। এক্স শব্দটা বিজ্ঞানীদের পয়মন্ত মনে হলো। এই থোরিয়াম-এক্স আর ইউরেনিয়াম-এক্স—দুই নিয়ে রাদারফোর্ড-সোডি কাজ শুরু করলেন। প্রথমে নিজেদের পাওরা থোরিয়াম-এক্স। সোডি দেখলেন মূল থোরিয়াম থেকে থোরিয়াম-এক্স পৃথক করলে দেখা যায়, থোরিয়াম-এক্স তেজস্ক্রিয় আর থোরিয়াম অতেজস্ক্রিয়। আবার কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে থোরিয়াম-এক্স তেজস্ক্রিয়তা হারাচ্ছে আর থোরিয়াম তেজস্ক্রিয় হয়ে উঠেছে। মজাটা মন্দ না—যেখানে ছিল, সেখানে থাকছে না আর যেখানে ছিল না, সেখানে আপনা থেকেই গড়ে উঠেছে তেজস্ক্রিয়তা। অথচ দুটো পদার্থের রাসায়নিক গুণ আলাদা, দুটোই মৌলিক পদার্থ এবং মনে হচ্ছে, থোরিয়ামই রূপান্তরিত হচ্ছে থোরিয়াম-এক্স এ।

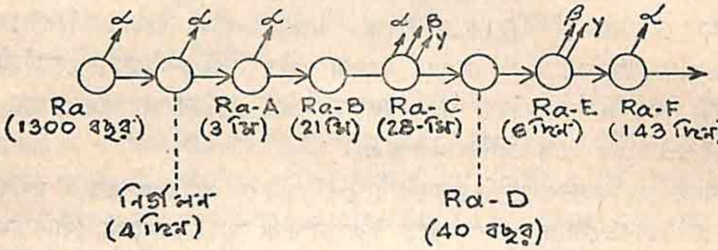
সম্ভাবনাটা পরীক্ষাতেও প্রমাণিত হলো। থোরিয়াম যে থোরিয়াম-এক্স এ রূপান্তরিত হচ্ছে তা রাদারফোর্ড-সোডি প্রমাণ করতে পারলেন এবং আরও দেখলেন, থোরিয়াম-এক্স থেকেই নির্গলন হয়। ইউরেনিয়াম থেকেও সোডি ইউরেনিয়াম-এক্স পেলেন। শুধু দেখা গেল মূল ইউরেনিয়াম থেকে বেরোয় আলফা-রে আর ইউরেনিয়াম-এক্স থেকে বিটা-রে। দুটো পদার্থই মৌলিক, এদের রাসায়নিক গুণও আলাদা অথচ বোধহয় একটা রূপান্তরিত হচ্ছে অন্যটায়। রূপান্তর আবার হয়তো ঐ আলফা-বিটা-রে হারাবার জন্য। শক্তি বেরিয়ে আসে বিকিরণের পথে—যখন এটম রূপান্তরিত হচ্ছে। এই বিকিরণ রূপান্তরের, পরিবর্তনের অঙ্গ।

ভারতের দার্শনিক কণাদ তেজ আর আলো একই মূল পদার্থের রূপান্তর ভাবতেন। রাদারফোর্ড আর সোডি সেই একই কথা বললেন।

রাদারফোর্ড এবার কাজ শুরু করলেন, বিজ্ঞানী বার্নস্‌কে সঙ্গে নিয়ে। বার্নস তাপশক্তি মাপে বিশেষজ্ঞ। দুজনে রেডিয়াম নিয়ে কাজ করছেন—বিষয় তাপের ফলে রেডিয়াম ধাতুর রূপান্তর। একটা আশ্চর্য ব্যাপার তারা দেখলেন—তাপের সঙ্গে সঙ্গে মূল তেজস্ক্রিয় পদার্থটি বিভিন্ন সময় অন্তর-অন্তর আলফা-রে হারিয়ে অন্য পদার্থে রূপান্তরিত হচ্ছে। নতুন পদার্থটি আবার আলফা বা বিটা কণা হারিয়ে পরিবর্তিত হচ্ছে অন্য কোনো তৃতীয় পদার্থে। তৃতীয় আবার হচ্ছে চতুর্থ পদার্থে—চতুর্থ পঞ্চমে। রূপান্তরের পদ্ধতি এক ; শুধু পদার্থের ক্ষয়ের কালটাই আলাদা। এই ক্ষয়ের হার ধরা হলো অর্ধেক তেজের ক্ষয় হতে যে সময়টা লাগে সেই সময়টুকু। বিজ্ঞানে এর নাম দেওয়া হলো half life বা অর্ধজীবন।

নতুন পদার্থগুলো রাদারফোর্ড ইংরেজি বর্ণমালা অনুযায়ী সাজালেন। দেখা গেল রেডিয়াম A আলফা-রে হারিয়ে পরিবর্তিত হচ্ছে রেডিয়াম B-তে। রেডিয়াম B একই আলফা-রে হারিয়ে দাঁড়াচ্ছে রেডিয়াম C-তে। রেডিয়াম C কিন্তু আলফা-বিটা দুটিই

হারাবে এবং পরিবর্তিত হবে রেডিয়াম D-তে। রেডিয়াম D'র জীবন দীর্ঘ, ধীরে ধীরে তা পরিবর্তিত হবে রেডিয়াম E-তে। রেডিয়াম E হারাবে বিটা-রে, পরিশেষে পরিবর্তিত হবে রেডিয়াম F-এ। গোটা ব্যাপারটা যেন একটা বিলম্বিত খেয়াল। সঙ্গীত তবলিয়ার চাটি গানের তালে তালে নির্দিষ্ট সময় পর পর পড়বে তবলা বা বাঁয়ার উপর। অনেক অপেক্ষা করার পর পাওয়া যাবে তবলিয়ার একটি সূক্ষ্ম কাজ, একটি লয়কারি, একটি বাজ। সমজদারি সাবাস শোনা যাবে একটি দীর্ঘ হলক তানের পর, যখন সময় স্তব্ধ বলে মনে হবে।



রেডিয়াম (Ra) শৃঙ্খল

রাদারফোর্ড দেখলেন মূল পদার্থ অন্য পদার্থে রূপান্তর হতে পারে। তার এই রূপান্তর তত্ত্ব আরও একটি সমস্যার সমাধান করল। দেখা গেল, নানা তেজস্ক্রিয় পদার্থের মিল পাওয়া যাচ্ছে। রেডিয়াম F আর রেডিও টেলুরিয়াম এবং পলোনিয়াম একই পদার্থ ; মূল রেডিয়ামের এরা রূপান্তর। আর রেডিয়াম F-এর রূপান্তরে পাওয়া যায় সীসা। থোরিয়ামের ক্ষয়েও পাওয়া গেল সীসা। অর্থাৎ সীসা বা lead তেজদীপ্ত ধাতুর শেষ বংশধর। এ যেন বিশ্বকর্মার নাতি ছুঁচো! তেজস্ক্রিয় পদার্থের শেষ কিনা সীসা!

এই রেডিয়ামের রূপান্তর শৃঙ্খল থেকে জানা গেল মূলধাতু নতুন ধাতু তৈরি করতে পারে এবং এতদিনে আবিষ্কৃত বহু নতুন ধাতুই হয়তো বা কোনো মূলধাতুর রূপান্তরী বংশধর হতে পারবে। পলোনিয়াম তার কৌলীন্য হারাল—প্রমাণ হলো রেডিয়াম তার সাতপুরুষ আগে। অর্থাৎ পলোনিয়াম রেডিয়ামের প্র-প্র-প্র-প্র-প্র-নাতি, আর পলোনিয়ামের বংশধর সৃষ্টিছাড়া সীসা।

রেডিয়াম পাওয়া যায় ইউরেনিয়ামের আকরের মধ্যে, এর তেজস্ক্রিয়তা ইউরেনিয়াম থেকে বেশী। রূপান্তরের পরীক্ষায় রাদারফোর্ড দেখেছেন একটি মূল পদার্থ যখন আলফা বা বিটা রশ্মি ত্যাগ করে নতুন পদার্থে রূপান্তরিত হয়, তখন এই নতুন পদার্থটির তেজস্ক্রিয়তা মূল পদার্থটির চেয়ে বেশী হতে পারে। তবে কি রেডিয়াম ইউরেনিয়ামের রূপান্তর?

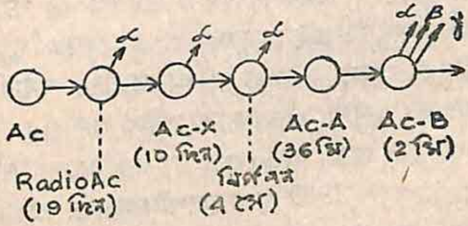
সোডি ইংলণ্ডে স্যার রেমজের লেবরেটরীতে কাজ নিয়ে এসেছেন। রাদারফোর্ড-সোডির জুটি ভাঙা। কিন্তু কাজ তাদের এক। ঘরোয়ানার বদল হয় নি, গায়কী ঐ

তেজস্ক্রিয়তা। সোডি লণ্ডনে বসে ইউরেনিয়াম থেকে রেডিয়াম বের করতে তৎপর হলেন।

এ কাজ অন্যত্রও শুরু হয়েছে। শিকাগোর হার্বার্ট ম্যাককয় (Herbrt McCoy) 1905 সালে দেখলেন যে পীচব্লেণ্ড আকরের তেজস্ক্রিয়তার ভাগ, আকরে কতটা ইউরেনিয়াম আছে তারই হারে হিসেব করা যাবে। রেডিয়াম বা অন্য কোনো তেজস্ক্রিয় ধাতু থাকুক বা না থাকুক, তেজস্ক্রিয়তার হিসেব ইউরেনিয়ামের অস্তিত্বের হারেই পাওয়া যাবে। নিউ হেভেনের বোল্টউড (Boltwood) পরীক্ষায় দেখলেন আকরের মধ্যে ইউরেনিয়াম আর রেডিয়াম একটা নির্দিষ্ট সমানুপাতিক হারেই থাকবে—সে আকর যেখান থেকেই আনা হোক। অথচ থোরিয়াম আর ইউরেনিয়ামের মিশেলের নির্দিষ্ট কোনো মাত্রা নেই। অতএব থোরিয়াম এবং ইউরেনিয়াম দুটি আলাদা ধারা ; রেডিয়াম কিন্তু ইউরেনিয়ামের শাখা হতে পারে।

হতে পারে…হতে পারে…আছে সংশয়…আছে দ্বিধা! সোডি কিন্তু পরীক্ষায় ইউরেনিয়ামের রূপান্তরে রেডিয়াম পাচ্ছেন না। এদিকে পীচব্লেণ্ড আকরে আরও একটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ পাওয়া গিয়েছিল—নাম একটিনিয়াম। বোল্টউড এটি নিয়ে কাজ শুরু করলেন এবং তিনি একটিনিয়ামের রূপান্তরে পেলেন রেডিয়াম।

ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য, অথচ ঘটল। মূল আকরে একটিনিয়াম পাওয়া গিয়েছিল সামান্য. অথচ রেডিয়ামের ভাগ বেশী। এ যেন শূন্য থেকে কিছু তৈরি হওয়া। বিজ্ঞান ম্যাজিকে বিশ্বাস করে না—সৃষ্টির রাজ্যে হাত-সাফাই নেই। অতএব, ভাল করে আরো পরীক্ষা কর। পরীক্ষায় নামলেন অগতির গতি রাদারফোর্ড। তিনি রেডিয়ামের মতো একটিনিয়ামের রূপান্তর শৃঙ্খল তৈরী করলেন।



একটিনিয়াম (Ac) শৃঙ্খল

দেখা গেল একটিনিয়ামের প্রথম রূপান্তরিত পদার্থ রেডিও-একটিনিয়াম রেডিয়াম তৈরি করে। রেডিয়ামের সৃষ্টি আবার এত ধীর হয় যে তার আগেই রেডিও-একটিনিয়াম তার আলফা কণা হারিয়ে একটিনিয়াম-এক্স-এ পরিবর্তিত হচ্ছে।

রেডিয়ামের পিতৃপুরুষের একটা সম্ভাব্য গোত্র প্রবর পাওয়া গেল। যদি ইউরেনিয়াম থেকে রেডিয়াম তৈরি হয় তবে তারও একটা রূপান্তরী অবস্থা পাওয়া যাবে যা এই রেডিও-একটিনিয়ামের মতো হবে—অন্ততঃ রাসায়নিক গুণ একই থাকবে। বাঘের বাচ্চা

যখন বাঘই হবে তখন ইউরেনিয়ামের বংশে খোঁজা যাক সেই বাঘ। বোল্টউড সেই বাঘের দেখা পেলেন 1907 সালে, এটির নাম দেওয়া হলো আইওনিয়াম। 1908 সালে মার্কওয়েল্ড আর কীটম্যান ইউরেনিয়াম থেকে সেই আইওনিয়াম পেলেন, অথচ দেখা গেল, রাসায়নিক গুণে আইওনিয়াম আর থোরিয়াম এক। আবার থোরিয়াম থেকে পাওয়া গেল মেসো-থোরিয়াম—গুণে সে আর রেডিয়াম অভিন্ন। কে যে কোথা থেকে আসছে, কার সঙ্গে যে কার সম্পর্ক, তেজস্ক্রিয় পদার্থের মেলায় ধরা যাচ্ছে না। লতায়-পাতায় একটা সম্পর্ক পাওয়া যাচ্ছে—ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম আর একটিনিয়ামের মধ্যে তিনটেই রেডিয়াম সৃষ্টি করে। ইউরেনিয়াম আবার করে থোরিয়াম বা আইওনিয়াম সৃষ্টি। বিরাট একটা হ-য-ব-র-ল'র মধ্যে পদার্থগুলো এসে পড়েছে—সাজাতে গিয়েও সাজানো গেল না।

থোরিয়াম, রেডিও-থোরিয়াম, আইওনিয়াম আর ইউরেনিয়াম-এক্স মিলছে। মিলছে আবার প্রথম মেসো-থোরিয়াম, থোরিয়াম-এক্স এবং রেডিয়াম। নির্গলন প্রবাহ জানা গেছে নিষ্ক্রিয় গ্যাস। রেডিয়াম থেকে পাওয়া গ্যাসের নাম রেডন ; সে আর থোরিয়াম থেকে পাওয়া গ্যাস থোরোনের গলায়-গলায় মিল।

সাজছে অথচ যেন সাজানো যাচ্ছে না।

সাজানো গেল আরও পরে। ততদিনে জানা গেছে আলফা-বিটা গামা-রে'র পরিচয়। এদের চিনেই চেনা গেল সবকটা তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলোকে। নইলে এত হ্যাপা সামলানো কি সোজা ব্যাপার!

রাদারফোর্ড আগেই দেখেছিলেন আলফা-রে সামান্য বাধা ভেদ করতে পারে না। অথচ বিটারে'র ভেদ করার ক্ষমতা ঢের বেশী—কয়েক মিলিমিটার পুরু অ্যালুমিনিয়ামের পাত বিটা-রে ভেদ করে যাবে। টমসনীয় পদ্ধতি ধরে বিটা-রে পরীক্ষা করা হয়েছে। জানা গেছে, এর আছে নেগেটিভ চার্জ। চুম্বক ক্ষেত্রের ভেতর দিয়ে যাবার সময় এর বিক্ষেপের ধরন কেথড-রে'র মতো। অথচ বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে যে বিটা-রে পাওয়া গেল, তাদের ভর আলাদা, গতি আলাদা শক্তিও আলাদা। শুধু জানা গেল ভর আর গতির মধ্যে একটা মিল আছে, গতি বেশী হলে ভর বাড়ে। গতি কম হলে, ভর কমে। এ সমস্যার সমাধান হলো 1909 সালে আপেক্ষিকতাবাদ প্রয়োগ করে। সে কথায় পরে আসব। সময়ের সঙ্গে প্রমাণ হলো, বিটা-রে কেথড-রে'র মতো ইলেকট্রন কণা ; এদের চার্জ এক।

আলফা-রে-তে পাওয়া গেল পজিটিভ চার্জ। উচ্চ-তড়িৎক্ষেত্রে এদের বিক্ষেপ দেখা গেল, বিক্ষেপ বিটা-রে'র বিক্ষেপে উল্টোদিকে রাদারফোর্ড এদের গতি মাপলেন, মাপলেন ভর, স্থির করলেন চার্জ এবং ভরের আনুপাতিক হার। বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে বেরিয়ে আসা আলফা কণার গতি বা ভরের কোনো পরিবর্তন পাওয়া গেল না, শক্তিরও তারতম্য নেই!

তেজস্ক্রিয় আকরে হিলিয়াম পাওয়া গিয়েছিল। রাদারফোর্ডের ধারণা এই তেজস্ক্রিয়

কণাটি হিলিয়াম সৃষ্টি করছে। সোডিকে তিনি ইংল্যাণ্ডে স্যার রেমজের কাছে পাঠালেন। রেমজে স্বয়ং হিলিয়ামের আবিষ্কর্তা। কাজেই এ বিষয়ে গবেষণা করতে তার চেয়ে ভাল আর কে হবে! 1903 সালে রেমজে আর সোডি রেডিয়ামের ক্ষয়ে হিলিয়ামের সৃষ্টির কথা ঘোষণা করলেন। 1906 সালে রাদারফোর্ড নতুন করে রেডিয়ামের বিভিন্ন রূপান্তরী তেজস্ক্রিয় পদার্থের আলফা কণার গতি আর স্তর মাপলেন—দেখা গেল এরা এক। অটো হান (Otto Hahn)-এর সঙ্গে মাপলেন থোরিয়ামের আলফা কণার ভর আর গতি। একই উত্তর পাওয়া গেল, এরাও এক। আলফা-রে যেখান থেকেই বেরিয়ে আসুক তাদের ভর আর গতি এক। হিসাবে দেখা গেল, আলফা-রে'র চার্জ আর ভরের অনুপাত, হাইড্রোজেনের চার্জ আর ভরের অনুপাতের প্রায় অর্ধেক, অর্থাৎ আলফা কণার চার্জ যদি হাইড্রোজেনের চার্জের সমান হয়, তবে তার ভর হবে হাইড্রোজেনের ভরের দুগুণ বা হাইড্রোজেনের মলিকিউল বা অণুর সমান। অথবা আলফা কণার চার্জ যদি হয় হাইড্রোজেনের চার্জের দুগুণ, তবে তার ভর হবে হিলিয়ামের এটমের সমান।

আলফা কণা কি হিলিয়ামের এটম?

সব কিছু নির্ভর করছে চার্জ আর ভরের সূক্ষ্মতম মাপের উপর। তার জন্য চাই সূক্ষ্ম যন্ত্র। রাদারফোর্ড নতুন সহযোগী পেলেন, নাম গাইগার (H. Giger)—বিখ্যাত গাইগার কাউন্টারের আবিষ্কর্তা তিনি। 1908 সালে রাদারফোর্ড আর গাইগার আলফা কণার নির্গলনের হার মাপলেন এবং মাপলেন তাদের চার্জ। কয়েকটি সিদ্ধান্তের পর গাণিতিক নিয়মে আলফা কণার এটমের ওজন পাওয়া গেল, 3·86। হিলিয়ামের এটমের ওজন 3·96। সুতরাং রাদারফোর্ড এবং গাইগার বললেন, পরীক্ষার স্বাভাবিক ভুল-ত্রুটি বাদ দিয়ে বলা যেতে পারে নেগেটিভ চার্জ হারানো আলফা কণা, হিলিয়াম-এটম ছাড়া আর কিছু নয়।

ভুল-ত্রুটির কথাটা তবু থাকছে; রাদারফোর্ড তাতে সন্তুষ্ট নন। বিখ্যাত ক্রিকেটার রঞ্জি সিংকে ব্যাটিং-এর জন্য যখন সকলে প্রশংসা করছে, তখন রঞ্জি খুঁতখুঁত করে বললেন, বলছ তো ভাল খেলেছি, কিন্তু প্যাডে যে বলের দাগ লেগেছে, দেখ নি? রাদারফোর্ডেরও খুঁতখুঁতুনি যায় না। পরের বছর আবার পরীক্ষা করলেন। এবার সহযোগী রয়েডস্ (T. Royds)। এবারের পরীক্ষার পদ্ধতি আলফা-রে'র বর্ণালি বিশ্লেষণ। বিশ্লেষণে নিশ্চিন্তভাবে প্রমাণ হলো, বর্ণালি হিলিয়ামের। অতএব আলফা কণা হিলিয়াম এটম, তেজস্ক্রিয় আকরে হিলিয়াম পাবার কারণটা নিশ্চিন্তভাবে জানা গেল—সে চার্জ হারানো আলফা কণা।

এখনো একটা অজানা রশ্মি বাকি—গামা-রে। এটির ভেদ করার ক্ষমতা আছে, অথচ চুম্বক বা তড়িৎ ক্ষেত্রে এর বিক্ষেপ করা সম্ভব হয় নি। বেকরেল তাই ভাবলেন, এক্স-রে আর গামা-রে এক। রাদারফোর্ডও একই মত পোষণ করতেন, তবে তা একান্তে; প্রমাণ ছাড়া রাদারফোর্ড কিছুই বিশ্বাস করেন না। এক্স-রে'র diffraction বা ব্যবর্তন ঘটানো হয়েছে 1896 সালে। গামা-রে'র ব্যবর্তন ঘটান যায় নি। 1913 সালে জানা গেল

গামা-রে'র এক্স-রে'র মতো তড়িৎ চুম্বক তরঙ্গ, এর গতি আলোর সমান এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অতি ক্ষুদ্র। দুই জন ব্রাগ (Bragg), বাবা ও ছেলে, গামা-রে'র একটা চলনসই গোছের ব্যবর্তনও পেলেন। রাদারফোর্ড এতদিন যেন ঝিমিয়ে ছিলেন ; আবার তিনি পরীক্ষায় লাগলেন : সহযোগী এনড্রেড (E.N. da C. Andrade)-কে নিয়ে পরীক্ষায় গামা-রে'রর ব্যবর্তন পেলেন। বিভিন্ন রূপান্তরিত তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে বেরিয়ে আসা গামা-রে' তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মাপলেন। মিল পাওয়া গেল। মিল আছে গামা-রে আর এক্স-রে'র মধ্যে। গামা-রে'র তরঙ্গ দৈর্ঘ্য শুধু অনেক কম।

জানা গেছে, আলফা-রে হিলিয়ামের এটম। এই জানাটাই দরকার ছিল। রাদারফোর্ড আর গাইগার এইবার রূপান্তরী পদার্থগুলির একটা মিল খুঁজে পেলেন। একটা আলফা কণা যাওয়া মানে এটমের ওজন প্রায় চার কমে যাওয়া। এই পদ্ধতিতে রূপান্তরী পদার্থ-গুলোকে সাজালে, ইউরেনিয়াম—রেডিয়াম, থোরিয়াম আর একটিনিয়াম এই তিন পদার্থের শৃঙ্খলটা বোঝা যাবে।

একাজে এগিয়ে এলেন সোডি। এবারে তিনি একা—রাদারফোর্ড সঙ্গে নেই।

সোডি কেমিস্ট্রি বা রসায়নবিদ্যা কাজ করতে করতে রপ্ত করেছেন। যা কিছু অবোধ্য তিনি রাদারফোর্ডীয় রীতিতে দুভাবে তার উত্তর খুঁজবেন—চার্জ মেপে বা রসায়নের গুণ মেপে। তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলো তিনি গুণ দিয়ে সাজাবেন ঠিক করলেন।

মেণ্ডালিয়ভের পর্যায় চক্রটা নিয়ে আরেকবার আলোচনা করলেন সোডি। তিনি দেখলেন, প্রথম আর সপ্তম শ্রেণীর পদার্থগুলোর যোজ্যতা বা valency—এক। দ্বিতীয় আর ষষ্ঠ শ্রেণীর যোজ্যতা হলো দুই। অর্থাৎ যোজ্যতার সংখ্যা দুদিক দিয়ে বাড়বে, তারপর চতুর্থ শ্রেণীতে এটি হবে চার। সংখ্যা দিয়ে লিখলে এই যোজ্যতা লেখা হবে—এক, দুই, তিন, চার, তিন, দুই, এক—এইভাবে।

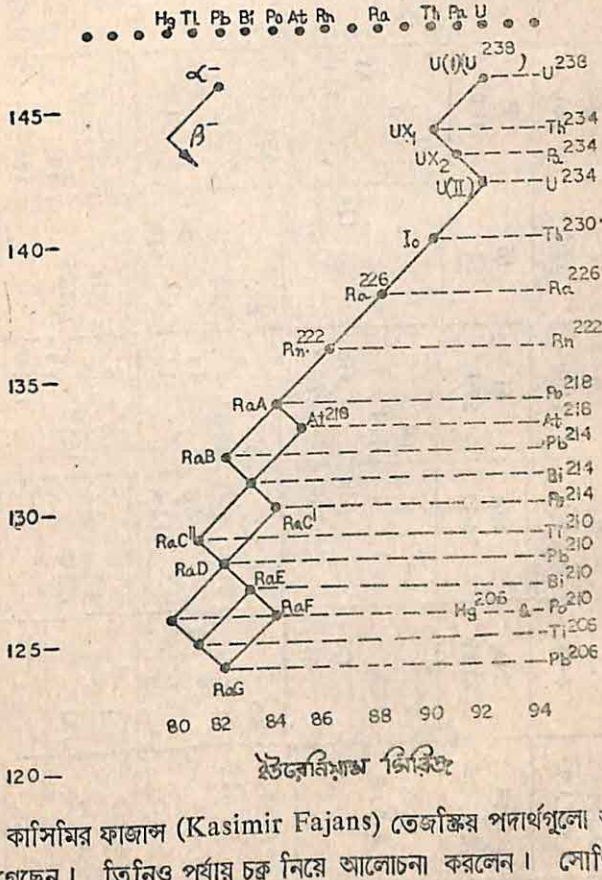
যেন, সুবললাল বসু ;—যেদিক দিয়েই দেখি এক নামই পাচ্ছি, আর অক্ষরে অক্ষরে আছে মিল।

সোডি দেখলেন, তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলির যোজ্যতা আছে। তাদেরও যোজ্যতা হিসাবে সাজানো যাবে। যেমন, রেডিয়াম। মাদাম কুরি এর এটমের ওজন মেপেছেন 226 ; বেরিয়ামের সঙ্গে আছে এর রসায়নগত মিল। কাজেই পর্যায়চক্রে ইউরেনিরাম থোরিয়ামের সঙ্গে একই সারিতে বেরিয়ামের নীচে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এর স্থান। এর যোজ্যতা দুই।

আর, যে যে তেজস্ক্রিয় পদার্থের গুণ রেডিয়ামের মতো তারা রেডিয়ামের সঙ্গে একই কোঠায় থাকবে। নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলির কোনো যোজ্যতা নেই, এরা কারও সঙ্গে মিলবে না ; সুতরাং এদের সাজানো হবে অন্য শ্রেণীতে, সেই শ্রেণীর সংখ্যাটা হলো শূন্য। পলোনিয়ামের যোজ্যতা দুই ; অথচ মার্কওয়েল্ড দেখিয়েছেন এরা গুণে ষষ্ঠ শ্রেণীর পদার্থের সঙ্গে মেলে। অতএব এ যাবে ছয়ের কোঠায়। আর সীসা যা পলোনিয়ামের রূপান্তর তা যাবে চতুর্থ শ্রেণীতে—তার নিজের কোঠায়।

অর্থাৎ একটা এটম আলফা কণা হারালে, যে নতুন পদার্থ পাওয়া যাবে তা বাঁদিকে

দু'ঘর সরে যাবে—সাজাতে গিয়ে সোডি এটাই দেখলেন। আবার পেছনে হটাও আছে ; সরতে সরতে শূন্য শ্রেণীতে গিয়ে আবার পদার্থগুলো ফিরে আসছে সপ্তম শ্রেণী বাদ দিয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে। এও সোডির তথ্য থেকে প্রাপ্তি। এই ভাবে সরিয়ে সরিয়ে সবকটা পদার্থকে সাজালে, তাদের রাসায়নিক গুণ ঠিক থাকছে কিনা, সেটা প্রমাণ করতে পারলে তথ্য তত্ত্বে পৌঁছুবে। সোডি তার সহকারী হিসাবে আলেকজাণ্ডার ফ্লেক (Alexander Fleck)-কে এই কাজেই লাগালেন। ফ্লেক 1912 সালের গ্রীষ্মের মাঝামাঝি কাজ শেষ করে ফেললেন। দেখা গেল, ইউরেনিয়াম-এক্স আর থোরিয়ামের রাসায়নিক গুণ এক, আবার রেডিও-একটিনিয়াম আর থোরিয়াম এক। থোরিয়াম বি আর সীসায় মিল। ফ্লেক সোডির ধারণাটা প্রমাণ করতে পারলেন। দু'ঘর সরিয়ে সরিয়ে ছক সাজান হলো, এক কোঠায় থাকল একাধিক রূপান্তরী পদার্থ তাদের এটমের ওজন আলাদা, অথচ গুণে ধর্মে একেবারে এক!



ইউরেনিয়াম সিরিজ

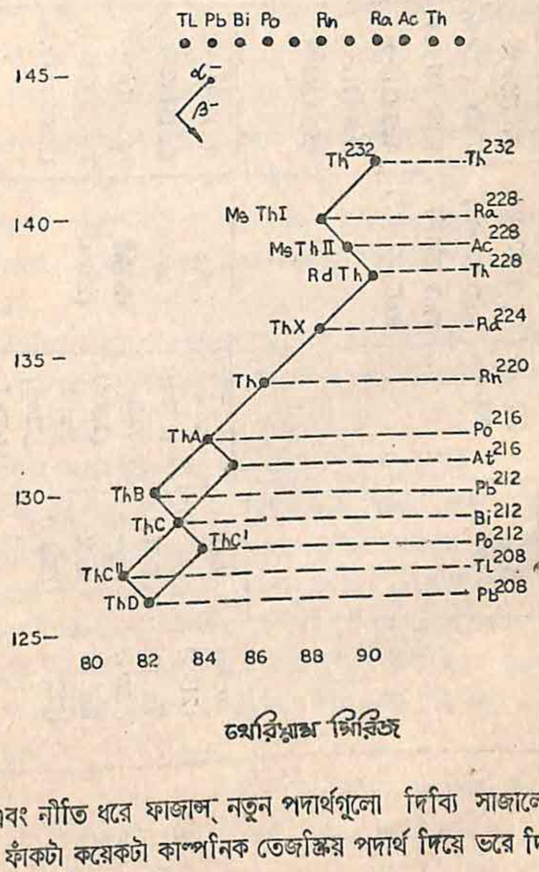
এদিকে কাসিমির ফাজান্স (Kasimir Fajans) তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলো আরেক ভাবে সাজাতে লেগেছেন। তিনিও পর্যায় চক্র নিয়ে আলোচনা করলেন। সোডি দিয়েছেন চক্রের যোজ্যতার ব্যাখ্যা, ফাজান্স দিলেন ইলেকট্রিক চার্জের গুণগত ব্যাখ্যা।

পর্যায়চক্র (1912 সাল)

0	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
হিলিয়াম He 3·99	Li 6·94	Be 9·1	B 11·0	C 12·0	N 14·0	O 16·0	F 19·0	
নিওন Ne 20·2	Na 23·00	Mg 24·32	Al 27·1	Si 28·3	P 31·0	S 32·07	Cl 35·46	
আর্গন A 39 9	K 39 10 Cu 63·6	Ca 40·1 Zn 65·4	Sc 44·1 Ga 69·9	Ti 48·1 Ge 72·5	V 51·0 As 75·0	Cr 52·0 Se 79·2	Mn 54·9 Br 79·92	Fe 55·8 Co 59·0 Ni 58·7
ক্রিপটন Kr 82 9	Rb 85·5 Ag 107·88	Sr 87·6 Cd 112·4	Y 89·0 In 115	Zr 90·6 Sn 119·	Nb 94 Sb 120·2	Mo 96·0 Te 127·5	I 126·9	Ru 101 7 Rh 102 9 Pd 106·7
ক্সেনন Xe 130	Ca 133 —	Ea 137·4 —	La 139·0 Yb 172·0	Ge 140·25 —	— Ta 181·5	— W 184·0	— —	Os 191 Ir 193·4 Pt 195·2
—	An 197·2 —	Hg 200·6 রেডিয়াম Ra 226·0	Tl 204·0 —	Pb 207 1 Th 232·4	Bi 208·0 —	— U 238 5	—	

ফাজান্স দেখলেন বাঁদিকের পদার্থগুলো চার্জের দিক দিয়ে বেশী নেগেটিভ। এই শক্তির মাত্রা ধীরে ধীরে কমে যায়। আর ডানদিকের সপ্তম শ্রেণীর পদার্থগুলো চার্জের দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশী পজিটিভ।

ফাজান্স্ দেখলেন, সপ্তম শ্রেণী থেকে ধরলে বাঁদিকে নেগেটিভ গুণ বাড়তে থাকে। অতএব কোনো পদার্থ যদি একটি বিটা কণা ছাড়ে তবে সে হারাবে নেগেটিভ চার্জ; সুতরাং নতুন রূপান্তরী পদার্থ এক ঘর সরে ডানদিকে; আলফা কণা হারালে, হারাবে পজিটিভ চার্জ; সুতরাং পদার্থ সরে আসবে বাঁদিকে। ফাজান্স্ আরও দেখলেন, তেজস্ক্রিয় পদার্থের শৃঙ্খলে যে সব পদার্থকে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে কোন বিকিরণ করছে না—তাদেরও বিকিরণ আছে; তবে এই বিকিরণ অতি ধীরে ধীরে হয়—বিকিরণ বিটা-রে হারায়। আবার যে পদার্থ আলফা বিটা দুটোই কণা হারাবে, সে ডাইনে বাঁয়ে দুদিকেই নতুন পদার্থ সৃষ্টি করবে।



থোরিয়াম সিরিজ

এই রীতি এবং নীতি ধরে ফাজান্স্ নতুন পদার্থগুলো দিব্যি সাজালেন; কটা ফাঁক অবশ্য থাকল। ফাঁকটা কয়েকটা কাল্পনিক তেজস্ক্রিয় পদার্থ দিয়ে ভরে দিলেন ফাজান্স্—তাঁর বিশ্বাস এরা থাকবে।

ফাজান্সের পর্যায়চক্র

0	I	II	III	IV	V	VI
	An 197·2	Hg 200·6	Ti (204·4) AcD (206·5) ThD (208·4) RaC_3 (210·5)	Pb (206·5) ThD (208·4) RaD (210·5) AcB (210·5) ThB (212·4) RaB (214·5)	Bi (208·4) RaE (210·5) AcC (210·5) ThC_1 (212·4) RaC_1 (214·5)	RaF (210·5) ThC_2 (212·4) RaC_1 (214·5) AcA (214·5) ThA (216·5) RaA (218·5)
AcEm (218·5) ThEm (220·4) RaEm (222·5)	AcX_2 (218·5) ThX_2 (220·4) RaX (222·5)	AcX (222·5) ThX (224·4) Ra (226·5) MsTh I (228·4)	Ac (226·5) $MsTh_2$ (228·4)	RaAc (226·5) RaTH (228·4) Io (230·5) Th (232·4) UrX (234·5)	UrX_2 (234·5)	Ur II (234·5) Ur I (238·5)

সোডির কোনো ফাঁক নেই। চার্জ নিয়ে সোডি চিন্তা করেন নি ; তাঁর কাজ রাসায়নিক গুণ নিয়ে। গুণগত মিল হলে এক কোঠায় রাখো—সোডির এই সহজ পদ্ধতি। আইন বা বে-আইন হচ্ছে কিনা পরে দেখা যাবে ; সাজানো যদি ঠিক হয়, আইন আপসে বদল হবে।

সোডি চিন্তায় অদ্বৈত-পন্থী—একমাত্র যোজ্যতাই তাঁর প্রাপ্তি। ফাজান্স্ দুই চার্জ নিয়ে দ্বৈত-পন্থী। দুটো ধারা মেলাতে তাঁর ফাঁক থাকছে, তা পূর্ণ করলেন নতুন পদার্থ দিয়ে। সোডি যুক্তিবাদী, ফাজান্সের আছে বিশ্বাস।

হরেদরে একই বস্তু পাওয়া গেল। যতটুকু সন্দেহ ছিল, বর্ণালি তার নিরসন করল। দেখা গেল, আইওনিয়াম আর থোরিয়ামের বর্ণালি এক, যদিও আইওনিয়ামের জনক ইউরেনিয়াম। এদের রসায়নগত গুণও যে এক—তা আগেই প্রমাণ হয়েছিল। এটমের ওজন আলাদা হোক না কেন—বর্ণালি এদের এক করে দিল। একমের ওজন প্রধান নয় ; মূল হল গুণ। গুণই মাপকাঠি—ওজন নয়।

একই কোঠায় অতএব একাধিক পদার্থ আসছে। আগের মতো তির্যক হয়ে এরা বসছে না। এরা আসছে একের পর এক সারি বেঁধে। এদের ওজন আলাদা, তবু এরা একসঙ্গে থাকবে, কারণ এদের গুণ এক, বর্ণালিও এক।

সোডি বললেন, এরা এইভাবেই থাকবে। কারণ এরা আইসোটোপ (isotope)। গ্রীক আইসোটোপ কথাটার মানে অবস্থানে সমান (equal in space)।

বিজ্ঞান বললেন তথাস্তু। এইসব বিভিন্ন বংশের, বিভিন্ন বংশধরদের যখন গুণে ধর্মে মিল আছে, এরা যখন সমধর্মা, সমমিল, তখন এদের সমাবস্থান হোক। এরা থাকুক এক কোঠায় আইসোটোপ হয়ে।

তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিখ্যাত সমস্যার সমাধান হলো। নতুন পর্যায়চক্র তৈরি হলো সোডি-ফাজান্সের কাজ ভিত্তি করে। আলফা আর বিটাকণা—এ দুইটি তখন বিজ্ঞানীদের হাতিয়ার।

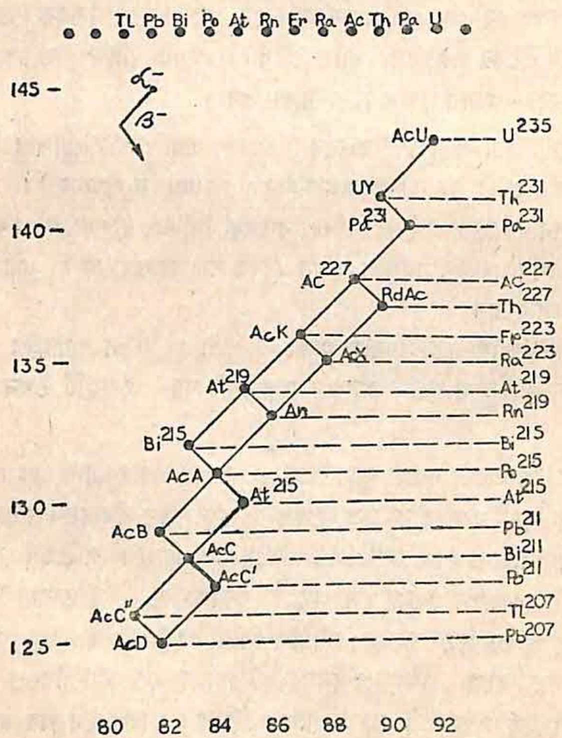
আলফাকণা আরও একটা দরজা খুলে দিল, সে কথায় এবার আসা যাক।

আবার রাদারফোর্ডের কাজের কথা আসছে। তেজস্ক্রিয়তা বিজ্ঞানে রাদারফোর্ড ছাড়া গীত নেই। নানা বিজ্ঞানী কাজ করেছেন। তবে মূল ধুয়োটা গাইছেন রাদারফোর্ড। সহযোগী বিভিন্ন। কোরাস গানের মূল গায়েন রাদারফোর্ড। ইতিমধ্যে 1908 সালে অবশ্যি তিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন ; মনট্রিল থেকে স্থিতু হয়েছেন ইংলণ্ডের কেভিণ্ডিস লেবরেটরিতে। বয়স হচ্ছে ; কিন্তু এখনো ফোর্ড গাড়ির মত কর্মঠ, বিশ্বস্ত। নতুন কাজ শুরু করলেন রাদারফোর্ড, সহযোগী এযুগে হ্যান্স গাইগার। কাজ চলল চার বছর—1908 সাল থেকে 1912 সাল অবধি।

জে. জে. টমসনের কথা আবার আসছে। 1897 সালে টমসন দেখলেন কেথড-রে নেগেটিভ চার্জ নিয়ে যায়, এর ভেদ করার ক্ষমতা আছে। সুতরাং এদের কণা ধর্ম আছে। টমসন এদের নাম দিলেন ইলেকট্রন। টমসন এদের চার্জ এবং ভরের হার বার করলেন।

দেখলেন ধাতু উত্তপ্ত হলে যে নেগেটিভ কণা বের হয়, অতিবেগুনী আলের আঘাতে যে বিকিরণ কণা ধাতু থেকে পাওয়া যায়, অথবা তেজস্ক্রিয় বিটা-রে'র কণা—সবকটির চার্জ ও ভরের হার কেথড-রে-তে পাওয়া চার্জ ও ভরের হারের সমান। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সংশোধিত হয়ে এই হার প্রায় ধ্রুবক সংখ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সবকিছুই দাঁড়াচ্ছে একটা আইডিয়া বা ধারণার উপর—কেথড-রে কণার সমষ্টি। এর ভেদ করার ক্ষমতা থেকে আরও একটা ধারণা হল। এই কণা আকারে অনেক ছোট, এমন কি এটমের চেয়েও ছোট—নইলে এই ভেদ করার শক্তির ব্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভব। তাছাড়া ফেরাডের পরীক্ষায় এটমের আয়নায়িত হবার অবস্থা আমরা দেখেছি, তারও একটা সুবোধ্য অর্থ পাওয়া যায় যদি ধরে নেওয়া যায় যে ইলেকট্রন এটমের উপকরণ, আকারে অতি ছোট এবং চার্জ নেগেটিভ।

অর্থাৎ একলাফে মলিকিউল পার হয়ে পদার্থবিদ্ এটমকে ডিঙিয়ে এটমের উপাদান নিয়ে পড়লেন। গ্রীক এটমের অর্থ অবিভাজ্য—যা ভাগ করা যায় না।



একটি সিয়াম সিরিজ

এটম ভাঙার চিন্তা শুরু হলো। নামটাই মিথ্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে—কানার নাম পদ্মলোচন, বিভাজ্যের এটম।

চিন্তার এই পরিবর্তন একদিনে হয় নি। এক্স-রে'র সাহায্যে কেলাসের গঠন জানা

গেছে। তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে পাওয়া গেছে নেগেটিভ বিটা এবং পজিটিভ আলফা কণা। পাওয়া গোছে শক্তি-তরঙ্গ গামা-রে। টমসন দিলেন ইলেকট্রনতত্ত্ব। অতএব পদার্থ-বিদ্‌রা এটমের সঙ্গে আড়ি ভুললেন ; ভাব করতে এবং সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইলেন এটমের অন্দরমহলে কী আছে! যতক্ষণ খেলনাটা হাতে পাওয়া যায় নি, ছেলেটির উৎসাহ বোঝা যায় নি। খেলনা হাতে এল, সুতরাং ভেঙে দেখ এর ভেতরের কলকজাটা।

টমসন নিজে একটা মডেলের কল্পনা করেছিলেন। এটম পজিটিভ মেঘে তৈরি, আকারে গোলাকার। নেগেটিভ ইলেকট্রন আকাশে তারার মত ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যেন একটা কিসমিসভরা প্লাম কেক—কিসমিস কেকের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। গণিতের প্রমাণে টমসন দেখালেন যে এই নেগেটিভ ইলেকট্রনের অবস্থানের কতগুলো প্যাটার্ন বল-বিজ্ঞানের রীতিতে বেশ স্থায়ী। তিনি ভাবলেন, বিভিন্ন রাসায়নিক গুণ অনুসারে মূল পদার্থে ইলেকট্রনগুলি বিভিন্ন প্যাটার্নে থাকবে। পজিটিভ চার্জ মেঘে এই ইলেকট্রনের গতি-স্পন্দন সৃষ্টি করবে—এই স্পন্দনের frequency বা স্পন্দক সংখ্যা আলোর সমান হতে পারে। আবার কোনো কোনো পদার্থের বাইরের ইলেকট্রনগুলোকে সহজে সরানো যেতে পারবে। টমসনের মডেলে আলোর উৎপত্তি, আলোর শোষণ জানা গেল ; তেমনি বোঝা গেল কীভাবে কেথড-রে বা বিটা-রে'র বিকিরণ সম্ভব।

তবু সংশয় থাকে। তছাড়া এই আকৃতির বা মডেলের প্রমাণ কোথায়? রাদারফোর্ড প্রমাণ ছাড়া কোন জিনিসই সত্য বলে ধরেন না। 1909 সাল, রাদরফোর্ড গাইগারের সঙ্গে একজন আণ্ডার-গ্রাজুয়েট ছাত্র দিলেন সহকারী হিসাবে, নাম মার্সডেন (Marsden)। তাঁদের কাজ আলফা ছড়িয়ে পড়ে কিনা দেখা।

অনেক আগে রাদারফোর্ড এই আলফা-রে' ছড়িয়ে পড়া দেখেছিলেন। তাঁর ধারণা হলো, ছড়িয়ে যাওয়া আলফা-রে এটমের অন্দরমহলের খবর দেবে। গাইগাররা দেখবেন, কোনো পদার্থের ভেতর আলফা-রে পাঠালে তারা কতটা ছড়াবে, কীভাবে ছড়াবে এবং ছড়ানোর প্রকৃতিটা কী ধরনের হবে।

গাইগার আর মার্সডেন পাতলা সোনা বা অন্য কোনো ধাতুর পাতে আলফা কণার ধারা দিয়ে আঘাত করলেন। পাতটি প্রায় 0·00005 সেণ্টিমিটার পুরু অথবা 2000 এটমের মতো মোটা। আলফা কণা মানে নেগেটিভ চার্জ হারানো হিলিয়ম এটম। অতএব এটমকে যদি টমসনের মডেলের আকারে পজিটিভ মেঘে গড়া গোলাকার বস্তু ধরি তাহলে পরীক্ষাটা হবে যেন 100 ফুট পুরু দেয়ালে একটা টেনিস বল জোরে ছুঁড়ে মারা।

গাইগার পরীক্ষায় আলফা-রে'র ছড়িয়ে যাওয়া দেখলেন। মার্সডেন আর গাইগার পরীক্ষায় দেখলেন, আলফা-রে ধাতুর পাতে আঘাত করে বাইরে বেরিয়ে আসছে। গতি-পথের বিচ্যুতি প্রায় সর্বত্রই দু-এক ডিগ্রি মাত্র। কিন্তু কতগুলো কণার বিচ্যুতি 45° ; কতগুলোর 90°, কতগুলোর আরও বেশী। বিষম কোণের এই বিচ্যুতির ফলে কণাগুলো বেরিয়ে আসছে না, যেন ধাক্কা লেগে পেছনে হটে আসছে।

বিজ্ঞানী দুজন এই ছিটকান বাঁকা পথের কণার হিসাব নিলেন, দেখা গেল প্রতি

8000 কণায় একটি বাঁক 90° ডিগ্রির চেয়েও বেশী। গাইগার এই ছিটকে আসা দেখে ভাবলেন, কণাদের যে সামান্য দুই-এক ডিগ্রি বিচ্যুতি ঘটেছে, তাদেরই সমষ্টিগত ধাক্কা-ধাক্কির ফলে এই বেশী বিচ্যুতি সম্ভব। গণিতের ছক এঁকে সাজাতে গিয়ে কিন্তু 8000-এর মধ্যে একটি কণার এই বিশেষ বিচ্যুতির হিসাবটা পাওয়া গেল না। গাইগারের হিসাবে—8000 নয়, সংখ্যাটা অনেক বড় হওয়া উচিত ছিল।

পরীক্ষার ফল কিন্তু আট হাজারে একটা—এই হিসাবের কোনো ভুল পাওয়া গেল না। মনে হলো আবার একটা ধাঁধা তেজস্ক্রিয়পদার্থ হাজির করছে। উত্তর জানা যাচ্ছে না।

তেজস্ক্রিয় পদার্থের ধাঁধা মানেই রাদারফোর্ডের আওতা। তথ্য হাতে এসেছে—শুধু উত্তরটা খুঁজে পাওয়া বাকি। রাদাফোর্ড খোঁজেন। রাদারফোর্ডের চিন্তা অতি সরব। গোটা কেভেণ্ডিস লেবরেটরি রাদারফোর্ডের বিভিন্ন ধারণার কথা জানতে পারছে। 1910 সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ডিসেম্বর তক চলল নানা পরীক্ষা আর তথ্য থেকে তত্ত্ব গড়ার আলোচনা ; ডিসেম্বরে রাদারফোর্ড খুশমেজাজে সকলকে জানালেন, এটমের গঠন যে কী তা তিনি জেনে ফেলেছেন। লেবরেটরির ঝাড়ুদার থেকে তা'বড় তা'বড় বিজ্ঞানীদের এই খুশ খবর না-জানা রইল না। মূল ধারণা হলো এই ঃ

আলফা কণার কাছে ধাতুর পাত প্রায় ফাঁকা মনে হবে। অথচ কখনও কখনও কোনো শক্ত কিছুতে ধাক্কা লেগে এর গতির বিচ্যুতি হবে। আর বিচ্যুতি তখনই খুব বেশী হবে যখন ধাতুর মধ্যেকার কোনো ছিটকান কেন্দ্রের সঙ্গে কণাটির সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষের শক্তি হবে বৈদ্যুতিক। একটা আলফা কণাকে এইভাবে বিষম কোণ ঘুরিয়ে ফেলতে হলে দরকার প্রচণ্ড বিদ্যুৎ শক্তির। এই শক্তি বৈদ্যুতিক বিকর্ষণের—সম মেরুর চার্জে বিকর্ষণ পাওয়া যাবে।

একটি পজিটিভ চার্জবাহী আলফা কণা যদি কোনো পজিটিভ চার্জের কাছে আসে তবেই বিকর্ষণ হবে। আকর্ষণ বা বিকর্ষণ গণিতের একই সূত্রে প্রমাণ করা যায়। মাধ্যাকর্ষণ আকর্ষণ। ধূমকেতু এই আকর্ষণের ফলে সূর্যের কাছাকাছি এসে পরাবৃত্তাকার পথে ফিরে যাবে। বিকর্ষণের ফলও এক। চার্জ কণা বিকর্ষণের ফলে পরাবৃত্তাকার পথে বেরিয়ে যাবে। আকর্ষণ বা বিকর্ষণ দুয়েরই টানে পরাবৃত্তাকার পথ। আর এই পরাবৃত্তের বাহু দুটি যে কোণ তৈরি করবে অর্থাৎ যে পথে কণা আসবে এবং ফিরে যাবে—তা নির্ভর করবে কতটা কাছাকাছি চার্জবাহী কণা সম মেরুর চার্জের কাছে আসবে।

অঙ্কের হিসাবে রাদারফোর্ড এই অবস্থা ঘটলে কী হতে পারে তার পূর্বাভাস দিলেন। এবার দরকার পরীক্ষার প্রমাণ। গাইগার আরেকবার তার পরীক্ষাটা করলেন। এবার মাপলেন ছড়ানো কণাগুলোর যাওয়া আর আসার—এই দুই পথের কোণের মাপটা। ফলাফলে খুশি হলেন রাদারফোর্ড। তাঁর হিসাবের সঙ্গে পরীক্ষার ফলের মিল হচ্ছে। 1911 সাল নাগাদ তিনি ঘোষণা করলেন, শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ—এটমের কী আকার ধারণা হয়েছে। কেন্দ্রে আছে পজিটিভ চার্জ, এটমের ভরটা এখানেই জমা হয়ে আছে। ইলেকট্রন ঘুরছে এই কেন্দ্রটির চারদিকে। সৌরজগতের মডেলে গড়ে উঠল এটমের মডেল।

1911 সালের মে মাসে তাঁর বক্তব্য জানালেন রাদারফোর্ড। কোনো বিশেষ আলোচনার ঢেউ উঠল না। নিজের কাজেই ব্যস্ত রইলেন রাদারফোর্ড। শুধু একজন এই মডেল নিয়ে ভাবতে শুরু করলেন—তিনি নীয়েল বোর (Niels Bohr)। 1912 সাল। পর্যায়চক্রের নতুন রূপ সোডি জানিয়েছেন। রাদারফোর্ডের এটমের মডেল ম্যাঞ্চেস্টারে সবার স্বীকৃতি পেয়েছে। এই সময় বোর এলেন রাদারফোর্ডের লেবরেটরিতে।

বোরের শুধু একটা প্রশ্ন। ইলেকট্রন তার কক্ষ পথে থাকছে কী করে? তাছাড়া এই মডেলে যে এটম গড়ে উঠবে, তারা কী করে তেজস্ক্রিয়তার সমস্যার সমাধান করবে অথবা বিভিন্ন পদার্থের বর্ণালির বিশ্লেষণ বা রাসায়নিক গুণ? ইলেট্রনগুলিকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে থাকতে হবে। সৌরমণ্ডলে আছে আকর্ষণ, বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে আছে আকর্ষণ, আছে বিকর্ষণ। কাজেই চার্জে গড়া এটমের উপাদানের ক্ষেত্রে, সৌরমণ্ডলের অঙ্ক খাটবে না। তাছাড়া ইলেকট্রন যদি ঘুরতে থাকে, তবে নিউটন-মেক্সওয়েলের তত্ত্ব অনুযায়ী তার গতির পরিবর্তন হবে। চার্জকণার গতির পরিবর্তন মানেই আবার বিদ্যুৎ-চুম্বক তরঙ্গের সৃষ্টি—শক্তির বিকিরণ। আবার এই ঘুরতে থাকা ইলেকট্রন যদি চার্জ হারায় বা শক্তি হারায় তবে কেন্দ্রে এর নিশ্চিত পতন এবং এটমের মৃত্যু।

বোর নতুন তত্ত্বের প্রয়োগ করলেন—মেক্সপ্লাঙ্ক-আইনস্টাইনের কোয়াণ্টাম গতিবাদ। 1913 সালে হাইড্রোজেনের এটমের ব্যাখ্যা এই পদ্ধতিতে জানালেন বোর; কয়েকমাস পর অন্য পদার্থের এটমের সম্ভাব্য ধারণা তিনি বললেন: কেন্দ্রে বা নিউক্লিয়াসে সব ভর জমাট হয়ে থাকবে, অথচ নিউক্লিয়াস আকারে অতি ছোট; যেন একটি জ্যামিতিক বিন্দু। পর্যায়চক্রের সংখ্যা অনুযায়ী মূল পদার্থের ইলেকট্রনের সংখ্যা পাওয়া যাবে। যেমন, হাইড্রোজেনে থাকবে একটি ইলেকট্রন, হিলিয়ামে দুই এবং ইউরেনিয়ামে বিরানব্বই। নিউক্লিয়াস থাকবে এটমের কেন্দ্রে, এবং এটি আকারে অতি ছোট বলে আপেক্ষিকভাবে নিউক্লিয়াস এবং এটমের বহিঃসীমা বা ইলেকট্রনের একেবারে বাইরের কক্ষপথের দূরত্ব হবে অনেক বেশী। এই শেষ কক্ষপথের ইলেকট্রনগুলোই পদার্থের রাসায়নিক গুণ বা বর্ণালির রেখা বিভিন্ন হবার কারণ। অর্থাৎ এটমের গুণ তার বাইরের কক্ষের ইলেকট্রনের সংখ্যা বা তাদের অবস্থানের প্যাটার্নের উপর নির্ভর করবে। মূল পদার্থের গুণ এক থাকা মানে, এই বহিঃকক্ষের ইলেকট্রনের সংখ্যা বা প্যাটার্ন এক হওয়া; নিউক্লিয়াসের ভরের উপর এটা নির্ভর করবে না।

ভারি মৌলিক পদার্থগুলোর ওজন হাইড্রোজেনের ওজনের ঠিক গুণিতক নয়। বোরের ধারণায় হাইড্রোজেনের কেন্দ্রে আছে একটি মাত্র পজিটিভ চার্জবাহী নিউক্লিয়াস যার নাম দেওয়া হলো প্রোটন—আর তার চারদিকে ঘুরবে একটি মাত্র ইলেকট্রন, একটি মাত্র নির্দিষ্ট বিশেষ কক্ষপথে।

অন্য পদার্থের ক্ষেত্রে এটমের ওজন অনুযায়ী কেন্দ্রে প্রোটন এবং ইলেকট্রন থাকবে, শুধু কক্ষপথের ইলেকট্রনের সংখ্যা তার পর্যায়চক্রের সংখ্যা অনুযায়ী হবে।

যেমন সোডিয়াম। এর চক্রের সংখ্যা এগার, অথচ ওজন তেইশ। বোর বললেন,

এর কেন্দ্রে থাকবে তেইশটা প্রোটন এবং বারোটা ইলেকট্রন। অর্থাৎ কেন্দ্রের ওজন তেইশটা প্রোটনের, আর চার্জ থাকবে এগার ইউনিট। এই কেন্দ্রের চারদিকে এগারটি ইলেকট্রন ঘুরবে, এদের আছে নেগেটিভ চার্জ। সুতরাং, এটমটি চার্জের দিক দিয়ে নিরপেক্ষ হলো। আবার এই কক্ষের ইলেকট্রনই পদার্থটির রাসায়নিক গুণ, বর্ণালি ইত্যাদির কারণ হবে। কেন্দ্রের ওজন প্রোটন-ইলেকট্রনের সংযুক্তি বাড়ালেই বাড়বে, কমালে কমবে। আবার যদি কেন্দ্রের কোনো ইলেকট্রন বা প্রোটন বেরিয়ে পড়ে, তবে পদার্থটি চার্জের দিক দিয়ে নিরপেক্ষ থাকবে না, প্রোটন বা ইলেকট্রন ত্যাগ করে পদার্থটি আবার নিরপেক্ষ হবে। কেন্দ্রের ওজন কম বেশী হলেও যদি কক্ষের ইলেকট্রনের সংখ্যা এক থাকে, তবে পদার্থগুলির রাসায়নিক গুণ বা বর্ণালি এক থাকবে। কেন্দ্র দেবে এটমের ওজন এবং কক্ষ পথের ইলেকট্রন দেবে এটমের গুণ।

বোরের এটমের প্যাটার্ন এই মডেলেই জানানো হলো।

অর্থাৎ সমগুণ পদার্থের ওজন আলাদা হতে পারে; গুণ নির্ভর করবে তাঁর বহিঃসীমার ইলেকট্রনের উপর। আইসোটোপের একটা নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা পাওয়া গেল।

একই যুক্তি অন্যত্র প্রয়োগ করা হলো। যদি নিউক্লিয়াস একটা আলফা কণা হারায়, তাহলে দুই ইউনিট পজিটিভ চার্জ কমে যাবে। কারণ আলফা কণা মানে হিলিয়াম এটম এবং পর্যায়চক্রে হিলিয়ামের স্থান দু'নম্বরে। নিউক্লিয়াসের দুটি চার্জ কমা মানে দুটি ইলেকট্রন ছেড়ে আবার পদার্থটিকে নিরপেক্ষ করে আনা—পর্যায়চক্রে পদার্থটির দু'ঘর হটে আসা। সোডি যোজ্যতার হিসেবে এটাই পেয়েছিলেন। আবার নিউক্লিয়াস যদি একটি বিটা কণা হারায়, তবে এক ইউনিট পজিটিভ চার্জ বাড়বে; অতএব নতুন পদার্থ একঘর এগিয়ে যাবে। ফাজান্সের বক্তব্য প্রমাণ হলো। বোর-রাদারফোর্ডের মডেল প্রতিষ্ঠা পেল। সময় 1913 সাল—প্রথম মহাযুদ্ধের আগের বছর।

যুগটা শুরু হয়েছিল এক্স-রে নিয়ে। মানুষের ভেতর দেখা গেল এই রশ্মি দিয়ে। আবার এক্স-রে'র পথ ধরে বিজ্ঞান এগিয়ে গেল তেজস্ক্রিয় পদার্থের জগতে। তারই ফলে পাওয়া গেল নতুন পর্যায়চক্র। জানা গেল মূল পদার্থের রূপান্তর সম্ভব। তেজস্ক্রিয়তা আবার এটমের অভ্যন্তরে দৃষ্টি ফেলল। হাড় জোড়া দেবার ঘটনা নিয়ে আরম্ভ হয়েছিল—সেটা 1896 সাল। সতের বছরও কাটল না—বিজ্ঞান পৌঁছে গেল এটম ভাঙার দ্বারে।

তথ্যই দেবে তত্ত্ব—সনাতন বিজ্ঞানের এই সত্য রাদারফোর্ড তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করলেন। রাদারফোর্ড সনাতন আর আধুনিক বিজ্ঞানের সেতু। যা পরীক্ষায় প্রমাণ হয় না, তাতে তাঁর বিশ্বাস নেই। তথ্য থেকে গড়ে তুললেন তিনি ধারণা, রীতি বা নীতি; ধারণাকে প্রমাণ করলেন পরীক্ষায়।

অণুর অন্দরমহলের দ্বার পর্যন্ত তিনি পৌঁছে দিলেন। তারপরই ছকটা পালটালো—তথ্যই কি সব জিজ্ঞাসার জবাব দেবে?

নতুন ছকে তত্ত্ব পূর্বাভাস জানাবে। তথ্যে প্রমাণ হবে সেই ঘোষণা। নইলে জগতের রীতি-নীতি, মহাকাশের গতিবিধি পরীক্ষার ছকে কী ভাবে ফেলা যাবে!

স্ফুলিঙ্গ আলো জ্বালায়—সে আলো দিগ্দর্শী, সর্বদর্শী, মহাদ্যুতি এবং ধ্বান্তারি। তেজস্ক্রিয়তার যুগে পাওয়া নতুন তত্ত্ব সেই স্ফুলিঙ্গ।

বিজ্ঞান তত্ত্বের দ্বারে হাজির হলো।

তেজস্ক্রিয়তার পুঁথি এখানেই শেষ হলো! পুঁথিবদ্ধ করার আগে পাঁচালিকার তার শেষ অধ্যায় গাইবেন। ভালমানুষেরা, তামা তুলসি হাতে নিয়ে শুনুন ঃ

বেকরেল, রাদারফোর্ড, কুরিরা মাতে।
রেডিও একটিভ পদার্থ সাথে॥
খুঁজতে খুঁজতে দম্পতি কুরি।
কুড়িয়ে পেল তেজ ধাতু জুরি॥
আবার পেল সব দশবিশ নয়া।
কেহ দেয় রশ্মি, কেহ দেয় হাওয়া॥
আলফা-বিটা গামা-রে।
একটা-না একটা সবাই ছাড়ে॥
রূপান্তরে মেলে নতুন ধাঁধা!
কে কার মামা, কে কার দাদা॥
কোথায় রেডিয়াম আর কোথায় সীসা।
কী যে ঘটেছে, না পাই দিশা॥
আলফা হিলিয়াম, বিটা কণা।
এদের জেনে যাবে ধাতু জানা॥
বিটা ছাড়লে ডাইনে গতি।
আলফা তাজি রয় বামে সতী॥
সার বেঁধে আসে ধাতুর ঝাঁক।
বিজ্ঞান বলে, সামলে রাখ॥
সোডি ফাজান্স চক্রে বসে।
ব্যাটাদের ধরে কোঠায় ঠেসে॥
ওজনে তফাত, গুণেতে এক।
একঘরে কেমন রয়েছে দেখ॥
গাইগার মার্সডেন আলফা ছোঁড়ে।
ধাক্কায় আলফা উলটে পড়ে॥
ফোর্ড ভাবে, এ কেমন হ্যাপা।
এমন কান্ত না দেখি বাপা॥
প্রোটন কেন্দ্রে, দোসরা চার্জে—
বিটা ঘোরে ; চ্যাচায়, ছাড় যে॥

প্রোটন ইলেকট্রন বোরের চাল।
এটম ভাঙছে, সামাল, সামাল ॥
চৌকাঠে বিজ্ঞান দেয় তো উঁকি।
তথ্য-তত্ত্বের জব্বর ঝুঁকি ॥
পুঁথির পালা সাঙ্গ হলো।
এটম এইবার ঘোমটা খোলো ॥

৩. পঞ্চপ্রদীপ

সনাতন বিজ্ঞানের পদ্ধতি দিয়ে বর্ণালির পুরো অংশটার শক্তি-বণ্টনের সূত্র পাওয়া গেল না। বিজ্ঞানী জিন্‌স্ সনাতন বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করলেন। সনাতন বিজ্ঞানের কাঠামোর বাইরে চিন্তা করা শুরু হলো। বিজ্ঞানের আধুনিকীকরণ আরম্ভ হলো।

বিংশ শতাব্দীর আরম্ভেই চমক। 1900 সালে মেক্সপ্লাঙ্ক একটি নতুন পদ্ধতির সাহায্যে বর্ণালির সব অংশের শক্তি-বণ্টনের সমস্যা একটি মাত্র দিয়ে প্রমাণ করলেন। এই নতুন প্রণালীটিকে বলা হয় প্লাঙ্কের কোয়াণ্টাম প্রকল্প বা সংক্ষেপে প্লাঙ্কের সূত্র। প্লাঙ্কের এই সূত্রটিই আধুনিক কোয়াণ্টামবাদ্, কোয়াণ্টাম গতি-বিজ্ঞানের মূল। এ ছাড়া এই সূত্রটির আলোচনার ফলে একটি নতুন সংখ্যায়ন বিভাগ গড়ে উঠল। যাকে বলা হয় কোয়াণ্টাম সংখ্যায়ন। কোয়াণ্টাম গতিবাদ আর কোয়াণ্টাম সংখ্যায়ন এ দুটি প্রণালীর প্রয়োগে অণু-জগতের বহু রহস্যের বহু জটিল সমস্যার সমাধান পাওয়া গেল।

সনাতন বিজ্ঞানের মূল ধারণা ছিল শক্তি বা এ জাতীয় ধর্মে পরিবর্তন নিরবচ্ছিন্ন। আমাদের দৃশ্যমান জগতের সমস্যার সমাধানে এই ধারণাটা বেশ খাটছিল। অথচ তাপ, বিকিরণ ইত্যাদির সমস্যা সনাতন বিজ্ঞান দিয়ে সমাধান হলো না।

প্লাঙ্ক প্রথমেই শক্তির বিচ্ছিন্ন পরিবর্তনের কথা বললেন। আর মেক্সওয়েলের তড়িৎ-চুম্বক তত্ত্বের মূল ধারণাটি হলো যে, একটি তড়িৎ কণা বা স্পন্দকের গতির পরিবর্তন বা ত্বরণ থাকলেই শক্তির বিকিরণ হবে। প্লাঙ্ক এই তত্ত্বের বিরোধিতা করলেন। অর্থাৎ সেই আমলের যে দুটি তত্ত্ব বা সত্য, বর্ণালির শক্তি-বণ্টনের সূত্র প্রমাণ করতে বিফল হয়েছিল, প্লাঙ্ক সেই দুটি সূত্র পুরোপুরি মানলেন না।

প্লাঙ্ক বললেন যদি কোনো পদার্থ কণা বা স্পন্দক, রশ্মি বিকিরণ করতে করতে E_1 শক্তি থেকে E_2 শক্তিতে যায়, তবে ঐ রশ্মির স্পন্দক সংখ্যা ν (নিউ) ধরলে—

$$E_1 - E_2 = nh\,\nu \text{ হবে।}$$

এখানে n যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা এবং h-কে প্লাঙ্কের ধ্রুবক বা Plank constant বলা হয়। এই সূত্র অনুসারে ν সংখ্যক স্পন্দন সংখ্যা বিকিরণের জন্য উৎস স্পন্দকের শক্তির প্রভেদ অথবা বিকিরণ যে শক্তি বয়ে নিয়ে যাবে তা h এবং ν এর গুণিতক।

যেমন নিমন্ত্রণ বাড়ির পঙ্‌ক্তি ভোজন। প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক লোক বসেছেন। মিষ্টি যাচাইয়ের সময় এল। নিমন্ত্রিতেরা সজাগ হয়ে উঠলেন। এঁরা প্রত্যেকে প্রতিবার এক বা একাধিক সমান সংখ্যক মিষ্টি নেবেন। এখন মিষ্টির হাঁড়ির ওজনের পরিবর্তন নির্ভর করবে ভোজনবিলাসীরা কজন, পরিবেশক কবার যাচাই করবেন এবং

ভোজনিকরা কটি করে প্রতিবারে মিষ্টি নেবেন, তার উপর। এটা ঠিক, একটি পঙ্‌ক্তির ভোজনিকরা ইচ্ছামত মিষ্টি নিতে পারতেন, তবে প্লাঙ্কের ধারণা মতো, এদের নিরবচ্ছিন্ন সুযোগ না দিয়ে, বিচ্ছিন্নভাবে একেক সারিতে একেক রকম সম সংখ্যক মিষ্টি দেওয়া হবে।

এখন যদি ধরি প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিতে সমান সংখ্যক ভোজনিক, তবে আমাদের পরিবেশকদের কাছে এটা একটা ধ্রুব সংখ্যা হবে। একেই আমরা বলি h। এই ভোজনিকদের যাচাই করতে পরিবেশকরা বার বার যাতায়াত করবেন, এটি প্রতি পঙ্‌ক্তিতে বিভিন্ন হতে পারে, আবার একও হতে পারে। এই যাতায়াতটাকে বলি ν। তাহলে মিষ্টির হাঁড়ির ওজনের পরিবর্তন প্রত্যেক সারিতে যদি একই রাখতে চাই, তবে দেখতে পাচ্ছি, এটা সম্পূর্ণভাবে ভোজনিকরা প্রতি পঙ্‌ক্তিতে কটি করে মিষ্টি প্রতিবার যাচাইয়ের সময় নেবেন তারই উপর নির্ভর করবে। অর্থাৎ মিষ্টির সংখ্যা বাড়লে যাচাইয়ের সংখ্যা কমবে। এক কথায় n এবং ν পরস্পরের পূরক। শক্তির প্রভেদ একই রাখলে, ν পাল্টালে n পাল্টাবে। অর্থাৎ একই শক্তির প্রভেদে বিভিন্ন স্পন্দন সংখ্যা পাওয়া যাবে।

প্লাঙ্ক নিরবচ্ছিন্নতার ধারণা ভাঙলেন। বললেন, একই ধরনের বা একই ধর্মের দলের কথা। তাছাড়া আরো বললেন, শক্তির প্রভেদে একাধিক স্পন্দন সংখ্যা পাওয়া সম্ভব।

গত শতাব্দীর শেষে একটা অদ্ভুত ব্যাপার পরীক্ষার ফলে জানা গেল। এটাও সনাতন বিজ্ঞানের প্রয়োগে প্রমাণ করা গেল না। দেখা গেল, কোনো ধাতুফলকের উপর যদি আলো বা অন্য বিকিরণ রশ্মি পড়ে তবে ইলেকট্রন রশ্মি ধাতুফলক থেকে বেরিয়ে আসে। সোজা কথায়, ধাতুফলকে আলোর পাতনে আমরা ইলেকট্রন রশ্মি পাই। এই ব্যাপারটাকে বিজ্ঞানীরা বললেন আলোক-তড়িৎ ফল বা photo electric effect। এখন এই ইলেকট্রন পাব কি পাব না, তা মোটেই আলোর ঔজ্জ্বল্য বা brightness-এর উপর নির্ভর করবে না—করবে আলোর রঙের উপর। প্রত্যেক আলোর রঙের স্পন্দন বিভিন্ন। কাজেই বিদ্যুৎ শক্তি বেরিয়ে আসা নির্ভর করবে, পতিত আলোর রশ্মির স্পন্দন সংখ্যার (frequency) উপর। আবার প্রত্যেক ধাতুর একটা বিশেষ স্পন্দন সংখ্যা আছে, তাকে বলা হয় characteristic frequency বা বিশেষ স্পন্দন সংখ্যা। একে আবার পরম স্পন্দন সংখ্যাও বলা হয়। এখন যে রশ্মি বা আলো ঐ ধাতুর উপর পড়বে, তার frequency বা স্পন্দন সংখ্যা যদি ধাতুটির পরম স্পন্দন সংখ্যার চেয়ে কম হয়, তবে কোনো বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে না। কিন্তু যদি রশ্মির স্পন্দন সংখ্যা ধাতুর পরম স্পন্দন সংখ্যার সমান বা বেশী হয়, তবে তড়িৎ-শক্তি পাওয়া যাবে। স্পন্দনের তফাত যত বেশী হবে ততই ইলেকট্রনের গতি বাড়বে। তড়িৎ-শক্তিও বেশী হবে।

এ যেন ওজন তোলা। যতক্ষণ না ওজনের সমান শক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে, ওজন নড়ানো যাবে না। শক্তি যতই বাড়বে, ওজন ততই উপরে ওঠানো যাবে। আর উপরে ওঠানোর গতি এই শক্তির উপরই নির্ভর করবে।

বিকিরণের তীব্রতার উপরেই বেরিয়ে পড়া ইলেকট্রনের গতি বা তড়িৎ-শক্তির পরিমাণ

নির্ভর করবে। ব্যাপারটা বিস্ময়ের, সনাতন বিজ্ঞান এই বিস্ময়ের সমাধান করতে পারে নি। 1905 সালে প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম প্রকল্পকে ভিত্তি করে আইনস্টাইন সুন্দর একটি মীমাংসা করলেন।

তিনি বললেন, আলোর রশ্মি প্লাঙ্ক-প্রকল্প অনুসারে $h\nu$ (ν রশ্মির স্পন্দন সংখ্যা) শক্তি বয়ে নিয়ে যাবে। ধাতুর উপর যখন রশ্মিটি পড়বে, ধাতুর ইলেকট্রন তখন ঐ রশ্মি শোষণ করবে। এখন এই যে শক্তি যা ইলেকট্রন শোষণ করল, তা যদি ইলেকট্রনের ধাতুর ফলকে আটকে-থাকা বাঁধন ভেঙে এটিকে মুক্ত করতে না পারে, তবে ইলেকট্রনের মুক্তি নেই। শক্তি যত বেশী হবে, ইলেকট্রনের মুক্ত গতি ততই বাড়বে।

এ যেন ক্যারাম খেলা। স্ট্রাইকার ঘুঁটিকে আঘাত করলে ঘুঁটি নড়বে। এখন স্ট্রাইকার যদি ঘুঁটির গায়ে আস্তে লাগে তবে ঘুঁটি নড়তেও পারে, আবার নাও পারে ; ঘুঁটিটার ওজনের জন্য যে স্বাভাবিক স্থিতাবস্থা তা স্ট্রাইকারটি ভাঙতে পারবে কিনা তার উপর নির্ভর করবে নড়া। স্ট্রাইকার যত জোরে ঘুঁটিকে আঘাত করবে, ঘুঁটিটির গতিও তত জোরে হবে। ইলেকট্রনের মুক্তিও স্পন্দনের সংখ্যার উপর নির্ভর করবে।

আইনস্টাইন তার বিচার-বিশ্লেষণে আলোকে কণা হিসাবেই ধরলেন। তাদের নাম দিলেন ফোটন (photon)

প্লাঙ্ক-আইনস্টাইন একটি চৌপদী যেন লিখলেন—

এইচ আর নিউ-এ শক্তি পাই।
মেক্সপ্লাঙ্কের নতুন দাওয়াই ॥
এলবার্ট মেশায় স্পন্দন তত্ত্ব,
আলোক-তড়িৎ ধাঁধা জব্দ।

রাদারফোর্ড পরমাণু বা এটমের একটা মডেলের কথা বলেছিলেন। তাঁর মতে এটমের কেন্দ্রে আছে একটা নিউক্লিয়াস আর তার চার পাশে অনবরত ঘুরছে ইলেকট্রনের দল, বিভিন্ন কক্ষ পথে। অনেকটা যেন সৌরজগৎ—সূর্যের চারদিকে ঘুরছে গ্রহদল।

বিজ্ঞানী বোর 1913 সালে রাদারফোর্ডের এটমের মডেলের সমর্থন করলেন। সনাতন গতি-বিজ্ঞানের শক্তির নিরবচ্ছিন্নতার কথা ধরলে আমরা ইলেকট্রনের অসংখ্য সম্ভাব্য গতিপথ পাব। বোরের মতে কিন্তু এই ইলেকট্রনের কয়েকটি নির্দিষ্ট গতিবেগই থাকতে পারবে।

যাযাবর হাঁসের ভ্রমণ-পথ অনেক হতে পারত, তবু তারা একটি পথ ধরেই তাদের বাৎসরিক পরিক্রমা করবে এও তো জানা তথ্য।

বোর আরও বললেন, ইলেকট্রন যখন শক্তির উচ্চমার্গ থেকে শক্তির নিম্নমার্গে যাবে তখন শুরু হবে বিকিরণ আর এর উল্টোটা ঘটলে, অর্থাৎ ইলেকট্রন নিম্নমার্গ থেকে উচ্চমার্গে গেলে তা শোষিত হবে। জলের ক্ষীণ ধারা নদীতে পড়ে হারিয়ে যায়, বাঁধ ভাঙা নদী উদ্দাম হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

এই যে শক্তির হারিয়ে যাওয়া বা শোষিত হওয়া এবং শক্তি নির্গত হওয়া এ দুটিরই

বিকিরণের স্পন্দন সংখ্যা বা frequency প্লাঙ্ক কোয়াণ্টাম-সূত্র অনুসারে হবে। ভিড় ভাঙা দল যেমন তাদের নির্দিষ্ট পথেই গন্তব্য স্থানে যাবে, জোট ভাঙা বিকিরণও নির্দিষ্ট স্পন্দন সংখ্যা পাবে। এই বিচ্ছিন্নতার জন্য গ্যাসের পরমাণু থেকে যে বিকিরণ বের হয়, বর্ণালির বিশ্লেষণে তাদের উজ্জ্বল রেখারূপেই দেখা যায়। আবার গ্যাসের ভিতর দিয়ে কোনো বিকিরণ গেলে তার কোনো কোনো রশ্মি শোষিত হবে। বর্ণালিতে এরা দেখাবে কালো। যেখানে উজ্জ্বল রেখা পাবার কথা, এখন সেখানেই দেখা দেবে কালো রেখা।

রাস্তায় জল জমলে সিনেমা হলে টিকিট কেটে লোক আসতে পারবে না। হাউস ফুল নোটিস ঝুললেও, মাঝে মাঝে চেয়ার ফাঁকা থাকবে। বড় বাধা কাটিয়ে দর্শক আসতে পারে নি। বড় বাধা কাটিয়ে আসতে পারে না বিকিরণের রশ্মি।

কেলাস বা crystal-এর আপেক্ষিক তাপের একটা বৈশিষ্ট্য আছে—সনাতন বিজ্ঞান তার প্রমাণ দিতে পারে নি। এরও একটা তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা প্লাঙ্কের মতবাদকে ভিত্তি করে আইনস্টাইন দেন 1911 সালে। এরপর কেলাসের কোয়াণ্টামবাদ গড়ে ওঠে বিজ্ঞানী ডেবাই এবং মেক্সবোর্নের চেষ্টায়।

ধীরে ধীরে কোয়াণ্টামবাদ একটা সমগ্ররূপ পেতে শুরু করে। অণু-জগতের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে এর প্রয়োগ নিশ্চিন্ত হতে থাকে। অথচ আমাদের দৃশ্যমান জগতে এই পরিবর্তন নিরবিচ্ছিন্ন। আপাতত একটা অসঙ্গতি থাকছে।

বিজ্ঞানীরা বললেন, অসঙ্গতি নেই, যা বৈসাদৃশ্য তা ব্যষ্টি থেকে সমষ্টির বোধের ধারণার জন্যই। অণুজগতে যা বিভিন্নভাবে বদলাচ্ছে, তাদের গড় নিরবচ্ছিন্নতা—দৃশ্যমান জগতে তাই আমরা নিরবচ্ছিন্ন শক্তি পাই।

যেন একটা মিটিং ভাঙা জন-সমুদ্র। এর ভঙ্গিতে একটা মত্ততা আছে, আছে উত্তালতা ; সর্বত্র এর গতি অথচ প্রত্যেকের একটা নির্দিষ্ট গতিপথ আছে, নির্দিষ্ট গন্তব্য আছে। বিভিন্ন দলের বিভিন্ন ভঙ্গিগুলিই তৈরি করবে নিরবচ্ছিন্ন মিটিং ভাঙা জনতার গতির পালা।

কোয়াণ্টাম-তত্ত্বে আলোর কণারূপ স্বীকার পেল ; অথচ আলোর তরঙ্গ পরিত্যক্ত হলো না। ডাক্তার জেকিল আর মিস্টার হাইডের মতই আলোর দ্বৈতরূপ। এ ধারণা সনাতন বিজ্ঞানের পরিপন্থী। অথচ এই দ্বৈত প্রকৃতির ধারণার উপরই গড়ে উঠেছে কোয়াণ্টাম-গতিবিজ্ঞান।

বহুজনের সমাহারে জনতা ; বহু কণার সমবায়ে পদার্থ। ইলেকট্রন ইত্যাদি পদার্থ-কণারও দ্বৈতরূপ পরে প্রমাণ হলো। এরা কণা, এরা আবার তরঙ্গও।

প্লাঙ্ক তাঁর কোয়াণ্টাম সূত্র তাঁর নিজের মতোই প্রমাণ করেছিলেন। সূত্রটি যদি নিত্য হয় নানাভাবে একই সত্যে পৌঁছনো যাবে। বিজ্ঞানীরা বিচিত্র পথে প্লাকের সূত্রটি প্রমাণ করেছিলেন। তবুও সত্যেন্দ্রনাথ বোসের আগে সনাতন বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ নাকচ করে কেবল কোয়াণ্টাম তত্ত্বকে ভিত্তি করে সাংখ্যায়নিক যুক্তি দিয়ে প্লাঙ্ক-সূত্র প্রমাণের চেষ্টা আর কেউ করেন নি।

প্লাঙ্ক-সূত্র প্রমাণে বোস ফোটন সমবায়ের ধর্ম প্রকৃতি, ইত্যাদি আলোচনা করলেন। ফোটনের জন্য সংখ্যাতত্ত্ব বিশ্লেষণ করে যে সংখ্যায়ন তিনি পান, তাতেই প্লাঙ্ক-সূত্র দেখানো গেল। এটা 1924 সালের কথা। বোসের প্রণালী এবং ঠিক তার আগে বিজ্ঞানীদের প্লাঙ্ক-সূত্র প্রমাণের প্রণালীর মৌলিক প্রভেদটা হলো, বোসের আগে সব আলোচনা হয়েছে কণা সংখ্যায়নের বা Praticle statistics পদ্ধতিতে। বোসের পদ্ধতি অবস্থার সংখ্যায়নের (state statistics) ভিত্তিতে।

এনট্রপির আলোচনায় বোল্টৎস্‌মান এবং গিবস গতিবিজ্ঞানের তথ্য না ধরে, কেবল শক্তির বিভিন্ন অবস্থায় অণুদের বণ্টনের ধারণা কল্পনা করে সাংখ্যায়নিক গতিবিজ্ঞানের অনেক সিদ্ধান্তে পৌঁছান। বোসও প্রায় একই পদ্ধতিতে ফোটনের গতির ধারণা, পথের ধারণা প্রভৃতি হিসেব না ধরে, শুধু ফোটনের বিভিন্ন শক্তির স্তর নিয়ে আলোচনা করলেন। তিনি সমান আকারে বা সমান ধর্মের কণাগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে ধরলেন না। শুধু শক্তি স্তরের হিসাব দিলেন।

ফুটবল খেলায় সব খেলোয়াড়ের সম্ভাব্য সব অবস্থার কথা চিন্তা করা হয় না ; শুধু কোন্ ছকে সম্ভব-অবস্থার পূর্ণ হবার সম্ভাবনা কতটুকু তাই ভাবা হয়। সেভাবেই সাজানো হয় আক্রমণ বা রক্ষণভাগের শক্তি। বোসও শক্তির সম্ভাব্য অবস্থার সামান্য কয়েকটি সম্ভাবনা ধরে প্লাঙ্ক-সূত্রটির সমাধান করলেন। বোসের সূত্র যথাসম্ভব কম সম্ভাবনা ধরলেও, তার এই পদ্ধতি বিরাট সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিল।

বোসের পদ্ধতি ব্যবহার করে আইনস্টাইন গ্যাসের কোয়াণ্টামবাদ প্রচার করলেন। ফের্মি ইলেকট্রনের মত কণা সমবায়ের প্রকৃতি ও ধর্ম আলোচনা করলেন।

বোস এবং বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়নে শক্তির কোনো কোনো বিশেষ অবস্থায় একাধিক কণা থাকার সম্ভাবনা ধরা হয়। কিন্তু 1925 সালে পাউলি (Pauli) কোয়াণ্টাম-বাদের ধারণায় যে সূত্র দিলেন তাতে শক্তির একটি কোয়াণ্টাম অবস্থায় সবচেয়ে বেশী একটি কণা থাকতে পারে আবার তা শূন্য হতে পারে।

শক্তি পুরাণে মহাদেবী বললেন, দশমহাবিদ্যা সেও শক্তির প্রকাশ, আবার তাঁদের শেষ তাঁরই মধ্যেই। শক্তির সেই পূর্ণ অবস্থায় শুধু মহাদেবীই থাকবেন। আবার তিনি অদৃশ্যও হতে পারেন। শক্তির কোনো কোনো অবস্থায় একটি কণা থাকবে অথবা থাকবে না।

এই ধারণাকে ভিত্তি করে বোসের পদ্ধতি অনুসরণ করে ফের্মি একটি নতুন সংখ্যায়ন পান। ডিরাক আবার অন্যভাবে ঐ একই সংখ্যায়ন পান। এই সংখ্যায়নকে ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন বা ফের্মি সংখ্যায়ন বলে।

ইটালীয় বিজ্ঞানী জেন্টাইল 1940 সালে একটি নতুন সংখ্যায়ন প্রচার করলেন। তিনি সনাতন সংখ্যায়ন, বোস সংখ্যায়ন এবং ফের্মি সংখ্যায়ন এই তিনটি সংখ্যায়নকেই একটি সূত্রে ব্যাখ্যা করেন। সূত্রে মণিগণাইব। একের মধ্যেই আছে তিন। আবার তিন মিলিয়ে এক।

পরমাণু গঠনের মডেল সৌরজগৎকে ভাবা হয়েছিল। কেন্দ্রে আছে নিউক্লিয়াস,

চারদিকে ঘুরছে ইলেকট্রন। এই ইলেকট্রনের কক্ষপথের গতির গাণিতিক সমাধান সহজে করা গেল না। দেখা গেল একটা অতিরিক্ত কৌণিক ভরবেগ বা angular momentum হিসাবে আসছে। সৌরজগতের মডেলের ধারণা করেই বিজ্ঞানীরা ভাবলেন যে পৃথিবীর যেমন আহ্নিক গতি আছে, হয়তো ইলেকট্রনেরও আছে তেমনি একটা ঘূর্ণি। এই ঘূর্ণি থাকলে অতিরিক্ত কৌণিক ভরবেগের হিসাবটাও পাওয়া যায়। ইলেকট্রন ইত্যাদির কোনো আয়তন নেই। অথচ ঘূর্ণি থাকবে এ ধারণাটা খানিকটা অসম্ভব। যা হোক 1928 সালে ডিরাক আপেক্ষিকতাবাদ অনুসারে কোয়ান্টাম গতিবিজ্ঞানের একটা রূপ দিলেন; সেই সমীকরণ থেকেই যে সব তথ্য পাওয়া গেল তাতে ঘূর্ণির অস্তিত্ব, প্রকৃতি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় জানা গেল। ঘূর্ণি তাহলে আছে। এই ঘূর্ণির নাম দেওয়া গেল স্পিন (spin)। যা ছিল কল্পনায় তা বাস্তবে রূপায়িত হয়ে উঠল। কণার মূলধর্ম হিসাবে স্পিন এখন একটি স্বীকৃত সত্য। স্পিনের দিক থেকে কণাদের দুইভাগে ভাগ করা হয়। যাদের স্পিনের সংখ্যা পূর্ণাঙ্ক, যেমন শূন্য বা পূর্ণ সংখ্যা তারা বোসের সংখ্যায়ন মেনে চলে। এদের বলা হয় বোসন। আর যাদের স্পিন ভগ্নাঙ্ক বা $\pm\frac{1}{2}$, $\pm\frac{3}{2}$ ইত্যাদি তারা ফের্মি সংখ্যায়ন মানে—এদের বলি ফের্মিয়ন। বোসনের উদাহরণ প্রোটন প্রভৃতি ভারি কণাগুলি। ফের্মিয়নের উদাহরণ ইলেকট্রন, মেসন ইত্যাদি হালকা কণা।

1900 সালে প্লাঙ্ক প্রচার করলেন তার কোয়াণ্টাম-মতবাদ। আইনস্টাইন এই তত্ত্বকে শাণিত করেন। শ্রোয়েডিঙ্গার, হাইসেনবার্গ, বোর, লুই, দ্য ব্রলি, পাউলি, বোস, ফের্মি, ডেবাই, উলেনবেক, গাউডস্মিথ ইত্যাদি বিজ্ঞানীরা এই খড়্গ ব্যবহার করে অজানার আঁধার-মহিষকে দু'খানা করে কেটেছেন। রুদ্রের দারুণ দীপ্তি চোখে এসে পড়েছে। এটমকে বিজ্ঞান জেনেছে; তার অন্দরমহলে প্রবেশাধিকার হলো।

উনিশ শতকের প্রথমেই অন্দরমহলে ঢোকার অনুমতি মিলে গেল। তিন জনার সীল-মোহর করা অনুমতি-পত্র—তেজস্ক্রিয়তা, কোয়াণ্টাম-বাদ আর আপেক্ষিক তত্ত্ব। দুজনাকে জানা হয়েছে, এবার তৃতীয় মোহর বাকি!

গুচ্ছ গুচ্ছ কণাগুলো ঝোঁটন বেঁধেছে
সংখ্যাতত্ত্বে তাদের বোস ঝাড়তে লেগেছে।
বড় বড় কণাগুলি কোমর বেঁধেছে।
বোসন-ফের্মিয়ন দুই পাড়েতে ভেসে উঠেছে।
কে দেখেছে? কে দেখেছে? ডিরাক দেখেছে।
আঁকের মিশ্রণ ডিরাকের ঢিল ছুড়ে মেরেছে—
কণা ঘুরতে লেগেছে।

কণা ঘুরছে, কী তার গতি, শক্তিই বা কী? তৃতীয় সীল-মোহরের দপ্তর তাই জানাবে।

1905 সালে আধুনিক বিজ্ঞানের পাদপ্রদীপে নাটকের মূল অভিনেতার আবির্ভাব হলো। সুইজারল্যাণ্ডের বের্ন সহরের পেটেণ্ট অফিসের পরীক্ষক ছাব্বিশ বছরের এলবার্ট আইনস্টাইন রঙ্গমঞ্চে তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্ব নিয়ে প্রবেশ করলেন। যে তত্ত্বের জন্য বিজ্ঞান ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিল, বিশ শতকের প্রথম দশকেই তা পাওয়া গেল।

এলবার্ট আইনস্টাইন একটি নাম ; এলবার্ট আইনস্টাইন একটি যুগ। আধুনিক বিজ্ঞানের দুই হাতিয়ার—আপেক্ষিক তত্ত্ব ও কোয়াণ্টাম গতিবাদ, দুটিতেই তাঁর সহজ কুশলতা। একটির তিনি আবিষ্কর্তা, আরেকটি তিনি শাণিত করেছেন। আপেক্ষিক তত্ত্বের দুটি ভাগ আছে ; একটি বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব যার আবির্ভাব 1905 সালে, দ্বিতীয়টি সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব যা প্রকাশিত হলো 1916 সালে। বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বে আইনস্টাইন আলোচনা করেন বিভিন্ন পদার্থ এবং প্রণালীর—এরা একটি অপরটির সাপেক্ষে হয় অপরিবর্তনীয় গতিবেগে চলছে, নয় কোনোমতেই চলছে না। সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বে পদার্থ বা অবস্থার গতির আপেক্ষিক ত্বরণ নিয়ে আলোচনা করা হলো। ঠিকভাবে দেখতে গেলে বিশেষ তত্ত্ব সাধারণ তত্ত্বেরই একটা অংশ। গতিবেগ অপরিবর্তনীয় মানেই তো ত্বরণ বা acceleration নেই।

আইনস্টাইন তাঁর বিশেষ তত্ত্বে দুটি সিদ্ধান্ত রাখলেন। এদুটিকে শুধু সিদ্ধান্ত না বলে বলা ভাল স্বতঃসিদ্ধতা। জ্যামিতি যেমন গড়ে উঠেছে কতগুলো axiom বা স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্তের উপর, আইনস্টাইনের মতে মহাবিশ্বের নিয়মও এই দুটি মৌলিক স্বতঃসিদ্ধতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

তাঁর প্রথম সিদ্ধান্ত হলো—ইথারের অস্তিত্ব পাওয়া যাবে না।

গত শতাব্দীর সমস্যা ইথারের অস্তিত্ব নিয়ে গড়ে উঠেছিল, আইনস্টাইনের এই সিদ্ধান্ত তার মূলেই আঘাত করল। আইনস্টাইনের যুক্তিটা একটু বোঝা যাক।

আইনস্টাইন বললেন, আমাদের গতি বা বেগের বোধ ঘটে, কারণ গতির সঙ্গে পটভূমির পরিবর্তন দেখি। অন্ধকার রাত্রেও আমাদের বেগের ধারণা থাকে কারণ আকাশের তারার পরিবর্তন নজরে আসে। কিন্তু পাশাপাশি দুটি ট্রেন যখন একসঙ্গে চলে, তখন আমাদের গতির ধারণাটা একটু অন্য রকম হয়। ট্রেন দুটি যদি একই গতিবেগে চলে, এবং ট্রেনের যদি কোনো ঝাঁকুনি ইত্যাদি না থাকে, তবে এক ট্রেন থেকে আরেক ট্রেনের দিকে তাকিয়ে থাকলে আমরা কোনো গতিই বুঝতে পারব না। যদি ধরা যায় প্রথম

ট্রেনটির গতি দ্বিতীয় ট্রেনটির থেকে বেশী, তবে প্রথম ট্রেনের দর্শকের কাছে মনে হবে যেন দ্বিতীয় ট্রেনটি পিছনে হটছে। আবার দ্বিতীয় ট্রেনটির দর্শকের কাছে মনে হবে, প্রথম ট্রেনটি যেন এগিয়ে চলেছে। গতির এই বোধ আপেক্ষিক।

মহাবিশ্বে পটভূমি নেই। তাই মহাকাশযানের গতির বা বেগের কোনো বোধ থাকবে না ; মহাবিশ্বে মহাকাশযানের গতি বা বেগ তখনই বোঝা যাবে যদি অন্য কোনো গ্রহ নক্ষত্র নীহারিকা বা অন্য যে কোনো কিছুর সঙ্গে একটা তুলনা করতে পারা যায়। মহাবিশ্বে অন্য যে কোনো বস্তুর কাছাকাছি এলে সেই বস্তুর সাপেক্ষেই ঐ যানের গতি বোঝা যাবে। আবার মহাবিশ্বে কোনো কিছু নিশ্চল নয়। সমস্ত মহাবিশ্ব যেন গতিতে ভরা! সুতরাং মহাকাশের সব কিছুরই গতি একটি আরেকটির সাপেক্ষেই ধরা যাবে। অতএব সব গতিই আপেক্ষিক।

ইথারের কল্পনায় আমরা ইথারকে সম্পূর্ণ নিশ্চল বলে ধরে নিয়েছি। কাজেই স্থির ইথারেই একমাত্র পরমাগতি বা absolute motion থাকবে ; কারণ ব্রহ্মাণ্ডে ইথারই একমাত্র নিশ্চল। অথচ আমরা শুধু আপেক্ষক গতিই মাপতে পারব। অতএব পরমাগতি যখন আমরা মাপতে পারব না তখন ইথারের অস্তিত্ব কোনো মতেই প্রমাণ করা যাবে না।

জাহাজের ভিতরে বসে কোনো পরীক্ষাতেই জাহাজের গতি বোঝা যাবে না—নিউটনের একথা যেমন সত্য, তেমনই সত্য, রূপকথার সেই গল্পের, তিমির পেটে দুই বুড়োর নিশ্চিন্তে দাবা খেলা ; তিমিটি সপ্তসিন্ধু ঘুরে বেড়ালেও গতির কোন আভাস বুড়োরা পাবে না।

ইথারের অভ্যন্তরে পৃথিবীর উপরে বসে আমরা পৃথিবীর কোনো গতির আভাস পাব না।

আইনস্টাইন ইথারের অস্তিত্ব নাকচ করেন নি, শুধু বলেছেন ইথারকে প্রমাণ করা যাবে না। আইনস্টাইনের তত্ত্বে অবশ্য ইথারের কোনো প্রয়োজন নেই। ইথারের প্রয়োগ ছাড়াই তিনি তাঁর তত্ত্বের সব সমস্যারই সমাধান করলেন। সুতরাং ইথার থাক বা না থাক, বিজ্ঞানের কাছে এটা কোনোও সমস্যা থাকল না। অহেতুক ইথার নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভটা তবে কী? সাংখ্যকার কপিলের মতো আইনস্টাইন শুধু বলেন নি, ইথার অসিদ্ধ প্রমাণাভাবাৎ।

আনইস্টাইনের দ্বিতীয় মৌলিক উপপত্তি—যে কোনোও দর্শকের কাছে আলোর গতিবেগ অপরিবর্তনীয়। মাইকেলসন মর্লের পরীক্ষার আলোচনার কালে উৎসের সাপেক্ষে আলোর গতিবেগের অপরিবর্তনীয় থাকার প্রকল্প নিয়ে যে একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল, দেখেছি। আইনস্টাইন ঐ সিদ্ধান্তের কিছু পরিবর্তন করলেন। আলোর গতি উৎসের কাছে নয়, দর্শকের কাছে এক। কোনো তারা কোনো দর্শকের কাছে সেকেণ্ডে 185999 মাইল বা সেকেণ্ডে 1 মাইল গতিতে কাছে আসুক বা দূরে চলে যাক, আলোর গতি দর্শকের কাছে সব সময় একই মনে হবে। সেকেণ্ডে 186000 মাইল বা সেকেণ্ডে 300000 কিলোমিটার।

আইনস্টাইনের এই সিদ্ধান্ত অভিনব। কিন্তু পরে দেখা গেছে, এই সিদ্ধান্তটির প্রয়োগে মহাবিশ্বের বা এটমের গঠনের বহু সমস্যার সমাধান পাওয়া যাচ্ছে। এই সিদ্ধান্ত সত্যই বৈপ্লবিক।

ইথার সম্বন্ধে আইস্টাইনের ভূমিকা অজ্ঞেয়বাদীর। ইথারের অস্তিত্ব ধরা যাবে না। স্বভাবতই আইনস্টাইন বললেন, আলোর বেগ নিয়ে কথা বলাও বৃথা। বেগ ধরা পড়বে শুধু সেই দর্শকের কাছে, যে আলোর গতি মাপতে চাইবে। আরো ধরা হলো, কোনো দর্শকই বিশিষ্ট নয়, শ্রেষ্ঠও নয়। আলোর বেগ সব দর্শকের কাছে একই হবে ; space বা দেশের মধ্যে অথবা ইথারের মধ্যে, পৃথিবীর গতির উপর আলোর গতি নির্ভর করবে না। আলোর গতিবেগ নিত্য এবং ধ্রুব—এটা একটা প্রাকৃতিক নিয়ম।

আইনস্টাইন তাঁর অনুসিদ্ধান্তে physical space বা প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক দেশ এবং ইথার প্রায় সমার্থক এই ইঙ্গিত করলেন। আইনস্টাইন তাঁর স্বতঃসিদ্ধান্ততার পর তাঁর তত্ত্বের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করলেন। তাঁর সিদ্ধান্তগুলি যেমন অসম্ভব, তেমনি অসম্ভব প্রমাণিত সত্যগুলি। আইনস্টাইনের সিদ্ধান্তগুলি এবার দেখা যাক।

(ক) দৈর্ঘ্যের সঙ্কোচন

মাইকেলসন-মর্‌লের পরীক্ষার সময় আমরা দেখেছি গতির দিকে সব বস্তুর সঙ্কোচন হয়, এই ধারণা গ্রহণ করলে মাইকেলসন-মর্‌লের পরীক্ষায় পাওয়া ফলগুলির একটা কারণ পাওয়া যেতে পারে। লরেন্স এই ফিটজিরাল্ডের সঙ্কোচন তত্ত্বের একটা যুক্তি সঙ্গত ব্যাখ্যা সনাতন বিজ্ঞানের কাঠামোয় দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর ব্যাখ্যা খানিকটা কষ্টকল্পিত আর ইথারের ধর্মের উপর ভিত্তি করে। আইনস্টাইন ইথারকে তাঁর কোনো সিদ্ধান্তেই আনতে চান নি। যে ইথার সনাতন বিজ্ঞানের রাজত্বে দোর্দণ্ড প্রতাপ বড়বাবু, আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বে সে তখন অবাঞ্ছিত, বেকার।

আইনস্টাইন বললেন, কোনো বস্তুর অপেক্ষিক গতি যদি হয় v, তার গতিহীন আকারের দৈর্ঘ্য হয় L, তা হলে সে যখন গতিতে চলবে, তার দৈর্ঘ্য সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়াবে L' এ। এবং $L' = L\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$; c হচ্ছে আলোর গতি।

এখানে আইনস্টাইন, আলোর গতি যা দর্শকের কাছে সব সময়ে এক, তাকেই ব্যবহার করলেন সঙ্কোচন মাপতে।

আইনস্টাইনের সঙ্কোচন তত্ত্ব একটা ধ্রুব সত্য। তাঁর তত্ত্বের অনুসিদ্ধান্তে আমরা বলতে পারি প্রাকৃতিক দেশের সঙ্কোচন আছে। সমান গতিতে যে সব বস্তু চলছে, তাদেরও সঙ্কোচন হবে, কারণ সঙ্কুচিত দেশেই তারা আছে।

দূরবীন দিয়ে আমরা দূরের জিনিস কাছে দেখি, দূরবীন উল্টো করে দেখলে আমরা সব কিছুই ছোট দেখব। কারণ প্রতিবিম্ব অবস্থাতেই দেখা হচ্ছে। সঙ্কুচিত দেশ সেই অবস্থা, আর গতিবান বস্তু যেন প্রতিবিম্ব।

যা হোক, এই সঙ্কোচন সাধারণ গতিতে ঠিক ধরা যায় না। পার্থিব জগতে জেট

প্লেন প্রায় ঘণ্টায় 2000 কিলোমিটার বেগে চলে। এই হিসাবে প্লেনটির সঙ্কোচন যা হবে তা একটি নিউক্লিয়াসের আয়তনের থেকেও ছোট। 80 কিলোমিটার বা 50 মাইল বেগে যে গাড়ী চলবে তার সঙ্কোচন কী হবে তা নিউক্লিয়াসের আয়তন দিয়েও বোঝান যাবে না।

অথচ বস্তুর গতি যদি আলোর গতির শতকরা 50, 90 বা 99 ভাগ হয় তবে তার দৈর্ঘ্য দাঁড়াবে স্থির দৈর্ঘ্যের শতকরা 86, 45 বা 14 ভাগে। এবং যদি চলনশীল গতিটিতে থেকে কোনো মানুষ তার মাপের ফিতে দিয়ে সেই বস্তুটিকে মাপে তাহলে কোনো প্রভেদ দেখবে না, কারণ বস্তুর সঙ্গে মাপের ফিতেও সঙ্কুচিত হবে।

প্রত্যেক মানুষ তার নিজের হাতের মাপে দৈর্ঘ্য সাড়ে তিন হাত, মানুষের চেহারা যেমনই হোক। স্থির অবস্থায় বা সঙ্কুচিত অবস্থায় মাপলে একই দৈর্ঘ্য পাওয়া যাবে। কারণ, মাপকাঠি চলনশীল বস্তুর একটা অংশ, তারও একই সঙ্কোচন হবে।

(খ) কোনো বস্তুর ভর তার বেগের সঙ্গে বাড়বে

আগের যুক্তি ধরে আইনস্টাইন জানালেন যে কোনো বস্তুর ভর যদি স্থির অবস্থায় হয় m, আপেক্ষিক গতি যদি v হয় তাহলে সেই চলনশীল বস্তুর ভর হবে m' এবং

$$m' = \frac{m}{\sqrt{1-\frac{\quad}{c^2}}}$$ যেখানে c হচ্ছে আলোর গতিবেগ।

আইনস্টাইনের এই ধারণা আবার আমাদের সাধারণ ধারণার বিরোধী। আমরা জানি মোটা লোক ছুটলে রোগা হবে। অথচ এই তত্ত্বে আমরা দেখছি যে ছুটলে তার ওজন বাড়বে। যত জোরে ছুটবে তত ওজন বাড়বে এবং প্রথম সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দৈর্ঘ্যও কমবে। সুতরাং আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুসারে কিছু না করে বসে থাকলে ওজনও বাড়ে না, দৈর্ঘ্যও কমে না।

(গ) আইনস্টাইনের তৃতীয় সিদ্ধান্ত : গতিবেগের যোগফল আলোর গতির পরিপ্রেক্ষিতে হবে

ধরা যাক একটা গাড়ি 100 কিলোমিটার বেগে চলছে, আর একটা গাড়ি উল্টো দিক থেকে 100 কিলোমিটার বেগে এসে প্রথম গাড়িটা পার হয়ে গেল। এখন এই দুই গাড়ির আরোহীর কাছে উল্টোদিকের গাড়ির গতিবেগ দাঁড়াবে 200 কিলোমিটার অর্থাৎ আপেক্ষিক গতিবেগ = প্রথম গাড়ীর গতিবেগ + দ্বিতীয় গাড়ির গতিবেগ।

এখন এই গতি যদি খুব বেশী হয়, ধরা যাক আলোর গতির সমান বা কাছাকাছি, তাহলে এই যুক্ত গতিবেগ, সনাতন বিজ্ঞানের ধারণা অনুযায়ী দুই গতির যোগফলই হবে এবং তখন আমরা আপেক্ষিকভাবে আলোর গতির বেশী গতি পেতে পারি।

এ সিদ্ধান্ত আপেক্ষিকতাবাদের মূল স্বতঃসিদ্ধতার বিপরীত। দর্শকের কাছে আলোর গতি সব সময়েই এক হবে।

আইনস্টাইন বললেন, গতির এই যোগফল, আলোর গতির সাপেক্ষেই হবে।

যদি V_a একটি গতি হয় V আরেকটি গতি তবে V_{ab} অর্থাৎ যুক্ত আপেক্ষিক গতি দাঁড়াবে আলোর গতি c-এর সাপেক্ষে।

$$V_{ab} = \frac{V_a + V_b}{1 + \frac{V_a V_b}{c^2}}$$

এ সমীকরণ অনুযায়ী যদি V_a বা V_b আলোর গতি নিয়ে চলে তবে—

$$V_{ab} = \frac{c + c}{1 + \frac{c^2}{c^2}} = \frac{2c}{2} = c$$

অর্থাৎ যোগফল সেই আলোর গতিই হবে।

আগের উদাহরণ মত যদি সেই 100 কিলোমিটার বেগের গাড়ি দুটির আপেক্ষিক যুক্ত বেগটি এই সমীকরণ দিয়ে লিখি তাহলে দেখব আপেক্ষিক যুক্ত গতি 200 কিলোমিটার থেকে এক সেণ্টিমিটারের লক্ষভাগের চেয়েও কম। কাজেই সাধারণ গতিতে আমরা ভাজক রাশিটিকে তুচ্ছ করতে পারি ; তা হলে যে সমীকরণ পাব তার সঙ্গে সনাতন বিজ্ঞানের কোন অসঙ্গতি থাকছে না।

অর্থাৎ $V_{ab} = V_a + V$

(ঘ) আলোর গতিই সর্বোচ্চ গতি—কোনো বস্তুর গতি আলোর গতির চেয়ে বেশী হতে পারবে না

তৃতীয় সিদ্ধান্ত থেকে আমরা দেখেছি দুটি বস্তু আলোর গতি নিয়ে চললেও তাদের আপেক্ষিক যুক্ত গতি আলোর গতির সমানই হবে। এখন আলোর চেয়ে গতি কি বাড়তে পারে ? আইনস্টাইন বললেন, না।

প্রথম সিদ্ধান্তে আমরা সঙ্কোচন পেয়েছি, যা আলোর গতির উপর নির্ভর করবে। দেখেছি বস্তুর গতি যদি আলোর গতির শতকরা 99 ভাগ হয়, তবে বস্তুর আয়তন কমে দাঁড়ায় শতকরা 14 ভাগে। এখন বস্তুর গতি যদি আলোর গতির সমান হয়, তাহলে, বস্তুর দৈর্ঘ্য কমতে কমতে শূন্যে ঠেকবে। বস্তুই থাকবে না।

এখন যদি ধরা হয় বস্তুর গতি আলোর গতির চেয়ে বেশী তা হলে আমরা একটা নেগেটিভ সংখ্যা পাচ্ছি। যদি ধরি বস্তুর গতি আলোর গতির দ্বিগুণ বা $2c$ তাহলে সঙ্কোচন তত্ত্ব অনুযায়ী সমীকরণটি লিখলে পাব—

$$L' = L\sqrt{1 - \frac{4c^2}{c^2}} = L\sqrt{-3}$$

গাণিতিক নিয়ম অনুযায়ী এই নেগেটিভ সংখ্যার বর্গমূলকে বলা হয় কাল্পনিক বা imaginary ; বাস্তবে এ সম্ভব নয়।

আবার দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেখি যে বস্তুর বেগ আলোর গতির সমান হলেও

তার পরিবর্তিত ভর ঐ সমীকরণ অনুযায়ী হবে। অর্থাৎ ভগ্নাংশটির হরটি দাঁড়াচ্ছে শূন্য। যার অর্থ ভর হবে অসীম বা infinite।

এই তিনটি সিদ্ধান্ত থেকে একটি সিদ্ধান্তেই আসা যায় যে আলোর গতি সম্ভাব্য চরম গতি। আলোর চেয়ে কোন কিছুই দ্রুত যেতে পারবে না, কারণ সেখানে বস্তুর ভর হবে অসীম। অসীম ভর আনতে হলে লাগে অসীম শক্তি অর্থাৎ মহাবিশ্বের সব শক্তি এবং তার উপর আরো অনেকখানি। কাজেই মহাবিশ্বের কোনো বস্তুই আলোর চেয়ে বেশী গতি পেতে পারবে না।

অথচ কল্পনায়, কাব্যে আমরা মনে করি আলোর গতি থেকে বেগে যেতে পারলে time machine বা কালচক্র উল্টো দিকে ঘোরানো যাবে। আমরা অতীতে ফিরে যেতে পারব।

একজন অজ্ঞাত কবি আনন্দে জানালেন—

There was once a Lady called Bright
Who could travel faster than light
She went out one day
In a relative way
And came back the previous night.

দৌড়বাজ মেয়ে এক পুঁটে।
আলোর চেয়ে যান জোরে ছুটে।
একদিন বাহিরিয়ে—
আপেক্ষিক গতি নিয়ে—
আগের রাতে পারেন তো পৌঁছুতে।

(ঙ) পঞ্চম সিদ্ধান্তে আইনস্টাইন ভর এবং শক্তির সাম্য ভাব প্রকাশ করলেন

আগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেখলাম গতির সাপেক্ষে বস্তুর ভর বাড়বে। এখন এই ভারী বস্তুটিকে চালাতে গেলে বেশী শক্তির দরকার হবে। এই যুক্তি অনুসারে দেখা যাবে, গতি যদি এক থাকে তবে হালকা বস্তু গতি অনুসারে যে বেশী ভর নিয়ে ভারী হবে, তাকে হালকা বস্তুর সমান গতিতে চালাতে গেলে লাগবে অতিরিক্ত শক্তি। গাণিতিক পদ্ধতিতে এটি লেখা হবে, অতিরিক্ত শক্তি ভরের প্রভেদ এবং আলোর গতির বর্গফলের সমান।

অতিরিক্ত ভরের সঙ্গে আমরা পাচ্ছি অতিরিক্ত শক্তি। সুতরাং এরই অনুসিদ্ধান্তে আমরা বলতে পারি সব ভর এবং সব শক্তির একটা সমানত্ব থাকবে। আইনস্টাইন সমীকরণে এ তত্ত্বটি লিখলেন ঃ—$E = mc^2$। এখানে E হচ্ছে তুলনীয় শক্তি ; m হলো ভর এবং c আলোর গতি।

আইনস্টাইনের এই তত্ত্ব সম্পূর্ণ প্রমাণ হলো এটম বম্ব বিস্ফোরণের সময় 1945 সালে,

স্থান নিউ মেক্সিকোর আলামোগোর্ডো মরুভূমি। এই তত্ত্বেই আমরা জানলাম সামান্য এক চামচ কয়লা থেকে আমরা যে শক্তি পেতে পারি তা গোটা ভারতবর্ষের সব কটি পাওয়ার স্টেশনের একদিনের উৎপাদক বিদ্যুৎ শক্তির চেয়েও বেশী।

এতদিন আমরা শক্তির রূপান্তরে শক্তি পেয়েছি। কয়লার তাপে জল বাষ্প করে পেরেছি জেনারেটার চালাতে ; শক্তির এই রূপান্তর অসীম। তাকে আমরা মাপতে পারি, বুঝতে পারি, ধরতে পারি। যে অসীম শক্তি পাবার সম্ভাবনা আইনস্টাইন আমাদের জানালেন, তা অভাবনীয় ; এ রাসায়নিক পরিবর্তিত শক্তি নয়, একে বলা হলো, নিউক্লিয়ার শক্তি।

(চ) আইনস্টাইনের ষষ্ঠ সিদ্ধান্ত যেমন চমকপ্রদ তেমনই নতুন—তিনি সময়েরও পরিবর্তনের কথা বললেন

আগের সিদ্ধান্তে তিনি দেশের বা space-এর পরিবর্তনের কথা জানিয়েছিলেন। এবার জানালেন, আপেক্ষিক গতির জগতে সব কিছুই আপেক্ষিক। গতির উপর নির্ভর করে যেমন আয়তন এবং ভর আপেক্ষিকভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, সময়েরও পরিবর্তন হবে একই রীতিতে। আইনস্টাইন বললেন ঃ

$$t' = t\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$$

এখানে t' আপেক্ষিক সময়, t স্থির সময়, v বস্তুর গতিবেগ আর c আলোর গতি। কোনো কাজ যদি সাধারণভাবে সময় নেয় t তাহলে দ্রুত গতিতে যখন একাজ হবে তখন সময় আপেক্ষিকভাবে কমবে—এ সত্য সনাতন বিজ্ঞানের। এখানে সময় মানে কাজটি করতে যে সময় লাগবে।

আইনস্টাইনের সময় এবং কাজের সময় এক নয়। চলনশীল দুটি বস্তুর দর্শকদের কাছে তুলনামূলকভাবে সময় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বোধ হবে। গতি অনুযায়ী সময় কম মনে হবে।

সময়-বোধ যে আপেক্ষিক, তা মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে বোঝানো যাবে। অপছন্দসই লোকের সঙ্গে কথা বলার সময় মুহূর্তকে মনে হয় ঘণ্টা। হাসপাতালে অপেক্ষমান ভাবী পিতার কাছে প্রতি সেকেণ্ড দীর্ঘ মনে হবে! আবার পছন্দসই আড্ডা বা জমাট জলসার দীর্ঘ সময় দ্রুত কেটে যায়। সময়ের এই কম-বেশি বোধ, এটা মনের কাছে। আইনস্টাইন জানালেন, গতির মাপে সময় কমবে, এটা মানসিক নয়, তথ্যগত সত্য।

কোনো ঘটনা বোঝাতে আমরা জানাই দেশ-কাল-পাত্রের কথা। কোনো ঘটনা যা পৃথিবীতে ঘটবে, তার সময় নিত্য এবং ধ্রুব। পরিবর্তন চোখে পড়বে না ; অথচ মহাবিশ্বে সময় বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন। দূরের তারার কোনো ঘটনা, আমরা হয়তো জানব 300 আলোক বর্ষ পরে, অন্য কোনো তারার কাছে সে খবর যাবে 200 আলোক বর্ষ পরে। আমাদের পৃথিবী এবং দ্বিতীয় তারার দূরত্ব কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মে 100 আলোকবর্ষ হবে না, হবে ভিন্ন। কারণ দূরের তারা, পৃথিবী এবং দ্বিতীয় তারা একটা

ত্রিভুজ তৈরী করতে পারে। কাজেই দূরত্ব নির্ভর করবে ত্রিভুজের গঠন এবং কোণের উপর। আলো দিয়ে আমরা এখানে দূরত্ব মাপছি। মাপ ছিল জ্যামিতিক এবং দেশকেই মাপা হতো। মহাবিশ্বের ঘটনা গজ-ইঞ্চি-ফুট বা মিটার-সেন্টিমিটারের মাপ নয় ; এ মাপ কালের মাপ, আলো কতটা সময় নেবে, তাই হচ্ছে মাপের মাপকাঠি।

আলোর সাহায্য ছাড়া মহাবিশ্বের বিভিন্ন ঘটনা মাপতে বা বুঝতে পারব না ; কাজেই আমাদের ত্রিমাত্রিক দেশের বোধে যোগ হলো আরও একটা মাত্রা—সেটি সময়। ঘটনার উপস্থিতি হলো চতুর্মাত্রিক ছন্দে, দেশ এবং কালে ; দেশ দেবে তিনটি মাত্রা—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং বেধ। কাল দেবে চতুর্থ মাত্রা। আমরা পুরাণে দেখেছি রাজা রৈবত তার কন্যা রেবতীর বিয়ের সম্বন্ধের খোঁজে ব্রহ্মার পরামর্শের জন্য ব্রহ্মলোকে গেলেন। সেখানকার কয়েকটি পল-অনুপল সময় পৃথিবীর যুগ-যুগান্তরের সমান সময়।

দূরের কোনো তারা, যা আঠারো আলোকবর্ষ দূরে আছে সেখানে যদি কোনোদিন কোনো মহাকাশযান আরোহী নিয়ে যেতে পারে এবং যানটির গতি যদি আলোর গতির শতকরা 99·999999 ভাগ হয় তবে সেই আরোহীর ঘড়ি, হৃৎপিণ্ড সব কিছু অতি ধীরে চলবে। যাতায়াতের 36 বছর সময় তার কাছে মনে হবে কয়েক মুহূর্ত।

পুরাণের ব্রহ্মলোকে সময় ধীর। গতির লোকে সময় মন্দ।

আইনস্টাইন নব পুরাণের সূচনা করলেন।

পরমহংসদেব বলতেন, গুরু যাচাই করে নিবি। বিজ্ঞানও বলে তত্ত্ব যাচাই করে নেবে। তত্ত্ব, তা যতই চমক দিক, প্রমাণ না হলে সে তবে বাহুল্য। বিজ্ঞানে বাহুল্যের জায়গা নেই।

আইনস্টাইনের তত্ত্ব অচিন্তনীয়, অভাবনীয়। তত্ত্বের ফলে কিছু কিছু সমস্যা, যা সনাতন বিজ্ঞানের সাপেক্ষে বোঝা যায় নি, তার সমাধান হলো। এতেই তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণ হবে না। নতুন বিষয়ের প্রমাণ যদি এই তত্ত্বে সম্ভব, নতুন ঘটনা বা সম্ভাবনার পূর্বাভাস যদি এই তত্ত্ব জানাতে পারে, তবেই তত্ত্ব হবে সত্য।

আইনস্টাইনের তত্ত্ব পরীক্ষার চেষ্টা শুরু হলো।

জহুরীর যাচাই

বিজ্ঞানী কাউফমান (Kaufman) এবং বুচারার (Bucherer) তেজস্ক্রিয় পদার্থের আবিষ্কারের প্রথম যুগে বিটা রশ্মি নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। সেটা 1902 থেকে 1909 সালের মধ্যে। বিটা রশ্মির গতি, তার ভর বা কতটা চার্জ এরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, এটাই ছিল এদের পরীক্ষার বিষয়। রশ্মিটির গতি পাওয়া গেল আলোর গতির কাছাকাছি। ভরের মাপের সময় তাঁরা দেখলেন, গতি যার বেশী, সেই রশ্মি-কণার ভরও বেশী। বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে পাওয়া বিটারশ্মি থেকে পাওয়া গেল বিভিন্ন গতির কণা। অথচ রশ্মি এক, তাদের ধর্মও এক।

এই অসঙ্গতির ব্যাখা পেলেন তাঁরা আপেক্ষিকতাবাদের দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে। রশ্মির এই ভরকে m' ধরে এবং গতিকে v ধরে তাঁরা দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের সমীকরণ থেকে স্থির

ভর m-কে হিসাব করলেন। দেখা গেল ভর বা m সব রশ্মিরই এক। আরও পাওয়া গেল এই ভর ইলেকট্রনের ভরের সমান ; কণাগুলির চার্জও ইলেকট্রনের চার্জের সমান। অতএব বিটারশ্মি আর কিছুই নয়, দ্রুত গতিতে ছুটে চলা ইলেকট্রন মাত্র। আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের প্রমাণ পাওয়া গেল।

সবচেয়ে চমকপ্রদ প্রমাণের জন্য কিন্তু অপেক্ষা করতে হলো আরও কয়েক বছর, 1916 সাল পর্যন্ত। পাশেন (Paschen) আর সমারফেল্ড (Sommerfeld) ইলেকট্রনের কক্ষপথের আকার প্রমাণ করলেন ঐ 1916 সালেই।

1913 সালে বোর ইলেকট্রনের কক্ষপথের ধারণা আইনস্টাইনেরই কোয়াণ্টাম তত্ত্ব দিয়ে প্রকাশ করলেন। ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের চারদিকে বৃত্তাকারে ঘুরবে। সমারফেল্ড সৌরজগতের মডেলের ধারণা নিয়ে প্রমাণ করলেন যে ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের চারিদিকে একটা উপবৃত্তে ঘুরবে। নিউক্লিয়াস থাকবে এর যে কোনো দুটো ফোকাস বা নাভির একটাতে।

অনেক আগে 1609 সালে কেপলার দেখিয়েছিলেন যে উপবৃত্ত কক্ষপথের জন্য গ্রহ-গুলির গতি কমে বাড়ে। এই কমা বা বাড়া নির্ভর করবে উপবৃত্তের গঠনের উপর। পৃথিবীর গতিবেগ প্রায় একই কারণে প্রতি সেকেণ্ডে $18\frac{1}{2}$ মাইল পর্যন্ত কমে আর সেকেণ্ডে 19 মাইল পর্যন্ত বাড়ে। এই গতির অন্তর খুব একটা বেশী নয়, কারণ পৃথিবীর কক্ষপথ প্রায় বৃত্তাকার।

সামারফেল্ড বললেন, যা গ্রহের গতিতে সম্ভব, ইলেকট্রনের গতিতেও তা পাওয়া যাবে। গতি বাড়বে এবং কমবে। ইলেকট্রনের কক্ষের গতি আলোর গতির শতকরা এক ভাগ। এই গতিবেগে ভরের পরিবর্তন ধরা পড়বে। গতি বাড়লে ভর বাড়বে। নিউক্লিয়াসের কাছে যখন ইলেকট্রন আসবে তখন তার গতি বাড়বে, ভরও তখন বেশী হবে। এই যে ভরের বৃদ্ধি তার ফলটা অঙ্কের নিয়মে দাঁড়াল একটা নতুন রকমের। সমারফেল্ড দেখালেন ভরের বৃদ্ধির ফলে ইলেকট্রন যদিও একই উপবৃত্তাকার পথে ঘুরছে, মজাটা হবে, ঐ উপবৃত্তাকার কক্ষ পথটা নিজেও ঘুরতে থাকবে। পথটা উপবৃত্তাকার না হয়ে দাঁড়াবে একটা প্যাটার্নে, যাকে বলা হয় রোসেট।

কত্থক নাচের সময় যখন নাচিয়ে পায়ের গোড়ালিতে ভর করে ঘুরপাক খান, তখনও দেখা যায় পা সরে সরে যায়—তৈরি করে একটি বৃত্তের পদ্ম। উপবৃত্ত তৈরি করে রোসেটের শতদল।

যা হোক, সমারফেল্ড তো অঙ্কের সাহায্যে ইলেকট্রনের কক্ষপথ রোসেটের মতো হবে বললেন। প্রমাণ হবে কী করে ? সার্জেণ্ট পেট খুলে খুঁজে বেড়ান এপেনডিক্স। সেটা সম্ভব। কারণ চাক্ষুষ জগতে তা দেখতে পাওয়া যাবে। অদৃশ্য পরমাণুর অভ্যন্তরে কী হচ্ছে কী ভাবে দেখবে মানুষ ? তা ছাড়া ইলেকট্রনের গতি যেখানে আলোর গতির শতকরা একভাগ সেখানে তার পরিবর্তন জানা যাবে কী করে ?

বিজ্ঞানী বললেন, উপায় আছে। উপায় বর্ণালি। ডাক্তারের সহজ হাতিয়ার

থার্মোমিটার স্টেথেস্কোপ ; বিকিরণ বোঝার সহজ উপায় বর্ণালি বিশ্লেষণ। সমালফেল্ড বললেন, ইলেকট্রনের গতিপথ যদি কেবলমাত্র উপবৃত্তাকার হয়, তবে বর্ণালির রেখাগুলি নিশ্চল স্থির থাকবে। কিন্তু যদি রোসেট আকারের হয়, তবে প্রতিটি রেখা দ্বিধা বিভক্ত দেখা যাবে।

অতএব খোঁজো বর্ণালির রেখাগুলি। যদি রেখা একা থাকে তবে কক্ষপথ উপবৃত্ত ; রেখা দ্বিধা হলে কক্ষপথ হবে রোসেট আকার। তর্ক শুরু হলো অদ্বৈত আর দ্বৈতবাদের। প্রামাণ্য বিষয় আপেক্ষিকতাবাদ।

অবশেষে 1916 সালে পাশেন হিলিয়ামের বর্ণালিতে পেলেন দ্বিধা রেখা। আপেক্ষিক তত্ত্ব আবার প্রতিষ্ঠিত হলো। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত যাচাই হলো।

ডাইনি রাজপুত্রকে বললেন, অন্তত তিনদিন রাজকন্যাকে পাহারা দিতে হবে সারারাত। ভোরবেলা যেন ডাইনি এসে দেখে, রাজকন্যা রয়েছেন তার ঘরে। একরাত পার হলো, আরো আছে দুই রাত। তবেই রাজকন্যা রাজপুত্রের, নইলে নয়।

বিজ্ঞানজগৎ চাইল অন্ততঃ আরও কিছু আশ্চর্য প্রমাণ। প্রমাণ দিলেন কক্‌রফ্‌ট (Cockroft) এবং ওয়ালটন (Walton)।

আইনস্টাইন শক্তির প্রচণ্ডতার কথা ঘোষণা করলেন—$E=mc^2$।

এই অসম্ভব শক্তি মাপা যাবে কী করে ? খোঁজ তবে ছোট কণা, যার ভর অতি তুচ্ছ। তা হলে যে শক্তি পাওয়া যাবে তা হয়তো অপরিমেয় ! বিজ্ঞান তাই অণুর জগতে এই সূত্রের প্রমাণ খুঁজতে চাইলেন।

অণুর কেন্দ্রে আছে প্রোটন আর নিউট্রন। প্রোটনের আছে পজিটিভ চার্জ। নিউট্রন নিরপেক্ষ। এদের ভর অতি সামান্য ; মাত্র ·000000000000000000000001 গ্রাম। অর্থাৎ 1 গ্রামের পিঠে 24টি শূন্যের একভাগ ; এই প্রোটন আর নিউট্রন কেন্দ্রে আছে আঁটো সাঁটো হয়ে। একটি অণুতে থাকতে পারে একাধিক প্রোটন আর একাধিক নিউট্রন। প্রোটনে আছে পজিটিভ চার্জ, অথচ প্রোটনগুলি সমমেরু চার্জের জন্য বিকর্ষণের ফলে দূরে যায় না। এদের ধরে রাখছে একটা প্রচণ্ড সুসংবদ্ধ শক্তি। একে আমরা বলতে পারি সুবদ্ধ শক্তি বা binding energy। নিউক্লিয়াসকে ভাঙলে এই সুবদ্ধ শক্তি হবে মুক্ত।

শক্তি মুক্ত হবে, কিন্তু এই শক্তির উৎপত্তি কোথায় ? পদার্থবিদ্যার মৌলিক নিয়মে বলা হয়েছে শক্তির ক্ষয় নেই। শক্তির না আছে সৃষ্টি না আছে লয়—শুধু আছে রূপান্তর।

তবে কোথা থেকে এল এই শক্তি ; কে দিল তাকে ?

বিশিষ্ট আপেক্ষিকতাবাদ বললে, শক্তি আর ভরে সমতা আছে। যে সুবদ্ধ শক্তি মুক্ত হবে, তা নিউক্লিয়াসের ভরের আংশিক ধ্বংসের থেকেই আসবে। $E=mc^2$।

নিউক্লিয়াসের ভর বিভাজনের আগে এবং পরে যদি মাপা হয়, মুক্ত শক্তির মাপও যদি নেওয়া হয় তবেই তত্ত্ব প্রমাণ হবে। যদি দেখা যায় বিভাজনের আগে বা পরে নিউক্লিয়াসের ভর একই থাকে তবে শূন্য থেকে সৃষ্টি হবে শক্তির। বিজ্ঞানের নিয়ম ঃ

শক্তির নিত্যতা, তুচ্ছ হবে। আর যদি ভরের পরিবর্তন হয়? কী পাব তার কাছে?

1932 সাল। ককৃরফ্‌ট্‌ আর ওয়ালটন লিথিয়ামের নিউক্লিয়াসকে প্রোটন দিয়ে আঘাত করলেন। নিউক্লিয়াস দুভাগে ভেঙে গেল। শক্তিরও মুক্তি ঘটল। সংশয় দোলায়মান কাল; বিজ্ঞানী দুজন মাপলেন অবিভক্ত ভর আর বিভক্ত ভর। কী পাই কী পাই, বচন না পাই, মন কেমন করে।

পাওয়া গেল। ভরের তফাত হয়েছে। বিভক্ত ভরের যোগফল অবিভক্ত ভরের চেয়ে কম। এবং আশ্চর্য, যে শক্তি মুক্ত হয়েছে তা ঐ হারিয়ে যাওয়া ভরেরই রূপান্তরিত শক্তির সমান। $E=mc^2$।

আবিষ্কারের সাতাশ বছর পর প্রমাণ হলো শক্তি-ভরের সাম্য।

দুইরাত রাজকন্যার পাহারা দিলেন রাজপুত্র। আরো একটা প্রমাণ চাই। চাই কালের, সময়ের পরিবর্তনের বিশ্বাসযোগ্য তথ্য।

সেই প্রমাণ পাওয়া গেল আরও 6 বছর পর, 1938 সালে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগের বছর।

অসম্ভবকে সম্ভব করলেন বিজ্ঞানী ইভস্ (Ives)। ইভস্ একটা কাচের নলের ভিতর হাইড্রোজেন অণু পুরে উচ্চ বিদ্যুৎ শক্তি প্রয়োগ করে অণুর একটা উচ্চগতি আনতে পারলেন। সেকেণ্ডে 1100 মাইল বা 1760 কিলোমিটার। আলোর তুলনায় গতি অনেক কম, 0·006 অংশ মাত্র। তবুও গতি সাধারণ অবস্থার চেয়ে ঢের ঢের বেশী। ইভসের ঘড়ি হলো হাইড্রোজেন অণুর মধ্যেকার ইলেকট্রনের স্পন্দনের পরিমাপ। হাইড্রোজেন অণু যখন স্থির তখন এই স্পন্দন মাপা হবে। আবার অণু যখন দ্রুত গতিতে ছুটে চলেছে তখন মাপা হবে এই স্পন্দন। সময়ের হ্রাস-বৃদ্ধি যদি সত্যি হয় তবে অণু যখন আপেক্ষিকভাবে স্থির তার স্পন্দন-কাল, অণুর আপেক্ষিক দ্রুত গতিতে ছুটে চলার স্পন্দন-কালের চেয়ে বেশী হবে।

ইভস স্পন্দন-কাল অণুর স্থির অবস্থায় মাপলেন; মাপলেন ইলেকট্রনের বিকিরণের স্পন্দন-সংখ্যা বা frequency; আবার এই স্পন্দন-সংখ্যা মাপলেন যখন অণু ছুটে চলেছে সেকেণ্ডে 1100 মাইল বেগে। দুই স্পন্দন-সংখ্যায় প্রভেদ পাওয়া গেল। ছুটন্ত অবস্থায় অণুর স্পন্দন-সংখ্যা কমেছে।

স্পন্দন-সংখ্যা কমা মানে কী? স্পন্দনের সময় বৃদ্ধি। অর্থাৎ সময় ধীরে ধীরে বেগে চলেছে।

গতি সময়ের পরিবর্তন আনে।

গতি বাড়লে ভর বাড়ে, আয়তন কমে, ধীরে সময় চলে। আলোর গতি শুধু নিত্য, চিরসত্য।

গুরুর যাচাই হোলো।

তেরাত্তিরে পরীক্ষায় পার হলেন রাজপুত্র।

"এলবার্ট এতো বড় রঙ্গ, এতো বড় রঙ্গ।
চার যাদু দেখাত পার, যাব তোমার সঙ্গ ॥"
"ভর বাড়ে, আকার কমে, নিত্য আলোক তরঙ্গ।
সবার চেয়ে বড় যাদু, গতি-কালের অঙ্ক ॥"

এলবার্ট আইনস্টাইনের তত্ত্ব বিজ্ঞান সাদরে বরণ করে নিল।

প্রদীপ জ্বালানোর পালা

৫. আকাশপ্রদীপ

1905 সালে আইনস্টাইন প্রকাশ করলেন বিশেষ আপেক্ষিকতত্ত্ব। এখানে বেগের কোনো পরিবর্তন নেই ; আপেক্ষিকভাবে গতিবেগ একটি অপরটির সাপেক্ষে হয় অপরিবর্তনীয় গতিতে চলেছে, নয়তো গতি নেই—গতিশূন্য।

বেগেরও তো পরিবর্তন আছে। গাড়ী চলে, গতিবেগ বাড়ে, কমে। জমির উঁচু-নীচু চেহারা আছে বলে নদীর স্রোতের গতির পরিবর্তন হয়। উপর থেকে জিনিস পড়ে যত মাটির কাছাকাছি আসবে তারও গতি বাড়ে। পৃথিবীর গ্রহ-উপগ্রহের গতি এক নয়। এরও হ্রাস-বৃদ্ধি আছে। আছে সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটা।

সৃষ্টির জগতে যেমন আছে অপরিবর্তনীয় গতি, তেমনই আছে গতির পরিবর্তনীয়তা। নিউটন এই পরিবর্তনীয় গতি দেখেছিলেন মাধ্যাকর্ষণের মধ্যে। আপেল ফল মাটিতে নামে—কারণ পৃথিবীর টান। পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে সূর্যের টানে। পৃথিবীর আছে টান, সূর্যও দেয় টান। বিশ্বজগৎ এই টানা-পড়েনের সুতো দিয়ে বাঁধা। নিউটন একেই বললেন মাধ্যাকর্ষণ অথবা অভিকর্ষ। তিনি বললেন, সব বস্তুই পরস্পর পরস্পরকে টানে। টানের প্রভেদ শুধু বস্তুর ভরের উপর এবং বস্তু দুইটির দূরত্বের উপর নির্ভর করবে। এই টান আনবে একটা force বা বল।

মা দূর থেকে শিশুকে ডাকেন, আয় আয়। টালমাটাল পায়ে শিশুটি আসে, যত সে মায়ের কাছে আসে তত তার গতি বাড়ে ; শেষে দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়ে মায়ের কোলে। এই যে গতির দ্রুততা এ রয়েছে সব টানের শক্তিতে। ছোট, বড়র দিকে ছুটে যাবে। যত সে কাছে আসে তত বাড়ে গতির বেগ।

গতির পরিবর্তন হলো ত্বরণ (acceleration)। আর মাধ্যাকর্ষণ সৃষ্টি করে গতির পরিবর্তন।

অঙ্কের ছকে নিউটন এই মাধ্যাকর্ষণের বল সাজালেন—

$$F = G\frac{mm'}{d^2}$$

F হচ্ছে বল ; m এবং m' দুটি পৃথক বস্তুর ভর ; d তাদের মধ্যেকার দূরত্ব এবং G একটি ধ্রুব সংখ্যা, যাকে মাধ্যাকর্ষণের ধ্রুবক বলা হয়। এর মাপ প্রতি সেকেণ্ডে 32 ফুট করে বেড়ে যাবে। অর্থাৎ কোনো বস্তু যদি নীচে নামতে শুরু করে তবে প্রথম সেকেণ্ডে তার নামার গতি 32 ফুট, দ্বিতীয় সেকেণ্ডে 64 ফুট, তৃতীয় সেকেণ্ডে 96 ফুট। তিন সেকেণ্ডেই বস্তুটি 192 ফুট নেমে আসবে।

বিজ্ঞান জগতে নিউটন একটি বীজ অক্ষর দিলেন G, বীজসূত্র মাধ্যাকর্ষণ। তারিখ 1687 সাল।

জীবনযাত্রা তখন সহজ সরল ছিল। জগতের ধারণাও ছিল সীমিত। তখন মানুষের ধারণা ছিল, মহাকাশে এবং পৃথিবীতে বিভিন্ন অবস্থা রয়েছে। মহাকাশে সব কিছুই গোল বা গোলাকার অথবা তাদের গতিপথ বৃত্তাকার। সূর্য গোল, গ্রহরা গোল, চাঁদেরও রয়েছে বৃত্তাভাস ; দূরের তারকারা ঘোরে বৃত্তাকার পথে। অথচ পৃথিবীর বুকে কোনো গতি নেই। সব বস্তুই স্বাভাবিক অবস্থায় গতিহীন। অনুভূমিক বা horizontal গতির পরিবর্তন বাইরের শক্তি ছাড়া হবে না। অথচ বস্তুর ঊর্ধ্বা বা vertical গতি পৃথিবীর বুকে আছে। অনুভূমিক অপরিবর্তনীয় গতি বা স্থিতিই স্বাভাবিক।

নিউটন এ ছকেই তাঁর তত্ত্ব সাজালেন। তিনি বললেন, মহাকাশ বা পৃথিবী একটি নিয়মেই চলছে ; একটিই স্বাভাবিক অবস্থা রয়েছে পৃথিবী বা মহাকাশে, ঊর্ধ্বার্ধ বা অনুভূমিক গতিতে। সহজগতি মানেই সরলগতি। সব গতির স্বাভাবিক প্রকাশ সরল রেখায় বোঝানো যাবে। যদি তার বিচ্যুতি ঘটে তবে বাহিরের শক্তির দরকার। force বা বল মানেই বস্তুর স্বাভাবিক অবস্থার বিচ্যুতি। মাধ্যাকর্ষণ সেই নিয়ম যা স্বাভাবিক অপরিবর্তনীয় গতির বদল সম্ভব করবে।

নিউটনের সিদ্ধান্তে বিশ্বজগতের আচরণ এতদিন বুঝতে অসুবিধা হয় নি। তাঁর নিয়ম, তাঁর সিদ্ধান্ত বেশ খাটছিল। বস্তুর আকার ওজন বা গতি যদি ধরা-ছোঁয়ার মধ্যেই হয়, নিউটনের তত্ত্ব সেখানে বেশ ওয়াকিবহাল। গোলমাল তখনই, যখন বস্তুর আকার অতি ছোট বা অতি বড় ; ভর বা ওজন অতি বেশী বা গতি অতি দ্রুত। নিউটনীয় তত্ত্ব সেখানে যেন দিশেহারা। নীচু ক্লাশের গুরুমশায় উঁচু ক্লাশের মাস্টারমশাই হতে পারলেন না। নিউটনের তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রকাশ পাচ্ছিল।

আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ অপরিবর্তনীয় গতির জগতে একটি নতুন মাত্রার প্রয়োগ করলো ; সেটি কাল। অথচ আইনস্টাইনের তত্ত্বকে সহজেই নিউটনের বা সনাতন গতিবিদ্যার সমীকরণে লেখা যায়। আপেক্ষিকতাবাদের সূত্র এবং সনাতন গতিবিজ্ঞানের সূত্রে তফাত একটিই, সেটি c বা আলোর গতি। c যখন বস্তুর গতির সাপেক্ষে অনেক ধীর তখনই আপেক্ষিকতাবাদের সূত্রের আসন্ন ফল হিসাবে পাই সনাতন গতিবিজ্ঞানের সূত্র।

অপরিবর্তনীয় গতির জগতে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ বিশ্বজগতের অনেক কিছু ঘিরে ফেলেছে। আপেক্ষিকতাবাদের ফাঁদ বিশ্বজগতের অনেকটা ধরেছে তবু এখনো অনেক বাকি। গতির যদি পরিবর্তন হয়, তবে সেই আপেক্ষিক তত্ত্ব কোথায়—যা সেই অবাধ ত্বরণকে নিয়ম দিয়ে বাঁধতে পারবে?

আইনস্টাইন বিজ্ঞানের হাতে তাঁর নতুন তত্ত্ব তুলে দিলেন—সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ সেটা 1916 সাল। বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের প্রকাশ 1905 সালে ; মাত্র এগার বছরের তফাত। বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের সব তত্ত্ব তখনও প্রমাণ হয় নি ; এরই মধ্যে

এল নতুন তত্ত্ব, আর এই তত্ত্বের আশ্চর্য সব প্রমাণ পাওয়া গেল 1925 সালের মধ্যে, আবিষ্কারের দশ বছরের সময়ের মধ্যে ; বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের শেষ প্রমাণ তো পাওয়া গেল সেদিন, 1945 সালে। পরিবর্তনীয় গতির তত্ত্ব স্বাভাবিকভাবেই অপরিবর্তনীয় গতির তত্ত্বকে হারাবে।

সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ বোঝাতে আইনস্টাইন লিফটের ধারণা আনলেন ; লিফট যখন ওপরে ওঠে, ভেতরের মানুষ তখন নীচে টান অনুভব করে, মনে হয় যেন ওজন বাড়ছে ! লিফট যখন নামে, তখন যেন ওজনশূন্য অবস্থা ; শরীর হাল্কা, উপরে ভাসছে।

অথবা ধরা যাক দ্রুত ছুটে যাওয়া গাড়ী। হঠাৎ যখন গাড়ীর ব্রেক কষা হয়, আরোহী সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। গতি হঠাৎ বাড়লে ঝুঁকবে পিছনে।

এখন ঐ আরোহী সমেত লিফটটা আরোহীর অজান্তে বৃহস্পতি গ্রহে বসানো হলো। বৃহস্পতি ভারি গ্রহ, এর ভর পৃথিবীর ভরের তিন শ গুণ বেশী। ভর বেশী কাজেই মাধ্যাকর্ষণও বেশী—পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের আড়াই গুণ। কাজেই আরোহীর ওজন হঠাৎ বেড়ে যাবে। আরোহীর কাছে মনে হবে লিফটের ঊর্ধ্বগতি হঠাৎ প্রচণ্ড বেড়ে গেছে ; নইলে, ওজন বাড়ার বোধ হবে কেন ?

এবার একইভাবে লিফটটিকে বসান হোক বুধ গ্রহে। বুধ ছোট গ্রহ, হাল্কা গ্রহ। ভর পৃথিবীর পঁচিশ ভাগের একভাগ। কাজেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর তুলনায় মাত্র তিন ভাগের একভাগ। এই গ্রহের লিফটের আরোহীর ওজন-শূন্যতার বোধ হবে। মনে হবে যেন লিফট দ্রুত গতিতে নামছে।

অথবা ধরা যাক, স্বয়ং চালিত মহাকাশ-যান। নীচের কেন্দ্র থেকে যানটিকে পরিচালিত করা হচ্ছে। নিরুদ্বিগ্ন মনে আরোহীরা যানের মধ্যে আছে। যানটির বেগ হঠাৎ বাড়ানো হলো, আরোহীরা পিছনে ঝুঁকবে। হঠাৎ কমালে ঝোঁকটা হবে সামনের দিকে। ধরা যাক, মহাকাশে যেতে যেতে অজান্তে যানটি কোনো এক মহাকাশী বস্তুর কাছে এল। এই বস্তুর মাধ্যাকর্ষণী-টান যানটিতে পড়বে। টানের ফলে আরোহীরা পিছনে ঝুঁকে যাবে। গতির পরিবর্তনে যে পরিস্থিতি একই পরিস্থিতি মাধ্যাকর্ষণের টানের প্রভেদে। একই অবস্থা লিফটে বা মহাকাশ-যানে দেখা যাবে। কোন্‌টা যে মাধ্যাকর্ষণের প্রভেদ, কোন্‌টা ত্বরণ বা গতির পরিবর্তনের জন্য, আরোহী তা বুঝতে পারবে না।

এ যেন সদৃশ যমজ ; কোন্‌টা লব, আর কোনটা যে কুশ—এক লহমায় চিনতে পারা যাবে না।

এই সাদৃশ্যই আইনস্টাইনের কাছে নতুন সাম্যের ধারণা এনেছিল। তিনি বললেন দেশ বা space-এ যে কোনো বিন্দুতে মাধ্যাকর্ষণের বা ত্বরণের ফলাফল এক ; এদের প্রভেদ পাওয়া যাবে না।

এটাই আইনস্টাইনের সাদৃশ্য নিয়ম বা equivalance principle। তিনি আরও বললেন, পরম ত্বরণের ধারণা আমাদের কাছে অসম্ভব, কারণ, ঐ প্রাকৃতিক সাদৃশ্য বোধ। একইভাবে দেখা গেছে আপেক্ষিক ধারণায় পরম-গতির ভাবনাও অসম্ভব।

সাদৃশ্য বোধ আপেক্ষিক ধারণা জোগাবে। সাধারণ আপেক্ষিক-তত্ত্ব এই সাদৃশ্যের নিয়মের উপরেই গড়ে উঠেছে। তত্ত্বের প্রমাণে আইনস্টাইন গণিতের একটি নতুন শাখার ব্যবহার করলেন—টেনসার ক্যালকুলাস (tensor calculus)। অঙ্কের সমাধানে পাওয়া গেল তিনটি নতুন ধারণা। চেনা-জানা জগতে আবার ওলট-পালট ঘটে গেল। তিনটি সিদ্ধান্ত ; তিনটি ঘোষণা ; তিনটি রহস্য।

পরীক্ষায় তাদের প্রমাণ পাওয়া গেল। যা ছিল ঘোষণা, যা ছিল পূর্বাভাস তাদের আবির্ভাব ধরা পড়ল পরীক্ষায়।

নিউটন তার মাধ্যাকর্ষণ সূত্রের সাহায্যে গ্রহ-উপগ্রহের কক্ষপথের আকৃতি-প্রকৃতির ধারণা দিয়েছিলেন। গ্রহদের কক্ষপথ উপবৃত্তাকার আর এই পথ, তাঁর মতে, অপরিবর্তনীয়। যুগ-যুগান্তর ধরে গ্রহেরা একই পথে পরিক্রমা করবে ; পথের পরিবর্তন নিউটনীয় ধারণায় নেই।

সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বে আইনস্টাইন মাধ্যাকর্ষণ নিয়ে আলোচনা করলেন। তাঁর এই তত্ত্ব আইনস্টাইনের অভিকর্ষ তত্ত্ব নামেও পরিচিত। এই তত্ত্বের অনুসিদ্ধান্তে তিনি গ্রহদের গতিপথের একটি গাণিতিক সমীকরণ পেলেন। সমীকরণটি শেষমেশ নিউটনের সমীকরণের প্রায় কাছাকাছি, তফাত অতি সামান্য। গ্রহদের কক্ষপথ উপবৃত্তাকার, কিন্তু এই পথ স্থির নয়, নিশ্চল নয়, এরও পরিবর্তন হচ্ছে। space বা দেশে এই পথ অতি ধীর গতিতে ঘুরে যাবে।

সমারফেল্ড বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের আলোচনায় ইলেকট্রনের কক্ষপথের পরিবর্তিত গতিপথের একটা আভাস পেয়েছিলেন। সে গতি অতি দ্রুত, কারণ ইলেকট্রনের গতি আলোর গতির শতকরা একভাগ মাত্র। গ্রহদের গতি সে তুলনায় অনেক কম। কাজেই আইনস্টাইন জানালেন কক্ষপথের পরিবর্তনও অনেক কম হবে। পৃথিবীর ক্ষেত্রে এ কক্ষপথের পরিবর্তন একশ বছরে 3·8 সেকেণ্ড মাত্র। একটি বৃত্তাকার পথে আছে 360 ডিগ্রি। ডিগ্রি ভাগ করা হয় ষাট মিনিটে, প্রতি মিনিটে আছে ষাট সেকেণ্ড। সুতরাং এই পরিবর্তন যে কতটুকু তা একশ বছরেও ধরা যাবে না। নব্বই ডিগ্রিতে আছে 3,24,000 সেকেণ্ড। 3·8 সেকেণ্ডে পরিবর্তন যদি একশ বছরে হয় তবে এই নব্বই ডিগ্রি পরিবর্তন হবে প্রায় এক কোটি বছরে। পুরো রসেটের শতদল গড়ে উঠবে প্রায় 3·4 কোটি বছরে। অর্থাৎ প্রায় 3·4 কোটি বছর পর পৃথিবী আবার ঠিক তার পুরনো পথে ফিরে আসবে।

পৃথিবীর গতি অতি সামান্য ; সেকেণ্ডে মাত্র 19 মাইল বা 30 কিলোমিটার, পৃথিবীর কক্ষ প্রায় বৃত্তাকার। এজন্য এই পরিবর্তন এত কম। যদি কোনো গ্রহের পথ ভাল মতো উপবৃত্তাকার হয়, তার গতি যদি যথেষ্ট দ্রুত হয়, তবে কক্ষের পরিবর্তন বা যাকে জ্যোতিষের ভাষায় বলা হয় অনুসূর গতি (motion of perihelion), তা নিশ্চয় আপেক্ষিকভাবে কিছুটা বাড়বে।

ঐ গ্রহকে খুঁজতে দেরী হলো না। হাতের কাছেই আছে বুধ গ্রহ ; সূর্যের খুব

কাছে, কক্ষপথ বেশ উপবৃত্তাকার, গতিও বেশী। অনুসৃর গতির পরিমাপ এখানে একশ বছরে 574 সেকেণ্ড ; এর মধ্যে অন্যান্য গ্রহগুলির আকর্ষণের দরুন 531 সেকেণ্ডের হিসাব পাওয়া যাচ্ছে ; তফাত থাকছে 43 সেকেণ্ড। বেহিসেবী তফাত যে কেন, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তার কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি। ফরাসী বিজ্ঞানী লেভেরার (Leverrier) বললেন, হয়তো সূর্য আর বুধের মধ্যে আরও একটা গ্রহ আছে ; তার টানেই এই পরিবর্তন।

অনুসৃর গতি ধরে নতুন গ্রহ আবিষ্কার আগেও হয়েছে ; বিজ্ঞানী লেভেরার নেপচুন গ্রহের কথা ইউরেনাসের অনুসৃর গতি ধরেই জানিয়েছিলেন ; সে ভাবেই পাওয়া গেল প্লুটো। কারণ নেপচুন ইউরেনাসের অনুসৃর গতির পুরো ব্যাখ্যা দিতে পারে নি। দুটো গ্রহের টান হিসাব করলে পাওয়া যায় ইউরেনাসের অনুসৃর গতির তফাত। সুতরাং, যা ইউরেনাসে ঘটেছে তা কেন বুধ গ্রহেও হবে না ? সূর্যের আরো কাছে কোনো নতুন গ্রহ খোঁজো ।

কোনো নতুন গ্রহ পাওয়া গেল না। বুধ গ্রহের কক্ষপথ রহস্যই রয়ে গেল। রহস্যের সমাধান হলো আইনস্টাইনের তত্ত্বে। আইনস্টাইনের সমীকরণে পাওয়া গেল, বুধের অনুসৃর গতির প্রভেদ একশ বছরে হবে 43 সেকেণ্ড। যে হিসাবটা মিলছিল না, তার খোঁজটা পাওয়া গেল। সব গরমিল চুকিয়ে জমা-খরচের খাতায় পড়ল শূন্য !

সমারফেল্ড বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ ধরে অণুর জগতে কক্ষপথের পরিবর্তন পেয়েছিলেন। এই সমীকরণ কি এখানে খাটানো যাবে ? বিজ্ঞানীরা দেখলেন, সমারফেল্ডের নিয়ম দিয়ে বুধের অনুসৃর গতি মাপলে তফাত পাওয়া যায় মাত্র 7 সেকেণ্ড, অর্থাৎ আসল পরিবর্তনের ছ'ভাগের একভাগ মাত্র ! বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ অণুর কক্ষপথ বোঝাতে পারবে ; পারবে না ত্বরণের গতির কী প্রভাব কক্ষপথে হবে , পারবে না মাধ্যাকর্ষণের ফল বোঝাতে। সেখানে দরকার সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব। বিশ্বজগতে দু'নম্বরী খাতার দরকার হলো। এক নম্বর খাতায় শুধু গতির হিসাব, বেগের হিসাব। দু'নম্বরে রইবে ত্বরণ, মাধ্যাকর্ষণের হিসাব।

হিসাবের দুটো রীতিই আইনস্টাইন দিলেন।

ম্যাজিসিয়ান স্টেজে ম্যাজিক দেখান। একই টুপির ভেতর থেকে বের করেন রুমাল, রঙিন কাগজের শিকলি, কলম-পেন্সিল, শেষ কালে কান-খাড়া খরগোস। আইনস্টাইনও সাধারণ তত্ত্বের ঝুলি থেকে তিন রহস্য বার করলেন। এক রহস্য—গতির রহস্য, গ্রহদের পথের নড়াচড়ার হিসাব। এবার শুরু হবে দোসরা খেল—একই ঝুলির ভেতর থেকে।

আইনস্টাইন বললেন, আলোর রেখা মাধ্যাকর্ষণের টান অনুভব করবে ; তার সরল-রৈখিক গতিপথ ভ্রষ্ট হবে। মধ্যাকর্ষণের টানের জন্য আলো ভ্রষ্টাচারী।

আইনস্টাইন আগেই আলোর কণা-তত্ত্ব প্রচার করেছেন। আলো ফোটন কণা। আলো যখন কণা, তখন তারও ভর বা ওজন থাকবে। এছাড়া আলোর একটা অবিশ্বাস্য

গতি আছে, সেকেণ্ডে 186000 মাইল বা 3 লক্ষ কিলোমিটার। এই অবিশ্বাস্য গতিতে আলোর কণা যখন পৃথিবীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন একটা চাপ পৃথিবী নিশ্চয় সহ্য করে। কতটা চাপ? বিজ্ঞানীরা বললেন, সমস্ত পৃথিবীর ওপর আলোর চাপের পরিমাণ 160 টন বা 170 মেট্রিক টন।

কি ভাগ্য, সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবীকে জোরে টেনে রেখেছে; নইলে সামান্য আলোরও বিকিরণের চাপ, পৃথিবীকে কক্ষচ্যুত করে মহাবিশ্বে ঠেলে ফেলে দিতে পারত!

এই যে ফোটন কণা, তার ওজন কত হবে? গতি আছে বলেই ফোটনের ভর আছে; বিজ্ঞানীরা বললেন, গতিহীন ফোটনের ভর হবে শূন্য। বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্বেই এ সত্য জানা গেছে। কাজেই ছুটে-চলা ফোটনকে থামিয়ে তার ওজন মাপা যাবে না। ওজন মাপতে হবে যখন আলোর রেখা ছুটে চলেছে, তখনই।

ছুটে-চলা ট্রাকের ওজন ওয়েব্রিজের ওপর দিয়ে যাবার সময় ধরা পড়ে। ওয়েব্রিজের স্প্রিং-এর সঙ্কোচন হিসাব করে আমরা ওজন পাই। এই সঙ্কোচনের হারই ওজনের মাপ। ছুটে-চলা আলোর রেখা মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের ভেতর দিয়ে যাবার সময় বেঁকে যাবে, পথভ্রষ্ট হবে। এই বাঁক যদি যথেষ্ট হয়, তবে আলোর ভর মাপা সহজ হবে। অন্যদিকে আলোর গতিপথে যদি বাঁক না থাকে, অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণের কোনো টান যদি আলোর ওপর না পড়ে, তবে আলো সরল রেখাতেই আসবে, তার গতিপথের কোনো পরিবর্তন হবে না।

আলোর ওজন মাপতে হলে দরকার একটা দাঁড়িপাল্লা—এমন একটা বস্তু যার মধ্যাকর্ষণ শক্তি বেশী। চেনা-জানা জগতে তেমন বস্তু একটাই আমরা জানি—সে সূর্য। তার নিজের জগতে সে সম্রাট, তার ভর পৃথিবীর চেয়ে 3,30,000 গুণ বেশী। সৌর-জগতের সব গ্রহই তার টানে তার চারদিকে ঘুরছে। সুতরাং, যদি কোনো টানে আলোর গতিপথ ধরা-ছোঁয়ার মতো সরে আসে, সে টান সূর্যই একমাত্র দিতে পারে।

পাল্লা না হয় পাওয়া গেল! মাপটা হবে কী করে? আইনস্টাইন বললেন, এ তো সহজ। একটা তারার আলোর গতিপথ ধরে তারাটির অবস্থান মাপা হোক। মাপা হবে দুবার। প্রথম বার, যখন তারাটির আলোর পথে সূর্যের টান থাকবে না; দ্বিতীয় বার, যখন সূর্যের মাধ্যাকর্ষণের টান থাকবে।

প্রথম বারের মাপটা সহজ, দ্বিতীয় বারের মাপটাই কঠিন। দ্বিতীয় বারে পৃথিবী আর তারার সমরেখার মধ্যে সূর্য উপস্থিত হবে। তবেই মাধ্যাকর্ষণের টান আলোর ওপর পড়বে। পৃথিবী আর তারাটির মধ্যে সূর্য বহুবার আসতে পারে, কিন্তু সূর্যের ঔজ্জ্বল্যে তারাটি দেখা যাবে না। কাজেই তারার আলোর পথের নিশানা কী করে পাওয়া যাবে? আইনস্টাইন বললেন, সূর্যগ্রহণের কালে পাওয়া যাবে।

দিনের বেলায় তারা দেখা যায় পূর্ণ গ্রহণের কালে। সূর্য সেদিন চাঁদের ছায়ায় ঢাকা। তখনই তো সময়; সেই পরিপূর্ণ অন্ধকার সময়ে আলোর গতিপথ মেপে স্থির করতে হবে তারাটির অবস্থান। যদি অবস্থানের পরিবর্তন হয়, তবে মাধ্যাকর্ষণের টান

আলোর ওপর পড়েছে। পরিবর্তন না হলে, আইনস্টাইনের সিদ্ধান্ত ভুল।

1916 সালে সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্ব প্রকাশ পেল। 1919 সালের 29শে মে মাসে হলো সূর্যের পূর্ণ গ্রাস।

দু'দল ব্রিটিশ বিজ্ঞানী তারাদের অবস্থান দু'জায়গায় মাপতে বেরিয়ে পড়লেন। একদল গেলেন উত্তর ব্রেজিলের সোব্রাল অঞ্চলে, পশ্চিম আফ্রিকার গিনি উপসাগরের প্রিন্সেপ দ্বীপে গেলেন অন্য দল। দু'দলই গ্রহণের আগে এবং পরে, বহু তারার অবস্থিতির ফটো তুললেন। দু'ধরনের ফটো, সূর্য যখন তারা ও পৃথিবীর কাছে নেই এবং গ্রহণের কালে সূর্য যখন তারা ও পৃথিবীর রেখার মাঝখানে। দু'দলেরই ফলাফল এক—অবস্থানের পরিবর্তন পাওয়া গেছে। সোব্রাল দলের পরিবর্তনের মাপ হলো 1.98 সেকেণ্ড (ডিগ্রির মাপে) এবং প্রিন্সেপ দলের মাপ 1·6 সেকেণ্ড (ডিগ্রির মাপে)। দু'দলের মাপের গড় 1·77 সেকেণ্ড। আইনস্টাইনের পূর্বাভাস ছিল মাপ হবে 1·74 সেকেণ্ড!

মাধ্যাকর্ষণের ফলে আলোর গতিপথ বাঁকে এ তথ্য প্রমাণিত হলো!

বিজ্ঞানীরা আরো একবার সচকিত হলেন। মাধ্যাকর্ষণ যদি আলোকে টানতে পারে, তবে মাধ্যাকর্ষণ যদি খুবই বেশী হয়, তবে আলো হয়তো আসতেই পারবে না। অথবা কোনো তারার ভর যদি খুব বেশী হয়, তবে সেই তারাটির মাধ্যাকর্ষণ এত বেশী হবে যে আলো সম্পূর্ণ 360° বাঁক নেবে ; সেই তারাটি থেকে কোনো আলো বেরুবে না। হিসেব করে দেখা গেল, যদি কোনো তারার ভর সূর্যের ভরের চেয়ে প্রায় চার লক্ষ গুণ বেশী হয়, তবে সেই তারা—আমাদের কাছেই থাকুক, অথবা দূরে—সে অদৃশ্যই থাকবে ; তাকে দেখতে পাওয়া যাবে না। তার আলো কখনই বাইরে আসতে পারবে না!

বিজ্ঞানীরা আরো দেখলেন, নিউটনের সমীকরণেও আলোর পথে বাঁক থাকবে। হিসেবে সেটা 0·87 সেকেণ্ড পাওয়া গেল। আইনস্টাইনের হিসাবে 1·74 সেকেণ্ড নিউটনের হিসাবে পাওয়া ফলের ঠিক দু'গুণ! পরীক্ষায় আইনস্টাইনের হিসেবটাই প্রমাণিত হচ্ছে। সুতরাং নিউটনের নিয়মের চেয়ে সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্ব কুশলী বেশী।

যাদুকর এলবার্ট আইনস্টাইন ঝুলি থেকে দ্বিতীয় রহস্য বের করে দেখালেন—আলোর বাঁক।

এবারে তৃতীয় অবাক করা ম্যাজিকের পালা।

আইনস্টাইন বললেন এই তিন নম্বর ম্যাজিকটা বিশেষ কিছু নয় ; গতির ফলে সময় কমে দেখা গেছে, সেই রকম ত্বরণ বা মাধ্যাকর্ষণের ফলেও সময় কমবে। কমার হিসাবটা শুধু অন্য রকম।

আইনস্টাইনের মাধ্যাকর্ষণের সমীকরণটা নিউটনের কাছাকাছি। নিউটন বললেন ঃ $F=G\frac{mm'}{d^2}$ আর আইনস্টাইন বললেন, নীচের ঐ d^2-টা ঠিক নয় ওটা হবে—$d^{2\cdot 00000016}$ মাত্র। অর্থাৎ সমীকরণ হলো $F=G\,\frac{mm'}{d^{2\cdot 00000016}}$ এই শুধু!

তফাত শুধু ১পতেতে। ওতেই বোঝা যাবে কে ব্রাহ্মণ আর কোন্ জন অব্রাহ্মণ। অথচ

পৈতেতে যে দ্বিজত্বের লক্ষণ।

আইনস্টাইন জানালেন, সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর চেয়ে বেশী। অতএব, সূর্যের ঘড়ি পৃথিবীর ঘড়ির তুলনায় স্লো চলবে। কতটা স্লো ? হিসেবে জানা গেল সূর্যের এক সেকেণ্ড মানে পৃথিবীর প্রায় 1·000002 সেকেণ্ড। অর্থাৎ প্রায় 500000 সেকেণ্ড বা ছ'দিনের কিছু কম সময়ে ঘড়ির তফাত 1 সেকেণ্ড মাত্র !

আলোর ভর মাপার পাল্লা হলো সূর্য। সময়ের হ্রাস মাপার ঘড়ি হবে কে ? হবে এটম—সেই তো কোমর বেঁধেছে। বিশেষ আপেক্ষিকতত্ত্বের আলোচনায় বিজ্ঞানী ইভসের সময়ের হ্রাস মাপার পদ্ধতি জানা গেছে। সময় কমলে স্পন্দনের তরঙ্গকাল কমবে—ফলে বিকিরণের বর্ণালির পরিবর্তন হবে। এখানেও সেই একই পদ্ধতি। তফাত হাইড্রোজেন অণুর বদলে ব্যবহৃত হলো স্বাভাবিক আলোর রেখা, যার ভেতর, আছে সাতটি রামধনুর বর্ণালি।

আইনস্টাইনের তত্ত্বে জানা গেল, মাধ্যাকর্ষণের ফলে সময় যেহেতু কমবে, বর্ণালিরও স্বাভাবিক স্থান নড়ে যাবে। লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম—কাজেই পুরো বর্ণালির ছকটা লালের দিকে সরে যাবে। এই সরে আসাটার নাম দেওয়া হলো, আইনস্টাইনীয় শিফ্ট্ বা আপেক্ষিক বদল (relativistic or Einstein shift)।

সূর্যের আলোতে এই বদল খোঁজা হলো। কিন্তু হিসাবমতো এই বদল এত কম যে তা মাপা যাবে না। সুতরাং সূর্য নয়, চাই আরো ভারি তারা যার ওজন সূর্যের চেয়ে অনেক বেশী হবে, মাধ্যাকর্ষণও হবে অনেক বেশী।

মহাকাশে কিছু শাদা বেঁটে তারা (white dwarf star) আছে। স্বাভাবিক তারাদের আকারের তুলনায় এরা অনেক ছোট অথচ ওজন বা ভর অস্বাভাবিক রকমের বেশী। লুব্ধক (Sirus) তারার কাছে আরও একটা তারা আছে যার নাম জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন লুব্ধক খ (Sirus B) ; এর ব্যাস সূর্যের ব্যাসের শতকরা তিনভাগ মাত্র, কিন্তু এর ঘনত্ব বা density সূর্যের চেয়ে পঁচিশ হাজার গুণ বেশী। এর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও সূর্যের চেয়ে অনেক বেশী।

অঙ্কের হিসাবে পাওয়া গেল, আলোর বদল সূর্যে যা হতে পারে, এই তারায় তার তিরিশ গুণ বেশী হবে। এই বদল মাপা সম্ভব ; এবং 1925 সালে বিজ্ঞানী এডামস (Adams) এই পরিমাপ মাপলেন। অঙ্কের হিসেব আর এই পরীক্ষায় পাওয়া বর্ণালির স্থান বদলের ফলে মিল পাওয়া গেল। সুতরাং মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সময়ের গতি থামাতে পারবে।

বিজ্ঞানী এডামস আর বিজ্ঞানী ইভস সময়ের গতি হ্রাসের পরিমাপের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। ইভস আগে, এডামস পরে।

ঝুলির ভেতর থেকে বের হলো সবচেয়ে আশ্চর্য বস্তু।

তিনটি সূত্র আইনস্টাইনের মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব থেকে পাওয়া গিয়েছিল.; তিনটিরই প্রমাণ হলো।

নতুন তত্ত্ব, নতুন সূত্রের সম্ভাবনায় বিশ শতক প্রত্যাশায়, আকাঙ্ক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়েছিল। সেই প্রত্যাশা পূর্ণ হলো। মহাকাশ ও অণু-পরমাণু দুই জগৎ-বাঁধ-ভাঙা তরঙ্গে উদ্বেল হয়ে উঠল। অজানাকে জানা যাচ্ছে, অচেনাকে চেনা ! শক্তির নতুন উৎসের সন্ধান পাওয়া গেল। এতদিন বিজ্ঞান যেন গতিতে চলছিল। এখন গতিতে এল ত্বরণ। বিজ্ঞান প্রতি মুহূর্তে লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে চলেছে। দ্রুত, আরো দ্রুত তার গতিবেগ।

পরিবর্তনীয় বেগ, অপরিবর্তনীয় বেগ দুটি খাতার পাতা নানা আঁকে পূর্ণ হতে থাকে। বিজ্ঞান জগতে ভরা বর্ষা নামল ; এবার ফসল ফলাবার পালা।

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান।
মাধ্যাকর্ষণে এলবার্টের তিনটি সূত্র দান॥
একটি ঘোরায় গ্রহের কক্ষ,
আরটি আলোর বাঁক।
শেষটি বলে কালের ফেরে
আলো লালের দিকে যাক॥

হাউই-এর পথ

এলবার্ট আইনস্টাইনের ঝুলিতে আশ্চর্য জিনিসের যেন শেষ নেই। মাধ্যাকর্ষণকে তিনি ত্বরণ বলেন ; আবার এমন একটা কথা পরে জানালেন যে মাধ্যাকর্ষণ তার স্বাধীন সত্তা হারিয়ে ফেলল। তিনি স্পেস বা দেশের বাঁকের কথা জানালেন। আমরা Curved space বা বক্রী স্পেসের কথা তাঁর মারফতই জানতে পারলাম।

এই বাঁকা স্পেসের ধারণাটা সহজে বোঝা যাবে না। চারমাত্রার জগতে আইনস্টাইন সময় বা কালের কথা জানিয়েছেন। সময়ের সুতোর চারিদিকে আর তিনটি সুতো, দৈর্ঘ্য প্রস্থ-বেধ, যেন পাক খেয়ে জড়িয়ে আছে। স্পেসের বেধ এই চারমাত্রার ছন্দে জানা যাবে। আবার একটি তিনমাত্রার বস্তুর ছায়া আমরা দুই মাত্রাতে পাব। দুই মাত্রার ছায়া দেখব একটি রেখায়—একটি মাত্রায়। কাজেই একইভাবে স্পেসের চারমাত্রার বোধ আমাদের জগতে তিনমাত্রার ছায়া হয়েই ধরা দেবে।

একটা সমতলে বা কাগজে যদি ত্রিভুজ আঁকি, তবে তার তিনটে কোণের যোগফল 180° ডিগ্রিতে দাঁড়াবে। এবার ধরি পৃথিবীর কথা। পৃথিবী শুধু গোল নয়, গোলাকার, যাকে ইংরেজীতে বলি স্ফিয়ার (sphere)। পৃথিবীর উপরে আমরা অক্ষরেখা আর দ্রাঘিমা রেখা টেনেছি। এখন একটা গ্লোব নিয়ে যদি আমরা একটা নিরক্ষরেখার উপর দুটো দ্রাঘিমা রেখা টেনে ত্রিভুজ আঁকি, তবে দেখব যে অক্ষরেখার উপর কোণ দুটি 90° ডিগ্রি করে হবে। আর দ্রাঘিমা রেখা মেরুর কাছে মিলে যে কোণ তৈরি করবে তা 0° ডিগ্রি থেকে 360° ডিগ্রির যে কোনো একটা হতে পারে। অর্থাৎ ত্রিভুজটার কোণের যোগফল 180° ডিগ্রির চেয়ে বেশী।

এবার একটা গোল বাটির ভেতরে যদি একটা ত্রিভুজ আঁকি, তবে দেখব যে তিনটে

কোণের যোগফল 180° ডিগ্রির কম হবে ; বাঁক ভেতরের দিকে হলে, তিন কোণের মাপ 180° ডিগ্রির কম। ত্রিভুজের কোণের মাপের হেরফেরের কারণটা বক্রীতলের বা Curved surface উপস্থিতিতে হলো ।

পৃথিবীর গোলকত্ব আমাদের জানা। বাটির মতো আকাশ পৃথিবীর উপরে দেখা যায়। পৃথিবীর গোলকত্বের জন্য রামধনুকে দিগন্তে বৃত্তাভাসে দেখি, তবুও পৃথিবীর বুকে আমরা যখন ত্রিভুজ আঁকি তখন সেই ত্রিভুজ ইউক্লিডের সূত্রে জানবো। কোণের যোগফল হবে 180° ডিগ্রি। তার কারণ সম্ভাব্য যত বড় ত্রিভুজের কল্পনা আমরা করি না কেন বাস্তবে বক্রতা ধরা পড়বে না, সাধারণ সরল ত্রিভুজের ধারণাটুকু করতে পারব। এ যেন তিনমাত্রার জগতে দুইমাত্রার ছায়া। এখন যদি চারমাত্রার জগতে ত্রিভুজের কোণের হিসেব নিতে চাই, তবে একটা তিনমাত্রার ত্রিভুজের ছায়া পাব যা গোলাকার পৃথিবীর দ্রাঘিমা আর অক্ষাংশের বিধৃতিতে ধরা যাবে। যদি এই কোণের যোগফল হয় 180° ডিগ্রি, তবে স্পেস সমতল—যদি অন্য কিছু হয়, তবে স্পেস বক্রী।

এ বক্রতার ধারণা করতে গিয়ে আইনস্টাইন সরলরেখার সূত্রটি অন্যভাবে বললেন। সরল রেখা হলো দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী ক্ষুদ্রতম সংযোগ রেখা। বক্রীতলের উপর দুটি বিন্দুর ক্ষুদ্রতম সংযোগ রেখাটিও বক্রী হবে, কারণ এটি টানা হয়েছে বেঁকা পিঠের উপর। তা সত্ত্বেও একে আমরা সরলরেখা বলব। তবে সাধারণ ইউক্লিডীয় সরলরেখা থেকে একে আলাদাভাবে বোঝানোর জন্য আইনস্টাইন একে বললেন, geodesical line বা ভূ-সম্বন্ধীয় রেখা সংক্ষেপে geodesy বা ভূ-রেখা।

বক্রীদেশের বক্তব্যে আইনস্টাইন আরও একটা কথা জানালেন। তিনি বললেন, বিরাট ভরের কাছে স্পেস বা দেশ বাঁক নেবে। ভর যত বাড়বে, বাঁকও তত বড় হবে ; অথচ এই বাঁকের ধারণা আমাদের পৃথিবীতে ধরা যাবে না। যত বড় ভর পৃথিবীতে পাই না কেন, এমন কি হিমালয়, তার ভরের দরুন স্পেসের যে বাঁক হবে তা কোনো মাপেই ধরা যাবে না। সুতরাং বক্রতা হয় কিনা বোঝার জন্য দরকার বড় ভরের ; সেই বিরাট ভর হলো সূর্য। বাঁক মাপার জন্য দরকার সুতোর। সে সুতো, আইনস্টাইন বললেন, আলোর রেখা।

যদি মহাকাশের দুটি তারা নিয়ে আমাদের পৃথিবীতে একটি ত্রিভুজ তৈরি করি তাহলে দরকার হবে অতিদীর্ঘ সুতোর। এই সুতোর বেড় দিয়ে বানানো ত্রিভুজের কোণের মাপ নিলে দেখা যাবে এটা 180° ডিগ্রির বেশী। এখানে সুতো হবে আলোর রেখা, কারণ সেই তো ক্ষুদ্রতম পথ পরিক্রম করে। আবার যদি দেখি এই আলোর রেখা বড় ভরের কাছ দিয়ে যাচ্ছে, তবে বড় ভরের কাছের স্পেসের বক্রতার জন্য আলোর রেখার পথ পরিবর্তিত হবে।

এই তত্ত্ব আইনস্টাইন মাধ্যাকর্ষণে আলোর বাঁক বোঝাতে বলেছিলেন, সে কথাই আবার বললেন অন্যভাবে। আলো বাঁকবে, কারণ বিরাট ভরের দরুন স্পেসে ব্রণের মতো ঢিবি গজিয়ে ওঠে। তারই জন্য দেখা দেবে আলোর বাঁক।

আগেই জেনেছি ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা 1919 সালে আলোর বাঁক পেয়েছিলেন। বাঁকটা

হলো $1{\cdot}77'' \pm 0{\cdot}30''$, আর আইনস্টাইনের পূর্বাভাস ছিল $1{\cdot}75''$। সূর্যের বদলে আরো বিরাট ভরের তারা দিয়ে যদি মাপটা করা যেত তবে এই মাপের পরিমাণটা বেড়ে যেত ; ইউক্লিডীয় জ্যামিতির গোলমালটা ভালভাবে ধরা পড়ত।

আইনস্টাইন দেশ-কালের সমস্যায় এই বক্রতার কথা অন্যভাবে বললেন। চারমাত্রার জগতে আলোর গতি ভূ-রেখাতে ধরা যাবে ; আর সব বস্তুই এই বিরাট স্পেসে বাঁকাভাবেই থাকবে। আইনস্টাইন বললেন, যাকে মাধ্যাকর্ষণ বলি, বিশ্বজগতে সে এ বক্রতারই ফল— বিরাট ভরের সাপেক্ষে যে বক্রতা ঘটছে মহাবিশ্বে তা মাধ্যাকর্ষণের টান হয়েই দেখা দিচ্ছে—মাধ্যাকর্ষণের টান মানেই স্পেসের বাঁকের টান।

আইনস্টাইনের তত্ত্বের ফলে আর একটা সম্ভাবনা দেখা দিল ; এই মহাবিশ্ব সসীম না অসীম ?

স্পেস সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে দেখলাম বড় ভরের কাছে স্পেস বাঁক নিয়েছে। মহাবিশ্বে সর্বত্র বিরাট ভরের তারারা রয়েছে ; কাজেই স্পেস যেন ব্রণ বা ফোঁড়ায় ভরা একটি মুখ। আইনস্টাইনের তত্ত্বে এটিই আমাদের প্রাপ্তি। এখন এই ব্রণভরা মুখটি গোলগাল ভরাট, না গর্তে ঢোকা গাল অথবা সে চেপ্টা ? বাঁকের দুটি আকারের কথা আমরা জেনেছি—এক বাইরের দিকে, ফুটবলের মতো বাঁক, একে বলা হয় পজিটিভ বাঁক, এবং এরই উপরে গড়া ত্রিভুজের কোণের যোগফল হবে 180° ডিগ্রির বেশী। দ্বিতীয় বাঁকটি ভেতরের বাঁক—যেন ঘোড়ার পিঠের স্যাডল (saddle) বা জিন। এই বাঁকটিকে বলি নেগেটিভ বাঁক এবং এর উপরের ত্রিভুজেরকোণের যোগফল 180° ডিগ্রি নীচে। এখন এই ফুটবলের এবং জিনের চামড়ার দুটো টুকরোকে যদি সোজা করতে চেষ্টা করি, তবে দেখব ফুটবলের টুকরোটাকে বাইরে টানতে হবে। জিনের টুকরোটাকে সোজা করতে হলে সঙ্কুচিত করতে হবে। দুটোকেই সোজা করতে গেলে ভাঁজ হয়ে যাবে— সোজা হতে চাইবে না।

মহাবিশ্বের বাঁকের চিন্তা শুরু হয়। পরে প্রমাণিত হয় মহাবিশ্বও গোলাকার। তবে এর গোলত্ব ঘোড়ার জিনের মত ভেতরের দিকে নয় ; ফুটবলের মত বাইরের দিকে। আর এরই মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে গ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকা, ছায়াপথ, ধূমকেতু আরও অনেক কিছু। এই মহাবিশ্বের বস্তুদের দেখা হলো, আর তাদের মধ্যকার দূরত্ব মাপা হলো। ডক্টর হাবল (Hobble) দেখলেন, ছায়াপথের সংখ্যা যেন বেড়ে যাচ্ছে। আর এই বাড়তির সংখ্যা দূরত্বের তিন বর্গের চেয়ে কমভাবে। অর্থাৎ দূরত্বকে কিউব বা তিন বর্গ হিসাব করলে যে সংখ্যাটা পাওয়া যাবে, ছায়াপথের সংখ্যা তার চেয়ে অনেক ধীরে বাড়ছে। হাবল এ সব দেখে বললেন, গোলাকারটা পজিটিভ বা ফুটবলের মতো ঠিকই। সুতরাং সে সসীম।

হাবলের দেখা অবশ্য সীমিত—কারণ মাউণ্ট উইলসন বীক্ষণাগার থেকে যতদূর দেখা যায় সেটুকুই ছিল তাঁর দেখার সীমা।

মহাবিশ্বের সসীম রূপের অনিশ্চয়তা আরেকটা উপায়ে দূর হতে পারে—দূরের ছায়া-

পথের উজ্জ্বলতা মেপে। এখন পর্যন্ত ছায়াপথের গড় উজ্জ্বলতা আমরা একই রকম বলে ধরে নিয়েছি। এখন যদি এই ছায়াপথ কালের সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বলতা হারায় তবে হাবলের সসীম বিশ্বের কথা মানতে পারি। তবে এই যে সব 500,000,000 আলোকবর্ষ দূরে ছায়াপথ আছে, তাদের খবর এত তাড়াতাড়ি কি পেতে পারি ?

মহাবিশ্ব তার আকার প্রভৃতি নিয়ে এখনো বিস্ময়ের চিহ্ন হয়ে আমাদের কাছে আছে।

চিন্তার আরম্ভটা আইনস্টাইন স্পেসের বাঁকের ভাবনা থেকেই শুরু করলেন। আইনস্টাইনের তত্ত্বে, মহাবিশ্বের আকর্ষণ এই বাঁকাবিহারীর আকর্ষণ।

আধুনিক কীর্তনীয়ারা বাঁকের টানের গুণগান গাইলেন—

শুক বলে, দেশকাল চারমাত্রার গান,
সারী বলে, তাইতো ঘটে মাধ্যাকর্ষণের টান—
স্পেস বাঁকা যায় বোঝা।
শুক বলে, মাধ্যাকর্ষণ স্পেসের বাঁকের ফলে,
সারী বলে, বিরাট ভর সামনে আছে ব'লে,—
নইলে আলোর পথ সোজা।



সত্যেন্দ্রনাথ বসু



এন্‌রিকো ফের্মি



হাইসেনবার্গ



নীয়েল বোর

দেওয়ালির রাত্রি

১. চৌদ্দ প্রদীপ

প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হলো। বিজ্ঞানে পালাবদলের পালা এল। 1913 সালে এটমের সম্ভাব্য আকার বোর-রাদারফোর্ডের মডেলে জানা গেছে। যুদ্ধের ডামাডোলে বিজ্ঞানের অগ্রগতি খানিকটা হ্রাস পেয়েছে, তবু এরই মধ্যে পাওয়া গেছে আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্ব। এগিয়ে যাবার জন্য বিজ্ঞান টগবগ করে উঠছে ; যুদ্ধ থামবার যা ওয়াস্তা। 1919 সালে যুদ্ধ থামার পর একটা হিসেবনিকেশ করা হলো। দেখা গেল দুটো নতুন তত্ত্ব হাতে এসেছে, একটা কোয়াণ্টামবাদ আর একটা আপেক্ষিকতাবাদ। পদার্থ বিজ্ঞানে উচ্চ গণিতের শাখার ব্যবহার হয়েছে ; আর যোগ হয়েছে নতুন একটা মাত্রা—সময়। সবচেয়ে বড় কথা পদার্থবিদ্ এটমকে গ্রহণ করেছেন। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হরিজন আন্দোলনের পর এটমের প্রতিষ্ঠা এনে দিল, কেথড-রে আর তেজস্ক্রিয় পদার্থ। যুদ্ধের পর আবার শুরু হলো এটম নিয়ে গবেষণা।

মহাযুদ্ধের আগে বিজ্ঞান একটি ছোট জাপানী হাইকু কবিতা লিখেছে—

বিশৃঙ্খল গতি,
তেজ তরঙ্গ,
স্তরের লাফ।

এই তিন পদী কবিতা থেকে এবার নতুন মহাকাব্য সৃষ্টি করার চেষ্টা চলল।

এটম থেকে যখন শক্তি বা ভরবেগ বেরিয়ে পড়ে তখন এটম একটি স্তরের অবস্থান থেকে আর একটি স্তরে লাফিয়ে যায়। এই স্তরের অবস্থানই কোয়াণ্টাম তত্ত্বের মূলসূত্র। পরমাণুর গতি গড়গড়িয়ে যাওয়া নয়, লাফিয়ে যাওয়া। যেমন, হেঁটে চলা—এক পা মাটিতে রেখে অন্য পা ফেলা হবে দূরত্ব ডিঙিয়ে। এও ঝাঁপ। যাকে আমরা ছুটে যাওয়া বলি, তাও এই ঝাঁপের যোগফল। গেলভানি ব্যাঙ নাচিয়েছিলেন, আধুনিক কোয়াণ্টাম বিজ্ঞানীরা ব্যাঙের নাচ সর্বত্র দেখলেন। সব কিছু এক স্তর থেকে আরেক স্তরে লাফিয়ে চলেছে। এক স্তরে গতি অপরিবর্তনীয় হতে পারে, গড়গড়িয়ে যাওয়া হতে পারে ; কিন্তু অবস্থানের পরিবর্তন মানেই লাফিয়ে যাওয়া। আর, এই অবস্থানের পরিবর্তন ঘটাতে যারা অংশ নিয়েছিলেন, তারাও অন্য অবস্থানে যাবে লাফিয়ে।

ওস্তাদ যখন রাগমালা গান করেন, তখন একটি রাগে তার স্থিতি থাকে। তারপর একটি পর্দা, একটি সুর ধরে রাগান্তরে যাবেন—সেই বিশেষ পর্দা বা বিশেষ সুরটি রাগান্তরেও থাকবে। এই রাগান্তরে যাওয়া শুধু মীড় দিয়ে যাওয়া নয়, সার্গমের এক পর্দা থেকে অন্য পর্দায় যাওয়া, একটি ছোট তান দিয়ে বা সার্গমের কারচুপি নিয়ে।

মধু ফুরিয়ে গেলে, রেণু সংগ্রহ হয়ে গেলে, প্রজাপতি চাইবে এক ফুল ছেড়ে অন্য ফুলে যেতে। সেও পাখা মেলে ঝাঁপিয়ে পড়বে বাতাসে। রেণু মিলিয়ে দেবার বাসনা তাকে অন্য ফুলে পাঠাবে। তার পায়ে আগের ফুলের রেণু লেগে আছে।

এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় যাবে লাফিয়ে, কিন্তু একই অবস্থায় বস্তুর গতি কী হবে ? বিজ্ঞান বলল, বস্তু কণা ; তারা যেমন ছুটে চলে, তেমনি আছে তরঙ্গে যাওয়া। আলোর কণাধর্ম আছে, আছে তরঙ্গ। অণু-পরমাণুর কণাধর্ম থাকবে, থাকবে তরঙ্গ। এটমের উপকরণ, সেও কণা, তারও থাকবে তরঙ্গ। বিশ্বময় একই অবস্থা ; গতি-জগতে হাজার হাজার বিভিন্ন রকমের তরঙ্গমালা কাজ করছে।

ইলেকট্রন কণা। কোয়াণ্টাম তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিয়ে বোর জানিয়েছেন, এরা বিশেষ কয়েকটি কক্ষে থাকবে। 1925 সালে দ্য ব্রলি (de Broglie) জানালেন, ইলেকট্রন বা যে কোনো পদার্থের গতিতে থাকবে তরঙ্গায়িত ভঙ্গী ; গতির পরিচালনা তরঙ্গ-ভঙ্গে। তিনি বললেন, বস্তুর ভরবেগের উপর নির্ভর করবে ঐ তরঙ্গের দৈর্ঘ্য। ইলেকট্রনের কক্ষপথের পরিসীমা জানা যাবে, যদি তরঙ্গের দৈর্ঘ্য জানা যায় ; ঐ কক্ষপথগুলির পরিধি এবং তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের হার পূর্ণ সংখ্যা হবে। অর্থাৎ কক্ষপথের পরিধিকে তরঙ্গ, দৈর্ঘ্য দিয়ে ভাগ করলে পূর্ণ সংখ্যা পাওয়া যাবে—যেখান থেকে যে ভাবে কণাটি তার গতি নিয়ে বেরিয়ে যাবে, পরিক্রমার পর আবার ফিরে আসবে একই জায়গায়, একই ভঙ্গীতে। তরঙ্গের কোনো ভগ্নাংশ থাকবে না।

এ যেন সাঁওতালি নাচ। পায়ের ছন্দে আর দেহের তরঙ্গভঙ্গিমায় তাদের যতটুকু এগিয়ে বা পিছিয়ে যাওয়া, তার পুনরাবৃত্তি একই ভাবে হবে। নাচিয়েদের বৃত্তের পরিধির মাপ তাদের পা এবং দেহ—এ দুটির ছন্দের মাত্রার উপর নির্ভর করবে। কোথাও বেতাল হবার অবকাশ নেই। অতএব কক্ষপথ নির্দিষ্ট হবে—কারণ গতিভঙ্গী তরঙ্গময়।

এ বিশ্ব গতিতে ভরা, এ বিশ্ব কণায় পরিপূর্ণ। তেজ সেও কণা, শক্তি তারও আছে কণাধর্ম। বিদ্যুৎ-চুম্বক বিশৃঙ্খলার ফলে যে শক্তি বেরিয়ে যায়, যার গতি আলোর গতির সমান, তারাও কণা—আইনস্টাইন জানিয়েছেন, তারা ফোটন। ফোটন আছে রেডিও রশ্মিতে ; এক্স-রে বা গামা-রে এরাও ফোটন। এদের তফাত শুধু তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে বা শক্তির মাত্রায়। আবার শক্তি আর ভর একটি আর একটির রূপান্তর—আইনস্টাইন তত্ত্ব থেকে এটি আমাদের প্রাপ্তি—$E = mc^2$। এই শক্তিও ভরের আত্মীয়তা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। কোথাও আড়াআড়ি নেই ; দৈন্য নেই—নেই তুচ্ছতা। এটমেও এই তত্ত্ব খাটবে। যেখানে শৃঙ্খলা আছে, সেখানে শক্তি ও ভরের সাযুজ্য থাকবে। বিশৃঙ্খলা মানেই গতির বিশৃঙ্খলা ; তখন ভর পরিবর্তিত হবে শক্তিতে, অথবা শক্তি ভরে।

তিনপদী কবিতাটির ব্যাখ্যায় বিজ্ঞানী মহাকালের ত্রিশূল নিয়ে এটমের ভেতরটা দেখতে চাইলেন।

বোর-রাদারফোর্ড এটমের মডেলে ভারি কেন্দ্রের কথা জানিয়েছেন। ইলেকট্রনের ভর নিশ্চিতভাবে মাপা হয়েছে, এটি একটি ধ্রুব সংখ্যা—বীজ অক্ষর Me ; এটিরই

অনুপাতে হাইড্রোজেন কেন্দ্রের পজিটিভ চার্জবাহী কেন্দ্রটির ভর মাপা হলো। এই পজিটিভ চার্জবাহী কেন্দ্রের নাম দেওয়া হলো প্রোটন, ভর 1836·12 Me অর্থাৎ ইলেকট্রনের ভরের চেয়ে 1836·12 গুণ বেশী। হাইড্রোজেন এটমের আকারে কোনো জটিলতা নেই ; কেন্দ্রে আছে একটি প্রোটন, কক্ষে আছে একটি ইলেকট্রন।

অন্য পদার্থের বেলা বোর জটিলতার আশ্রয় নিলেন ; বললেন, কেন্দ্রে শুধু প্রোটন নেই, আছে প্রোটন ও ইলেকট্রনের সংযোগ। সব মিলিয়েই কেন্দ্র ; আর কেন্দ্রের নাম দেওয়া হলো নিউক্লিয়ন।

যেমন, সোডিয়াম। পর্যায়চক্র সংখ্যা এগার অথচ ওজন তেইশ। বোর বললেন, কেন্দ্রে প্রোটন আছে তেইশটা, আর বারোটা ইলেকট্রন ; কক্ষে আছে এগারটা ইলেকট্রন। অর্থাৎ কেন্দ্রে পজিটিভ চার্জবাহী প্রোটন থাকছে এগারটা, পজিটিভ-নেগেটিভ চার্জ মিলিয়ে নিরপেক্ষ প্রোটন-ইলেকট্রন সংযোগ থাকছে বারোটা এবং কক্ষে আছে এগারটা ইলেকট্রন।

এই প্রোটন-ইলেকট্রনের সংযোগ তত্ত্বটা রাদারফোর্ডের পছন্দ হলো না। সনাতন বিজ্ঞানের রীতি অনুযায়ী, দুটি বিপরীত চার্জ মিলে গেলে চার্জ থাকে না, বস্তু মৃত হয়, থাকে শুধু রূপান্তরী শক্তি। অতএব, প্রোটন-ইলেকট্রন সংযোগ না বলে একে নিউট্রন বলা ভাল। এটি চার্জের দিক দিয়ে নিরপেক্ষ প্রোটন। গাণিতিক দিক দিয়ে হাইসেনবার্গ এই ইলেকট্রনের সংযোগ পদার্থটির অনস্তিত্ব প্রমাণ করলেন। তিনি বললেন, নিরপেক্ষ ভারি কণা—যার তুলনা নিরপেক্ষ প্রোটনের সঙ্গে পাওয়া যাবে—তাই থাকবে কেন্দ্রে, প্রোটনের সঙ্গে। 1932 সালে চাডউইক (Chadwick) নিউট্রন আবিষ্কার করলেন। এটমের গঠন জানা গেল। কেন্দ্রে আছে প্রোটন-নিউট্রন, কক্ষে শুধু ইলেকট্রন।

1800 সালের কাছাকাছি সময়ে, ইংল্যাণ্ডের প্রাউটের ধারণা ছিল সব এটমই হাইড্রোজেন এটমের সমবায়ে তৈরি। অর্থাৎ মূল পদার্থগুলির এটমের ওজন, হাইড্রোজেন এটমের ওজনের গুণে পাওয়া যাবে। প্রাউটের এই উপপত্তি খাটে নি। কারণ মূল পদার্থের এটমের ওজন, হাইড্রোজেনের এটমের ওজনের গুণে সব সময়ে পাওয়া যায় নি। যেমন বোরন, চক্রের সংখ্যা পাঁচ, অথচ ওজন 10·95 ; অথবা ক্লোরিন, চক্রের সংখ্যা সতের এবং ওজন প্রায় 35·50। আপাত বিরোধিতা প্রাউটের উপপত্তির বাধা হয়ে দাঁড়াল।

1919 সালে এসটন (F. W. Aston) প্রাউটের নিয়মকে আবার প্রতিষ্ঠা করলেন। ব্যাপারটা ক্লোরিন নিয়ে। ক্লোরিনের এটমের ওজন হাইড্রোজেনের এটমের ওজনের প্রায় 35·50 গুণ বেশী। যদি ধরা যায়, কেন্দ্রে আছে প্রোটন ও নিউট্রন—নিউট্রন ওজনে প্রোটনের সমান, এবং প্রোটন হাইড্রোজেন এটমের ওজনের সমান—তবে অক্সিজেন বা সোডিয়াম অণুর একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। অক্সিজেনে থাকবে আটটা প্রোটন আর আটটা নিউট্রন। সুতরাং, ওজন হাইড্রোজেনের এটমের ষোল গুণ। সেই হিসাবে সোডিয়াম হবে হাইড্রোজেন এটমের চেয়ে তেইশ গুণ ভারি। কিন্তু 35.50 সংখ্যার ঐ 0.50 ভাগ পাওয়া যাবে কী ভাবে ?

এসটন কিন্তু সহজ সরল ব্যাখ্যা দিলেন।

সোডির আইসোটোপ-তত্ত্ব জানা হয়ে গেছে। পর্যায়চক্রে তেজস্ক্রিয় পদার্থ আর সীসার আইসোটোপ রূপ পাওয়া গেছে। এসটন একইভাবে জানালেন, ক্লোরিনের আইসোটোপের কথা। বললেন, দু'ধরনের ক্লোরিনের কথা, তাদের এক ধরনের ওজন 35, অন্যটির ওজন 37। এরা আছে তিন-এক হারে ; অর্থাৎ তিনভাগে আছে পঁয়ত্রিশের ক্লোরিন, আর একভাগ সাঁইত্রিশ। দুটো মিলিয়ে ক্লোরিনের ওজন 35·50। অর্থাৎ সাধারণ ক্লোরিন দুটো ক্লোরিন আইসোটোপের সৃষ্টি। প্রাউট তার প্রতিষ্ঠা পেলেন।

এ পর্যন্ত বেশ চলেছে। আবার গণ্ডগোল হলো। নতুন করে এটমের ওজন মাপা হয়েছে। নিউট্রনের ভর পাওয়া গেল ইলেকট্রনের ভরের চেয়ে 1838·65 গুণ বেশী বা ভর 1838·65Me। প্রোটনের ভর 1836·12Me। অর্থাৎ নিউট্রন হাইড্রোজেনের কেন্দ্রের চেয়ে 1·000823 গুণ ভারি। এই হিসাব ধরে প্রাউটের তত্ত্ব খাটানো হলো।

ধরা যাক সোডিয়াম—এর এটমের নতুন ওজন, হাইড্রোজেন এটমের ভরের মাপ অনুযায়ী 22·81। সোডিয়ামের কেন্দ্রে আছে এগারটি প্রোটন এবং বারোটি নিউট্রন। অতএব ওজন হবে –

$11 + 12 \times 1·000823 = 23·01$। (হাইড্রোজেনের ভরের মাপে) অথচ সোডিয়ামে এটমের ওজন 22·81। তফাত পাওয়া গেল, গরমিলটা হলো কেন ?

উত্তর পাওয়া গেল, আইনস্টাইনের তত্ত্ব থেকে—ভরের হ্রাস বা mass defect তত্ত্বে আইনস্টাইন দেখিয়েছেন ভরের যদি হ্রাস হয়, শক্তি বেরিয়ে আসবে ; $E = mc^2$! এখানে এটমের মধ্যে প্রোটন, নিউট্রন আর ইলেকট্রন আঁট-সাঁট হয়ে আছে। সুতরাং ভরের হ্রাস হবে। হিসাবে দেখা গেল ভরের হ্রাস, শক্তির উৎপত্তির আইনস্টাইনীয় ব্যাখ্যা দিয়ে দেওয়া যাচ্ছে।

প্রাউট রাজ্য হারিয়ে রাজ্য ফিরে পেয়েছিলেন। রাজ্য আবার হাতছাড়া হতে যাচ্ছিল। হলো না।

এটমের উপকরণ যা হোক, 1932 সাল নাগাদ জানা গেল, ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন। কিন্তু ত্রিশ বছরও কাটল না—এটমের মধ্যে পাওয়া গেল আরও অনেক মৌলিক উপাদান। তেজস্ক্রিয় পদার্থের মতো এই নতুন উপাদানগুলি যেন ঝাঁক বেঁধে হাজির। এদের বুঝতে গিয়ে আবার দরকার হলো কোয়াণ্টাম গতি-বিজ্ঞান আর আপেক্ষিকতত্ত্বের নতুন আলোচনা।

যখন আমরা পদার্থের ভর বা গতির কথা বলি, তখন আপেক্ষিকতাবাদ অনুযায়ী তার ধারণাটা আপেক্ষিক। বস্তুর স্থির ভর তখনই বোঝা যাবে যখন যে তার ভর মাপছে তার গতিবেগ এবং বস্তুর গতিবেগ এক। এই অবস্থায় একটি আরেকটির কাছে স্থির, গতিহীন। যে কোনো বস্তুর গতি আলোর গতির চেয়ে কম। কাজেই সব বস্তুর স্থির ভর মাপা যাবে। অথচ ফোটন কণার গতি আলোর গতির সমান। সুতরাং আপেক্ষিকভাবে দর্শক তার স্থির ভর মাপতে পারবে না। দর্শক যতই এই ফোটনের

গতির কাছাকাছি যেতে পারবে, ততই মনে হবে আলো এক গতিতেই ছুটে চলেছে! একটা জিনিসই শুধু লক্ষ্য করা যাবে, যত আলোর গতির কাছে আসা যাবে ততই মনে হবে এর শক্তি আপেক্ষিকভাবে কমে আসছে। সুতরাং যদি ফোটন কণাকে কোনো অবস্থায় স্থির করা যেতে পারত, তবে দেখা যেত, সেই অবস্থায় এর শক্তি নেই; শক্তি নেই অর্থ ভরও নেই। সুতরাং, যে সব কণা আলোর গতিতে যাবে তাদের স্থির ভর শূন্য, তাদের সব শক্তি ব্যয় হবে গতিতে; অতএব তাদের গতি আলোর গতির সমান। আবার, যাদের স্থির ভর আছে, তাদের গতি আলোর চেয়ে কম হবে। গতি অনুসারে কণাদের দুইভাগে ভাগ করা যাবে।

আবার দেখা গেল, কোনো কণার চার্জ পজিটিভ। কেউ আবার নেগেটিভ। কতক-গুলো আবার নিরপেক্ষ। চার্জের দিক দিয়ে কণাদের ভাগ করা যাবে তিন ভাগে।

স্পিনের কথা আমরা আগেই জেনেছি। স্পিনের দিক দিয়ে কণারা হবে ফের্মিয়ন বা বোসন। এরাও দু'ভাগ।

এগুলো বিজ্ঞানীদের জানা হাতিয়ার, 1932 সাল নাগাদ এসব তথ্য তাঁদের জানা। গোলমালটা বাধালেন বিজ্ঞনী ডিরাক 1928 সালে। ডিরাক কোয়াণ্টাম গতিবাদে আপেক্ষিকতত্ত্বের প্রয়োগে কতগুলো সমীকরণ পেলেন। পরীক্ষায় ইলেকট্রনের গতিতে স্পিন ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্ম যা পাওয়া গিয়েছিল তার সম্পূর্ণ সুবোধ্য ব্যাখ্যা ডিরাকের সমীকরণে পাওয়া গেল। কিন্তু পাওয়া গেল আরও অনেকখানি—বেণীর সঙ্গে মাথা; ডিরাকের সমীকরণের একটা উত্তর জানাল ইলেকট্রনের চার্জ নেগেটিভ হবে, অথচ আরেকটা উত্তরে জানা গেল চার্জ পজিটিভ হতে পারে।

ডিরাকের সমীকরণ ইলেকট্রনের ব্যবহার বোঝাতে গিয়ে যেন বেশী বুঝিয়ে ফেলছে। সমীকরণগুলো এত চমৎকার, অথচ কেন যে জানাচ্ছে পজিটিভ চার্জের ইলেকট্রনের কথা! 1928 সাল থেকেই এ তত্ত্বের আলোচনা চলল। 1931-32 সাল নাগাদ পজিটিভ চার্জবাহী ইলেকট্রনের চিন্তা মোটামুটি দানা বেঁধে উঠল। এই কণাকে, যার নাম দেওয়া হলো পজিট্রন, তাকে খোঁজার চেষ্টা শুরু হলো।

এ যুগে একটা থিয়োরি গড়ে উঠেছিল—যাকে বলা হয় এণ্টিম্যাটার বা বিপরীত পদার্থ। মহাবিশ্বে এখানে আমরা যা দেখছি, তার উল্টোটা পাওয়া যাবে অন্যত্র। এখানে যদি প্রোটনের থাকে পজিটিভ চার্জ, ইলেকট্রনে নেগেটিভ—তবে বিপরীত বিশ্বে থাকবে প্রোটনে নেগেটিভ চার্জ আর ইলেকট্রনে পজিটিভ। অতএব মহাবিশ্বে পজিট্রন পাওয়া সম্ভব।

পজিট্রন অন্য জগতে, বিপরীত বিশ্বে পাওয়া যাবে; কিন্তু আমাদের বিশ্বে বা আমাদের এটমে পাওয়া যাবে কি?

আণবিক বিদ্যায় এবার শুরু হলো লুকোনো কণাকে খুঁজে বের করা।

গোয়েন্দাদের কাছে একটা তথ্যই আছে, পজিট্রন এ পৃথিবীতে পাওয়া দুষ্কর। দুটি বিপরীত চার্জ একসঙ্গে এলে দুজন দুজনকে ছাঁটাই করবে, পাওয়া যাবে চার্জহীন শক্তি।

সুতরাং ইলেকট্রনের কাছে পজিট্রন এলে দুজনই নিঃশেষ হবে, বেরিয়ে আসবে বিদ্যুৎ-চুম্বক তরঙ্গ ভঙ্গীতে শক্তি, দুটি কণার কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। দুটি বিপরীত চার্জের কণার মিল মানে দুটিই আত্মহত্যা করবে। পাওয়া যাবে কিছুটা শক্তি, যা গামা-রে হয়ে বেরিয়ে আসবে। আবার শক্তির রূপান্তর হবে ভরে। অর্থাৎ এই গামা-রে আবার রূপান্তরিত হতে পারে ইলেকট্রন ও পজিট্রনে ; এই দুটি বিপরীত কণা মিলে আবার সৃষ্টি করবে গামা-রে।

মহাকাশের মহাজাগতিক রশ্মি বা কসমিক-রের আলোচনার সময় বিজ্ঞানীরা এই ধারণা বা idea গ্রহণ করেছিলেন। জোরালো গামা-রে মহাকাশে সৃষ্টি করবে ইলেকট্রন-পজিট্রন কণা, তারা আবার সৃষ্টি করবে গামা-রে—গামা-রে আবার করবে দ্বৈত কণা। কসমিক-রে কিভাবে সৃষ্টি হয় বিজ্ঞানের সঠিক জানা নেই। তবে তার ধারণা অতিদ্রুত ছুটে আসা ইলেকট্রন, যদি পৃথিবী উর্ধ্বলোকের বাতাবরণ স্তরে প্রবেশ করে, তবে ঐ বাতাবরণের এটমের কেন্দ্রে হয়তো সেটি আঘাত করবে। ঐ ইলেকট্রন তার শক্তি হারিয়ে গামা-রে হয়েই আত্মপ্রকাশ করবে, আর গামা-রে তৈরি করবে দ্বৈত কণা। সুতরাং লেবরেটরিতে যদি কসমিক-রে সৃষ্টি করা যায়, তবে দ্বৈত কণা পাওয়া যাবে, পজিট্রনও পাওয়া যাবে।

গোয়েন্দা শার্লক হোমস্ বললেন, ওয়াটসন, এ সবই এলিমেণ্টারি। সুতরাং এলিমেণ্টের সৃষ্টি ঘটালেই পলাতককে ধরা যাবে।

এবং বিজ্ঞানী এণ্ডারসন (C. D. Anderson) লেবরেটরিতে ক্লাউড চেম্বার যন্ত্রে কসমিক ধারার অবস্থা কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করে পজিট্রন পেলেন। সেটা 1933 সাল। এণ্টিম্যাটার পৃথিবীতে পাওয়া গেল। ডিরাকের তত্ত্বের যথার্থ্য প্রমাণিত হলো। পজিট্রন ভরে ইলেকট্রনের সমান ; চার্জের মাত্রাও এক। স্পিনের সংখ্যা ইলেকট্রনের মতো $\frac{1}{2}$, অর্থাৎ পজিট্রন হলো ফের্মিয়ন।

শুধু ইলেকট্রন আর পজিট্রনের মিলনটাই মারাত্মক। এক গ্রাম পজিট্রন-ইলেকট্রন মিলে যে শক্তি পাওয়া যাবে তা একশটা হাইড্রোজন বোমার বিস্ফোরণ শক্তির চেয়েও বেশী !

ম্যাটার-এণ্টি-ম্যাটারে আড়িই ভালো ; ভাবটা দুর্ভাবনার।

ইলেকট্রনে যদি পজিট্রন থাকতে পারে, অন্য কণারও থাকবে বিপরীত কণা। প্রোটনেরও পাওয়া যায় এণ্টিপ্রোটন, যারা ভরে এবং গুণে প্রোটনের সামন, শুধু চার্জে হবে নেগেটিভ। তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্‌রা এর অস্তিত্ব ঘোষণা করলেন ; গবেষক পদার্থ-বিদ্‌দের কাজ হলো এর প্রমাণ দেওয়া।

তাত্ত্বিক বাবুতো জানিয়েই খালাস। ঠেলা সামলাতে হবে পরীক্ষক দলকে। পজিট্রন সহজে পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু এণ্টি-প্রোটন পাওয়া অতো সহজে হলো না।

দুটি বিপরীত চার্জের মিলন মানে দুটি বস্তুর লোপ বা সম্পূর্ণ বিনাশ। এই বিনাশ থেকে পাওয়া যাবে শক্তি। শক্তির হিসাব থেকে জানা যাবে শক্তির উৎসটা কী ; এটি কি ভরের রূপান্তর, না বিনাশের ফলাফল ? তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্‌রা পরীক্ষকদের এটুকু

তথ্য জানালেন।

কসমিক-রের পরীক্ষায় কিন্তু প্রোটনের মতো ভারি কোনো নেগেটিভ কণার অস্তিত্ব পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল অন্য জাতীয় কণা, যাদের ভর ইলেকট্রন আর প্রোটনের মাঝামাঝি। এদের নাম দেওয়া হলো মেসন বা মাঝারি। এ্যণ্টি-প্রোটন কসমিক-রেতে থাকলেও তাদের সংখ্যা হয়ত কম, কাজেই ধরা যাচ্ছে না।

অতএব কসমিক-রেতে যত কণা পাওয়া যাচ্ছে তার চেয়েও যদি বেশী সৃষ্টি করা যায়, অথবা কসমিক-রে সৃষ্টিতে যত শক্তি আর গতি ব্যবহৃত হচ্ছে, তার চেয়েও যদি বেশী শক্তি বা গতি ব্যবহার করা যায়, তবে এ্যণ্টি-প্রোটন পাওয়া যেতে পারে।

সত্যান্বেষী তাত্ত্বিক ব্যোমকেশ কী হতে পারে বলছেন ; আর বেচারা অজিত, পরীক্ষক বিজ্ঞানী অজিত, খেটে চলেছেন ; ব্যোমকেশকে জানাচ্ছেন কাজের পূর্ণ বিবরণ। সত্যান্বেষী বললেন, একটা প্রোটনকে, আরও একটা প্রোটন দিয়ে আঘাত করলে পাওয়া যাবে দুটো প্রোটন, আর একজোড়া স্বল্পায়ু প্রোটন-এ্যণ্টি-প্রোটন। আর এই নতুন পদার্থ তৈরি করতে হলে দরকার প্রচণ্ড শক্তির। সুতরাং আগে তৈরি কর ভাল মতন একসিলারেটার বা ত্বরণকারক।

একসিলারেটার বা ত্বরণকারকটা কী ? চার্জবাহী কণাদের যদি উচ্চ-বিদ্যুৎ শক্তির মধ্য দিয়ে পাঠানো যায়, তবে তাদের গতি বেড়ে যাবে। রাইফেলের গুলি যেমন ঘোরানো নলের মধ্য দিয়ে যাবার জন্য প্রচণ্ড ঘূর্ণি বেগ পায়, কণা গুলিও তেমনি ঘোরানো পথে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ শক্তি দিয়ে যাবার পর পাবে প্রচণ্ড বেগ। এই পদ্ধতিতেই তৈরি হলো সাইক্লোট্রোন এবং অন্যান্য নানা ধরনের একসিলারেটার।

1954 সালে একসিলারেটার তৈরি হলো বার্কলে লেবরেটরিতে। এই প্রচণ্ড শক্তি-শালী একসিলারেটারের নাম দেওয়া হলো বিভারটন। এই বিভারটনের ভেতর দিয়ে প্রোটনকণাকে পাঠিয়ে তার বেগকে বাড়ানো হলো ; আর ঐ প্রচণ্ড বেগবান প্রোটনের গুলি দিয়ে অন্য প্রোটনকে আঘাত করে পাওয়া গেল এ্যণ্টি-প্রোটন। একই পদ্ধতিতে 1956 সালে পাওয়া গেল এ্যণ্টি-নিউট্রন। অতএব পদার্থের বিপরীত আছে। তাদের মিলনে পদার্থ দুটির বিনাশ এবং শক্তির রূপান্তর।

তিনের যায়গায় পাওয়া গেল ছয়টি উপকরণ। এটমই জানাল তাদের। আরও পাওয়া গেল ফোটন—যার না আছে ভর, না আছে চার্জ। ফোটনের এ্যণ্টি-ফোটন পাওয়া যাবে না। যার ভর বা চার্জ নেই, তার বিপরীত কিছু থাকতে পারে না। ফোটন একমেবাদ্বিতীয়ম্—এক এবং অকৃত্রিম।

সাত ভাই চম্পার সঙ্গে এবার যোগ দিল এক বোন পারুল, তার নাম গ্রেভিটন। গাম্ভারি নাম। জন্ম মধ্যাকর্ষণ বা গ্রেভিটেশন ক্ষেত্রে। বিদ্যুৎ-চুম্বক ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা যদি ফোটনের সৃষ্টি করে, তবে মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে গ্রেভিটন কণা। এরও ভর নেই, চার্জ নেই, নেই কোনো বিপরীত কণা। ফোটনের মতন তার ধরন-ধারণ। শুধু ফোটনের স্পিন হলো এক, গ্রেভিটনের দুই। এরা বোসন।

সবই হলো, অনেক কিছু জানাও গেল। শুধু গ্রেভিটনকে এখনো 'দেখা' যায় নি। কিন্তু তার উপস্থিতি ধরে সমস্যাপূরণ বেশ চলছে ; অতএব, একদিন না একদিন একে দেখা যাবে। এই উপকরণদের 'দেখা' মানে চোখে দেখা নয়। 'দেখা' তার ফেলে দেওয়া চিহ্ন ধরে, কণাদের গতিবিধির পরিবর্তন দিয়ে, অথবা শক্তির পরিমাপ নিয়ে।

চোখ বন্ধ থাকলেও মায়ের হাতের স্পর্শ কিন্তু শিশু বোঝে, বোঝে মায়ের উপস্থিতি। বিজ্ঞানীও বোঝেন এই উপকরণদের অস্তিত্ব। বোঝার মধ্য দিয়েই দেখা। গ্রেভিটনকে বোঝা যাচ্ছে ; ইয়েতির পা-এর ছাপের মতো কোনো চিহ্ন এখনও পাওয়া যায় নি। তবু সে আছে, বিজ্ঞানীদের চিন্তায় ; সেই সাতটি তারার মালার পাশে রয়েছে অরুন্ধতীর মতো ফোটনের কাছাকাছি।

এরা আটজন।

কিন্তু আরও যে ধরা যাচ্ছে ! কসমিক-রেতে পাওয়া গেছে মেসন। এরা কে ? এদের চিনতে গেলে ঘাঁটতে হবে বিখ্যাত শক্তিচুরি মামলার নথিপত্তর।

নিউট্রনের ভর মাপা হয়েছিল 1838.65 Me আর প্রোটনের 1836.12 Me। অর্থাৎ নিউট্রন-প্রোটনের চেয়ে 2.53 Me বেশী ভারি। এই হিসাব থেকে সহজেই বোঝা গেল যে নিউট্রন একটা প্রোটন আর একটা ইলেকট্রন কণায় রূপান্তরিত হতে পারবে, এবং যে শক্তি ত্যাগ করবে তা মোটামুটি 2.53 Me ভরের সমান। আইন-স্টাইনের সমীকরণ $E=mc^2$ এই শক্তি আর ভরের রূপান্তর জানাবে।

এটমের মধ্যে আছে প্রোটন আর নিউট্রন, কক্ষে আছে ইলেকট্রন। এখন যদি কেন্দ্রের প্রোটন বা নিউট্রনের সমতার হার কোনো কারণে নষ্ট হয়, তবে এটম নিজে থেকেই নড়েচড়ে একটা নতুন অবস্থা খাড়া করবে। যদি বেশী নিউট্রন থাকে, তবে কতগুলো নেগেটিভ ইলেকট্রন কণা ছেড়ে প্রোটনে পরিবর্তিত হবে। আবার যদি বেশী প্রোটন থাকে তবে এরা পজিটিভ ইলেকট্রন ছেড়ে নিউট্রনে দাঁড়াবে। এই যে ইলেকট্রন কণা ছেড়ে দেওয়া, একে বলা হয় বিটা-র ক্ষয় বা beta decay, কারণ নিউক্লিয়ন থেকে যে ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে তাকে আমরা বিটা কণা বলে থাকি।

এই বিটা কণা যখন বেরিয়ে আসবে তখন এদের সঙ্গে থাকবে নির্দিষ্ট ভর, গতি এবং শক্তি। আবার আপাতত ধরে নেওয়া যায় যে, যে কোনো পদার্থ থেকে যে বিটাকণা বেরুবে তাদের ভর, গতি এবং শক্তি এক থাকবে।

কিন্তু, বাস্তবে পরীক্ষার ফলে দেখা গেল, বিভিন্ন পদার্থ থেকে যে বিটা কণা বেরিয়ে আসছে তাদের শক্তি ভিন্ন ; এবং বিটা কণা যে শক্তি নিয়ে আসছে, সে শক্তির পরিমাণ, ভরের অনুপাতে পাওয়া যাচ্ছে না। $E=mc^2$ সমীকরণটি যদি সত্য বলে ধরে নেওয়া যায়, তবে নিশ্চয় কোন অজানা কণা খানিকটা শক্তি চুরি করে পালাচ্ছে। নইলে বিটার ক্ষয়ের কোন সদুত্তর পাওয়া যাবে না কেন ?

এটমের ভাণ্ডার থেকে তেজ চুরি করে পালাল কোনো চোর ? সে কোন্ চোর, যে কোনো চিহ্ন রেখে যায় নি !

"রাজ কোষ হতে চুরি ! ধরে আন চোর,
নহিলে, নগর পাল, রক্ষা নাহি তোর,
মুণ্ড রহিবে না দেহে।" রাজার শাসনে
রক্ষীদল পথে পথে ভবনে ভবনে
চোর খুঁজে খুঁজে ফিরে।—

হায়, একটা সুবিধা মতো বজ্রসেনকে খুঁজে পাওয়া গেল না যার ঘাড়ে চুরির অপবাদটা চাপান যেতে পারে। রাজা বড় কড়া। মিথ্যে সাক্ষ্যে মামলা খাড়া করা যাবে না।

অতএব, আবার গোয়েন্দার শরণ নিতে হলো। পায়ের ছাপ নেই, কোনো ধূলিকণা নেই—কাজেই শার্লক হোমসের আতস কাচ, ফুট রুল বা মাইক্রোস্কোপ কোনো কাজে এল না। ইজিচেয়ারে বসে পাইপটানা বুদ্ধিমান রহস্যভেদীর দরকার হলো—যে হঠাৎ বলে উঠবে, এতক্ষণে জানা গেছে, কে এই রহস্যের মেঘনাদ !

এই রহস্যভেদী পাউলি (Pauli)। তিনি এই চোরের আকৃতি-প্রকৃতি, আচার-ব্যবহার, এমন কি ওজন পর্যন্ত বললেন। সবশেষে জানা গেল এর নাম—নিউট্রিনো। তিনি বললেন, নিউট্রোন পরিবর্তিত হবে তিনটি পদার্থ কণায়,—একটি প্রোটন, একটি বিটাকণা বা ইলেকট্রন আর তৃতীয়টি নিউট্রিনো। কাজেই শক্তি যা পাওয়া যাবে তা এই তিনটি পদার্থ সৃষ্টি হবার পর যেটুকু ভর বাকি থাকবে তারই রূপান্তর। দেখা গেল, নিউট্রিনোর কোন চার্জ নেই ; ভর প্রায় শূন্য, 0·0005 Me এর চেয়েও কম। নিউট্রিনো কোনো বাধা মানে না। সব কিছু ভেদ করে চলে যাবে। তাকে দেখা যাবে না। সে আছে বোঝা যাবে শুধু একটি পরীক্ষায়।

বন্দুক ছুঁড়লে পেছনে ধাক্কা আসে। সেরকম এটম থেকে কণা বেরুলে পেছনে ধাক্কা আসবে। এই ধাক্কার বেগ বা মাপ বিটাকণার গতির উপর নির্ভর করবে। বিটাকণার গতি বেশী হলে ধাক্কার বেগ বেশী হবে, কম হলে হবে কম। পরীক্ষায় ধাক্কার বেগ সব সময় এক পাওয়া গেল। বিটাকণা যে বেগেই বেরিয়ে আসুক ধাক্কার মাপ এক। অর্থাৎ বিটাকণার সঙ্গে আরও একটা কণা বেরিয়ে আসবে—এদের দুজনের বেরিয়ে যাবার গতির যোগফল সব সময়েই এক। বিটাকণা জোরে বেরিয়ে গেলে, এই কণার বেগ হবে আস্তে এবং বিটাকণা আস্তে এলে, নতুন কণা যাবে জোরে।

রহস্যভেদী বললেন, এই চোর অতি চালাক। বিটাকণার গতির সঙ্গে মিল রেখে বাইরে আসে। এলিবাই এত নিখুঁত, যে কিছুতেই ভাঙা যায় না। শুধু একটা ভুল এই কণা করেছে, সামান্য একটি ভুল—বিটাকণার গতির সঙ্গে মিল রেখে চলতে গিয়ে পেছনের ধাক্কাটার ব্যাপারটা ভাবে নি ; এবং এতেই এ ধরা পড়ল। রহস্যভেদীর চোখকে ফাঁকি দিতে নিউট্রিনো পারবে না !

বিস্মিত, মুগ্ধ বিজ্ঞান চোরের হাতে হাতকড়া পরাল।

হিসেব-নিকেশ সাক্ষ্যসাবুদের ভেতর দিয়ে জানা গেল এই নিউট্রিনোর একটি ইতিহাস আছে। এ ছদ্মবেশ ধরতে পাকা, কাজেই অন্য কণার সঙ্গে বেমালুম মিশে

যেতে পারে।

কী ব্যাপার ? কী রকম ?

যেমন নিউট্রন—ভাঙলে পাচ্ছি প্রোটন, ইলেকট্রন আর নিউট্রিনো। অথবা প্রোটন, পজিটিভ ইলেকট্রন আর নিউট্রিনো মিলে দেবে নিউট্রন। দুটি বিপরীত মেরুর ইলেকট্রন দেবে শক্তির বিকিরণ, আবার শক্তির বিকিরণ থেকে পাওয়া যাবে ইলেকট্রন ও পজিট্রন। এগুলো হিসাবে জানা গেছে।

নিউট্রিনো গভীর জলের মাছ। ইলেকট্রনের সঙ্গে মিলে তৈরি করে ভারি ইলেকট্রন বা মেসন। নেগেটিভ ইলেকট্রন আর নিউট্রিনো তৈরি করবে নেগেটিভ মেসন; পজিটিভ ইলেকট্রন আর নিউট্রিনো করবে পজিটিভ মেসন এবং নিউট্রিনো, পজিটিভ আর নেগেটিভ ইলেকট্রন মিলে তৈরি করবে নিরপেক্ষ মেসন। এই নিউট্রিনো আর ইলেকট্রন মিলে এত বেশী অন্তর্শক্তি তৈরি হয় যে নতুন পদার্থটি—মেসনের—ভর তাদের উপকরণের চেয়ে অনেক বেশী। নিউট্রিনো তার লুকানো শক্তি আর ভর যে কোথায় লুকিয়ে রাখে বোঝা যাচ্ছে না।

যা হোক, মেসনও জালে ধরা পড়ল।

ভারি এটমের কেন্দ্রে যে প্রোটনের দল বা নিউট্রনের দল আছে, তাদের কে বেঁধে রাখে ? বৈদ্যুতিক শক্তি নয়; কারণ দুটি সমমেরুর প্রোটনে থকবে বিকর্ষণ। অন্য কোনো শক্তি নিশ্চয় আছে, যা এই নিউট্রন-প্রোটনকে আপন করে বেঁধে রাখবে।

এই নিউক্লিয়ার শক্তির কল্পনা করেন জাপানী বিজ্ঞানী ইয়ুকাওয়া (H. Yukawa)। 1935 সালে তিনি ঘোষণা করলেন, যে আরেক ধরনের কণা কেন্দ্রে আছে যারা আঠার কাজটা করবে। তাঁর ধারণায় নিউট্রন-প্রোটনের পরস্পরের রূপান্তর এই কণা শোষণ করে বা ত্যাগ করে হবে। অর্থাৎ কেন্দ্রে প্রোটন-নিউট্রন অনবরত পরিবর্তিত হচ্ছে; প্রোটন হচ্ছে নিউট্রন এবং নিউট্রন প্রোটন। আর এই পরিবর্তন হবে এই নতুন কণার ছোটাছুটির ফলে। মাকু ছুটে চলেছে এক দিক থেকে আরেক দিকে বুনটের দিকেরও পরিবর্তন হচ্ছে। যেদিকে মাকু সেদিকে বুনট; যেদিকে নতুন কণা সেদিকে চার্জ।

এই কণার নাম দেওয়া হলো মেসন।

সহজভাবে বোঝাতে গেলে, এটম আর এটমের যৌগ যেমন valancy বা যোজ্যতার উপর নির্ভর করে, নিউট্রন প্রোটনের যৌগও তেমনি মেসনের জন্যে।

1947 সালে এই মেসনের চিহ্ন পাওয়া গেল। নাম দেওয়া হলো পাই মেসন (π-meson)। এই পাই মেসন আর ইয়ুকাওয়ার কণার মিল পাওয়া গেল। অতএব ইয়ুকাওয়ারের ভবিষ্যৎ বাণী সত্য বলে প্রমানিত হলো।

পাই মেসনের আবার পজিটিভ নেগেটিভ এবং নিরপেক্ষ চার্জ পাওয়া গেল। সুতরাং এরা তিন জাতীয়। পজিটিভ আর নেগেটিভ পাই মেসনের ভর 273·1 Me ; নিরপেক্ষ পাই মেসনের ভর 264·3 Me। এদের স্পিন শূন্য। সুতরাং এরা বোসন।

পাই মেসনকে খুঁজতে গিয়ে, আরেক দল মেসন পাওয়া গেল, যারা ইয়ুকাওয়ারে

পূর্বাভাস পুরোপুরি মানছে না। এদের নাম দেওয়া হলো মিউ মেসন (μ-meson)। এরা আছে নেগেটিভ আর পজিটিভ চার্জে ; কিন্তু নিরপেক্ষ মিউ মেসন নেই। এদের ভর 206·8 Me। পাই মেসন ভেঙে হয় একটি মিউ মেসন এবং একটি নিউট্রিনো। আবার মিউ মেসন ভেঙে হবে একটি ইলেকট্রন বা একটি পজিট্রন এবং একটি নিউট্রিনো ও একটি এণ্টি-নিউট্রিনো। নিউট্রিনো এবং এণ্টি-নিউট্রিনোর উপস্থিতি মানে ভরের লয় বা বিনাশ এবং শক্তির আবির্ভাব।

পাই বা মিউ মেসনদের মধ্যেই মেসনদের ধারা শেষ হলো না। আরও পাওয়া গেল কা-মেসন (k-meson) এবং আরও অনেকে। প্রোটনের ভর আর ইলেকট্রনের ভরের মধ্যে এরা ছড়িয়ে আছে। এদের রূপান্তরের অবস্থাও জটিল। কেন যে এত ধরনের মেসন আসছে বোঝা যায় না। তবু এরা আসছে এবং হয়তো আরও আসবে।

এই মেসনিক লজ (mesonic lodge) মনে হচ্ছে এটমের উপকরণদের মধ্যে একটা বেশ বড় ফ্যাশনেবল ক্লাব বা প্রতিষ্ঠান।

আরও এক শ্রেণীর পদার্থ পাওয়া গেল যারা ওজনে প্রোটন-নিউট্রনের চেয়ে ভারি। এগুলো ভাঙলে পাওয়া যাবে প্রোটন অথবা নিউট্রন এবং মেসন কণা ; এদের বলা হলো হাইপারন।

হাইপারন কণা প্রথম দেখা গেল কসমিক-রে বা মহাজাগতিক রশ্মির গবেষণায়। সেটা 1947 সাল। একবার ধরা পড়ার পর হাইপারনরা দল বেঁধে হাজিরা শুরু করে। প্রথম দলের নাম লেমডা হাইপারন (λ-hyperon)। একে পাওয়া গেল নিরপেক্ষ চার্জে। এর পর এল সিগমা হাইপারন (σ-hyperon)। এরা বড় পরিবার ; তিন ভাগেই এল, পজিটিভ নেগেটিভ এবং নিরপেক্ষ চার্জে। একটা শুধু বিশেষত্ব দেখা গেল, সব কণার পজিটিভ এবং নেগেটিভ ভর যেখানে এক, সিগমা হাইপারনের এই বিভাগে তফাত আছে। পজিটিভ সিগমার ভর 2328 Me আর নেগেটিভের 2341 Me। নিরপেক্ষ সিগমার ভর 2328 Me অর্থাৎ পজিটিভ সিগমার ভরের সমান। এদের আবার এণ্টি বা বিপরীত কণা পাওয়া গেল। এরাও তিনদল।

এরপর ধরা পড়লো কৃসাই হাইপারনের (ξ-hyperon) দল। এখন পর্যন্ত এদের নেগেটিভ এবং নিরপেক্ষ কণার পাত্তা পাওয়া গেছে। এদের ভর 2582 Me।

হাইপারনরা ভেঙে যাবে। ভারি হাইপারন ভেঙে হবে হালকা হাইপারন আর মেসন। হালকা হাইপারন ভেঙে হবে প্রোটন অথবা নিউট্রন এবং মেসন।

নিউট্রন, প্রোটন এবং হাইপারনের দলকে বলা হয় বেরিয়ন (baryon) বা ওজনে ভারি। আর ইলেকট্রন, নিউট্রিনো আর মিউমেসনের দল হল লেপটন (lepton) বা ওজনে হালকা। অন্য মেসনরা মধ্যবিত্তের দল। কোনো বিশেষ দলেই এদের জায়গা নেই।

হরেকরকমবা শব্দটার মতো মূল তিনটি পদার্থ প্রোটন, নিউট্রন এবং ইলেকট্রনের সঙ্গে নিউট্রিনোর যোগ বিয়োগে নতুন কণার সৃষ্টি হচ্ছে। এদের আয়ু সীমিত। ধরা দিয়েও ধরা পড়ছে না।

এ যেন বিদ্যাসাগর মশায়ের বর্ণনা অনুযায়ী সেই বিখ্যাত সন্দেশের কল। একদিকে চিনি আর দুধ ঢালা হচ্ছে, আরেকদিক দিয়ে বেরিয়ে আসছে রাতাপি, আম, আতা, ইত্যাদি রকমফের সন্দেশ—চিনি দুধ আর পাকের রকমফেরে ; কিন্তু স্বাদে এরা এক !

শক্তি আর ভর মিলে-মিশে তৈরী করছে নানা নতুন পদার্থ—মেসন, লেপটন বা বেরিয়ন। মূলে শুধু আছে ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রিনো । হাজার আলোর দেয়ালির মধ্যে রয়েছে তিনটি উপকরণ ঃ প্রদীপ, সলতে আর তেল। আর আছে স্ফুলিঙ্গ—তেজ। একটি প্রদীপ থেকে হাজার প্রদীপ জ্বলে, কারো আলো বেশী, কারোর-বা কম।

তিন ভাগে পাওয়া গেল একুশ ঝাঁক কণা। কণারাজ্যে শিবঠাকুরের আপন দেশের একুশে আইনের প্রয়োগ হলো।

কাল ছিল এটম শুধু, আজ কণায় যায় ভ'রে।
বল দেখি তুই তেজ, হয় সে কেমন ক'রে॥
তরঙ্গের গতি নিয়ে করে ওরা যাওয়া আসা।
কী যে ঘটে কোথা থেকে ঝাঁক বেঁধে বাঁধে বাসা॥
পাঁচ জনা লঘু আর, আটে গুরু মধ্য।
তিন ঝাঁকে একুশে যে, দেখা দেয় সদ্য॥
ওরা কী গতি-ভরে ধরা দেয় ইশারায়।
দেখি না, তবুও খুঁজি ফেলে রাখা নিশানায়॥

কণাদের ভর ও জীবনকাল

কণা	ভর (মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট)	জীবনকাল (সেকেণ্ড
লেপটন শ্রেণী (পাঁচটি)		
ফোটন	0	স্থায়ী
নিউট্রিনো	0	ঐ
(+, −) ইলেকট্রন	0·5111006	ঐ
মিউ-মেসন	05·659	$2{\cdot}1983 \times 10^{-6}$
মেসন শ্রেণী (আটটি)		
(+, −) চার্জবাহী পাই-মেসন	139·578	$2{\cdot}608 \times 10^{-8}$
চার্জশূন্য পাই-মেসন	134·975	$0{\cdot}89 \times 10^{-16}$
(+, −) চার্জবাহী কে-মেসন	493·82	$1{\cdot}235 \times 10^{-8}$
চার্জশূন্য কে-মেসন	4976·76	Kos $= 0{\cdot}862 \times 10^{-10}$
(এটি Kos ও Kol-সমমিশ্রণ)		Kol $= 5{\cdot}38 \times 10^{-8}$
এটা মেসন	548·8	$2{\cdot}5 \times 10$ ^{19}
বেরিয়ন শ্রেণী (আটটি)		
প্রোটন	938·256	স্থায়ী (অন্তত $2 \times 10^{8}_{9}$ বছর)
নিউট্রন	939·55	932
লেমডা কণা	1115·60	$2{\cdot}51 + 10^{-10}$
সিগমা কণা (+)	1189·40	$0{\cdot}810 \times 10^{-10}$
সিগমা কণা (−)	1192·46	প্রায় $1{\cdot}0 \times 10^{-14}$
ওমেগা কণা	1672·4	$1{\cdot}3 \times 10^{-10}$
কসকেড কণা (চার্জবাহী)	1321·25	$1{\cdot}66 \times 10$ ^{10}
কসকেড কণা (চার্জশূন্য)	1314·7	$3{\cdot}03 \times 10^{-10}$

এটমের কেন্দ্রেই যত জটিলতা, যত ভার। ইলেকট্রনের নির্দিষ্ট কক্ষ আছে, হালকা চালে তরঙ্গভঙ্গে তারা ঘুরে বেড়ায়। যত ঝামেলা যত গোলমাল সব কেন্দ্রে। সেখানে মূলত আছে প্রোটন, যার চার্জ পজিটিভ, এবং নিউট্রন—যে নিরপেক্ষ। নিউট্রন ভেঙে প্রোটন, ইলেকট্রন এবং নিউট্রিনো পাওয়া যাবে; আবার প্রোটন নিউট্রনেতে রূপান্তরিত হতে পারে। এসব তথ্য জানা। প্রোটন ভারি, নিউট্রন প্রোটনের চেয়ে ভারি, তফাত মাত্র 2·5 Me। এই ভরের খানিকটা নিউট্রনের বিভাজনের সময় শক্তির রূপান্তরে পাওয়া যাবে। নিউট্রন-প্রোটন প্রোটন-প্রোটন অথবা নিউট্রন-নিউট্রনকে যে শক্তি আটকে রেখেছে তার তুলনায় বিভাজনে পাওয়া শক্তি খুবই অল্প। নিউট্রনকে তাই স্বাভাবিক অবস্থায় প্রোটনের সঙ্গে ঘর সংসার করতে হবে—কেন্দ্রের বাঁধন থেকে বেরিয়ে যাবার মত তথেষ্ট শক্তি তার নেই।

সমচার্জের প্রোটন এবং চার্জ নিরপেক্ষ নিউট্রন এদের একসঙ্গে বেঁধে রেখেছে কোন্ শক্তি? নিশ্চয় একটা আকর্ষণ।

বিভিন্ন ধরনের মানুষ একটা সঙ্ঘ গড়ে তোলে। তাদের একত্র হবার জন্য নানা আকর্ষণ আছে—আড্ডা খোশগল্প, তাস-পাশা, খেলাধূলো ইত্যাদি। এই আকর্ষণ কাজ করে সংযোজক শক্তি হিসাবে। এটমের কেন্দ্রেও এ ধরনের কোনো একটা সংযোজক শক্তি বা cohesive force কাজ করবে।

পদার্থের সব অবস্থাতেই এই শক্তি অল্পবিস্তর কাজ করে। এরই ফলে অণুগুলো আটকে থাকে। কঠিন পদার্থে এই শক্তি বেশী; তাই কঠিন পদার্থ জমাটি আড্ডার মতো সহজে ভাঙতে চায় না। বায়বীয় পদার্থে এই শক্তি কম; তাই এই জাতীয় পদার্থের অণুগুলি ছিটিয়ে থাকে, চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তরল পদার্থেও এই শক্তি কাজ করছে। এ আছে বলেই তরল পদার্থের অণুগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যায় না।

তরল পদার্থের অণুগুলো পরস্পরকে চারদিক দিয়ে টেনে রেখেছে। উপরের অণুগুলোর টান শুধু নীচের দিকে, টান উপরে নেই। এই কারণেই তরল পদার্থের অণুগুলো ছড়িয়ে যায় না। বাতাস নিয়ে তরল পদার্থের অণুগুলো বুদ্‌বুদ্ তৈরি করবে, টানটান হয়ে থাকবে, তবু ছড়িয়ে যাবে না। রবারের বেলুন আর বুদবুদের চেহারা আর স্বভাব এক। এই যে উপরের অণুর নীচের টান এর নাম surface tension (সার্ফেস টেনসন) বা উপরিতলের প্রসারণ। এরই ফলে উপরের অণু নীচের অণুর সঙ্গে মিলে-মিশে থাকবে। তরল পদার্থের উপরের অণুগুলোর টানটান অবস্থায় থাকা একটা বিশেষ ধর্ম।

তরল পদার্থের সঙ্গে মিল এনে বিজ্ঞানী বললেন, কেন্দ্রের উপকরণগুলো তরল পদার্থের অণু। কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস যেন ফ্লুয়িড। কণাগুলো ঐ অকঠিন নিউক্লিয়াস ফ্লুয়িডে তৈরি। ঐ ফ্লুয়িডের ঘনত্ব বা density খুব বেশী—জলের চেয়ে 24×10^{13} গুণ বা চব্বিশের পর তেরটা শূন্য দিলে যা হয়, তত গুণ বেশী। যার ঘনত্ব এত বেশী তার টান বা সারফেস টেনসন অনেক বেশী হবে। নিউক্লিয়ার ফ্লুয়িডের এই শক্তি জলের চেয়ে 10^{18} গুণ বা দশের পিঠে আঠরটা শূন্য দিলে যে রাশি পাব ততগুণ বেশী।

ঘনত্ব এত বেশী, এত বেশী টানের শক্তি, তা সত্ত্বেও উপকরণগুলো ফ্লুয়িডে তৈরি কঠিন পদার্থে নয়।

বিজ্ঞানী বললেন, নিউক্লিয়ার ফ্লুয়িডে বারি বিন্দুসম প্রোটন-নিউট্রন সমাজ।

এই বারি বিন্দুর উপমাটা বিজ্ঞানীদের পছন্দ হলো। তারা দেখলেন, এই বারি বিন্দু-গুলোর কতগুলোয় আছে চার্জ ঃ তারা পজিটিভ চার্জবাহী প্রোটন। সমচার্জের প্রোটন পরস্পর পরস্পরকে বিকর্ষণ করবে, তা সত্ত্বেও তারা কেন্দ্রে আটকা আছে ; তার কারণ, ঐ প্রচণ্ড টানের শক্তি। বিকর্ষণ কেন্দ্রকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলতে পারত ; অথচ তা হয় না, কারণ আকর্ষণের শক্তি সারফেস টেনসনের কাছে বিকর্ষণ শক্তি জব্দ।

দস্যি ছেলেরা গল্পের আকর্ষণে যেমন একত্র হয়ে চুপ করে থাকে, এক চার্জের কণা-গুলোও সারফেস টেনসনের টানে, আকর্ষণে একত্র হয়ে আছে।

তাহলে মেসনরা কী ? মেসনরাই তো সারফেস টেনসন বজায় রাখছে। তাদের ছুটোছুটির ফলেই তো দল টিঁকে আছে। গোলমাল বাঁধালে, সঙ্ঘ ভাঙার মুখে এলে কয়জন ছুটোছুটি, দূতিয়ালি করে, টানাটানি করে দল টিঁকিয়ে, দল ঠিক করে রাখে। দল, ভাঙার মুখে এলেও, ভাঙবে না।

সারফেস টেনসন যদি বেশী হয় তবে কেন্দ্র ভাঙবে না। বরং দুটো কেন্দ্র কাছে এলে এরা এক হয়ে একটা বড়-সড় কেন্দ্র তৈরি করতে পারবে। দু ফোঁটা জল মিলে যেমন একটা বড় ফোঁটা হয়, দুটি কেন্দ্র মিলে একটা বড় কেন্দ্র তৈরি করতে পারবে। একে বলা হয় একীকরণ বা ফিউসন (fusion)। আবার অন্যদিকে বৈদ্যুতিক বিকর্ষণ শক্তি যদি প্রবল হয়, তবে কেন্দ্র দুভাগ হয়ে ভেঙে যেতে পারে। ভাঙা কেন্দ্র দুটি দুদিকে বেরিয়ে যাবে। এই ভাঙার পদ্ধতিকে বলা হয় দ্বিধাকরণ বা ফিসন (fission)।

এটমের কেন্দ্র যেন একটা একান্নবর্তী পরিবারের কর্তার ব্যবহারিক আকর্ষণ বা রোজগারের শক্তি যথেষ্ট থাকলে ভেতরে ভেতরে যত আড়া-আড়িই থাক, পরিবারের সকলে মিলে-মিশে থাকবে। এক-দুজন অতিথি এলে কোনো অসুবিধা হবে না। চাই কি, চলতি ব্যবস্থাটার কিছু অদল-বদল করে, অতিথিটিকে জায়গা দিয়ে পরিবারভুক্ত করা যেতে পারে। কিন্তু যদি কোনো কারণে আকর্ষণ কমে যায়, তবে পরিবারের সভ্যদের মধ্যে শুরু হবে আড়া-আড়ির বহিঃপ্রকাশ, ঝগড়া-কাজিয়া। এই সময় বাইরের লোকের কান-ভাঙানিতে শেষ আকর্ষণটুকু ছিঁড়ে যায়। শুরু হয় বাড়ী জমি ভাগ এবং অবশেষে আলাদা হাঁড়ির বন্দোবস্ত।

টান-ভালবাসা-আকর্ষণই পরিবারকে বেঁধে রাখে। টান-ভালবাসার অভাব মানেই বিকর্ষণ।

আবারো দেখা যায়। মোটামুটি ছোট পরিবারের মধ্যে টানটা বেশী থাকে। পরিবার বড় হলেই মতভেদ, পার্থক্য দেখা দেবে। বড় পরিবার ভেঙে ছোট পরিবারে দাঁড়াবে।

একই ব্যাপার দেখা যায় এটমের কেন্দ্রে। পর্যায় চক্রের প্রথম অংশে, রূপোর আগের মূল পদার্থটি পর্যন্ত দেখা গেছে সারফেস টেনসনের টান বিকর্ষণের চেয়ে ঢের বেশী। এরা একান্নবর্তী পরিবারের মতো অতিথিবৎসল। একটা দুটো কেন্দ্রের জায়গা এখানে হবে। অতিথিকে গ্রহণ করে এরা নিজেকে নতুন ভাবে সাজিয়ে নেবে, তবু ভেঙে যাবে না। আবার রূপোর চেয়ে ভারি পদার্থগুলোর বিকর্ষণ শক্তি প্রবল। এইসব পরিবারের স্থায়িত্ব খুব দৃঢ় নয়। অতিথির আবির্ভাবে, বাইরের প্ররোচনায়, পরিবারটি দু'টুকরো হতে পারে।

রূপোর নীচের পদার্থগুলোর স্বভাব একীকরণের বা ফিউসনের। রূপোর উপরের পদার্থগুলোর স্বভাবে আছে দ্বিধাকরণ বা ফিসন। এই ফিউসন আর ফিসন—এদুটি দলের বাইরে আছে রূপো। এ যেন নিরপেক্ষ সন্ন্যাসী ; কোনো পারিবারিক বন্ধনের মধ্যে বাঁধা পড়ছে না। ফিসন-ফিউসন দু'দলের মধ্যেই এটি যোগ সেতু।

দুটি দল, দুটিই পরিবর্তিত হচ্ছে। একদল নতুন কেন্দ্রকে গ্রহণ করে নিজেরা নতুন করে সাজিয়ে উঠবে। অবাঞ্ছিত, অপ্রয়োজনীয়কে বিদায় করে নতুনকে গ্রহণ করে নতুন হয়ে উঠবে, ভেঙে যাবে না। আরেকদল নতুনের আবির্ভাবে দ্বিধাগ্রস্ত হবে, ভেঙে যাবে। দু'দলই অবস্থানের দিক দিয়ে অস্থির। একমাত্র স্থির পদার্থ রূপো।

সোনা নয়, নয় হীরা বা প্লাটিনাম। বিশ্বজগতে একমাত্র অপরিবর্তিত খাঁটি পদার্থ রূপো। 1939 সালে বিজ্ঞানী বোর এবং হুইলার রূপোর জয়গান গাইলেন।

কবি বা শিল্পী নিখুঁত রূপের খোঁজ করেন। আধুনিক বিজ্ঞানীরা দেখলেন, রূপোই একমাত্র নিখুঁত।

রূপো নিখুঁত রূপসী।

জীবন-ব্যবস্থা যখন সহজ সরল, একান্নবর্তী পরিবারের তখন উদয় হবে। যত জটিলতা বাড়বে, একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে পড়ে, পৃথগন্ন পরিবারের আবির্ভাব হয়।

দেখা গেল, এটমের কেন্দ্রে জটিলতা কম থাকলে ফিউসন ঘটবে, একীকরণ হবে। কেন্দ্রে জটিলতা যত বাড়বে, ফিসন বা দ্বিধাকরণ তত বাড়বে। কেন্দ্রে জটিলতা মানে প্রোটন এবং নিউট্রনের সংখ্যার সমতা হ্রাস পাওয়া, অথবা কেন্দ্রের আকার বড় হওয়া।

কেন্দ্রে প্রোটন নিউট্রন হবে, নিউট্রনেরা হবে প্রোটন। এই অবস্থার স্থিরতা তখনই আসবে যখন প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যা সমান হবে। কিন্তু নিউট্রন যদি বেশী থাকে, তবুও পদার্থটি মোটামুটি স্থির থাকবে। প্রোটন নিউট্রনের পরিবর্তনের ধারাটিকে একটুকু সাজিয়ে নিলেই গোলমালটা মিটে যাবে। সাজাবে মেসন। কিন্তু যদি নিউট্রন সংখ্যায় প্রোটনের চেয়ে ঢের বেশী হয়, তবে নিউট্রন প্রোটনের রূপান্তরের ধারাটা মানানসই ভাবে বজায় রাখা যায় না। বৈদ্যুতিক বিকর্ষণ শক্তি প্রবল হতে থাকে। নিউট্রনের সংখ্যা

প্রোটনের চেয়ে যতই বেশী হবে, পদার্থটির দ্বিধাকরণ প্রবৃত্তি ততই বাড়বে। নিউট্রন প্রোটনের সংখ্যার বিষমতা মানেই কেন্দ্রে অস্থিরতা। আবার, কেন্দ্রের আকার বড় হওয়া মানে, আকর্ষণ শক্তির ঘাটতি ; বিকর্ষণ বেড়ে যাওয়া।

এই অস্থির কেন্দ্রের ব্যবহার প্রথম নজর করেন রাদারফোর্ড। তেজস্ক্রিয় ধাতু তার জটিল কেন্দ্রের জন্য হারাচ্ছে বিটা কণা, আলফা কণা বা শক্তির সমর্থক গামা-রে। মূল কেন্দ্রটি প্রথমে হারায় একটি আলফা কণা বা হিলিয়ামের কেন্দ্র, অবশিষ্ট কেন্দ্রটি নিজের চার্জটিকে নিরপেক্ষ রাখার জন্য দুটি ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে একটি নতুন পদার্থে রূপান্তরিত হবে। নতুন পদার্থ আবার হারাবে আরও একটি আলফা কণা। অবশিষ্ট কেন্দ্র আবার চার্জটিকে নিরপেক্ষ করবে, ইলেকট্রন হারিয়ে অন্য নতুন ধাতুর কেন্দ্রে পরিবর্তিত হবে। এইভাবে ধাতুটির রূপান্তর চলবে, পরিশেষে তেজস্ক্রিয় ধাতুটি সীসা হয়ে মোটামুটি স্থির হবে। অস্থির তেজস্ক্রিয় পদার্থ রূপান্তরিত হবে আপাতস্থির সীসায়। ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম বা একটিনিয়াম—এই তিনটি তেজস্ক্রিয় পদার্থের রূপান্তরের শৃঙ্খলে একই ধারা। নতুন পদার্থ পরিবর্তিত হতে-হতে শেষ পর্যন্ত সীসায় এসে থামে। এই যে ফিসন—তেজস্ক্রিয় পদার্থের হিলিয়াম এবং নতুন পদার্থে ভাগ হয়ে যাওয়া—এটি সব কটি তেজস্ক্রিয় পদার্থের স্বাভাবিক ধর্ম। তেজস্ক্রিয় পদার্থের কেন্দ্রে অস্থিরতা বেশী, তার প্রকাশ দেদীপ্যমান। এখানে বৈদ্যুতিক বিকর্ষণ শক্তি সারফেস টেনসনের চেয়ে ঢের বেশী। স্বাভাবিক ভাবেই কেন্দ্র এখানে ভেঙে পড়ছে। এই ভাঙা আমাদের নজরে আসছে। রূপোর চেয়ে ভারি পদার্থগুলোও ভেঙে পড়ছে—আমাদের দৃষ্টিতে তা ধরা পড়ছে না। এই ভাঙার হার অতি ধীর। হয়তো এক শতাব্দীতে একটি বা দুটি অণু ভাঙবে। এরা ভাঙতে-ভাঙতে অবশেষে রূপোয় এসে স্থির হবে।

ফিসন বা দ্বিধাকরণ বলতে ভাবা হয় দুভাগ হয়ে যাওয়া। এই ভাগ বহু ভাবেই হতে পারে, কেন্দ্রটি শুধু দু'ভাগ বা বহুভাগ হতে পারে। কিন্তু সংখ্যায়নিক যুক্তি অনুযায়ী আলফা কণা ছেড়ে ভাগ হয়ে যাওয়াটা সহজ। মূল পদার্থটির ঠিক সমান দুটি অংশে স্বাভাবিকভাবে ভাগ হবার সম্ভাবনা কোটিতে গোটিক। অর্থাৎ একটি তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়ামের পিণ্ড প্রতি সেকেণ্ডে হাজার হাজার আলফা কণা ছাড়বে ; সেখানে ইউরেনিয়ামের একটি অণু-কেন্দ্রের সমানভাবে দু অংশে ভাগ হবার সম্ভাবনা কয়েক মিনিটে মাত্র একটি। 1919 সালে আলফা কণার ব্যবহার করে রাদারফোর্ড কৃত্রিম উপায়ে ধাতুর রূপান্তর ঘটালেন। এলুমিনিয়াম এবং আলফা কণার মিলন সিলিকনের একটি আইসোটোপ তৈরি করল। এই আইসোটোপটি আবার তেজস্ক্রিয়, তাই এর নাম হলো—রেডিও-সিলিকন।

কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ সৃষ্টির পদ্ধতি জানা হয়ে গেল।

কেন্দ্রকে ধাক্কা দিতে হবে। তাহলেই কেন্দ্র তার পলিসির নব-রূপায়ণ করবে—রাজনীতিতে এটি সহজবোধ্য সাধারণ প্যাঁচ। ধাক্কা দিলে, জোর আলোড়ন আন্দোলন গড়ে তুললে, একই প্রতিনিধিমণ্ডলী নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করবে ; দপ্তরের পুনর্বণ্টন হবে,

একটি দুটি নতুন মুখ দেখা যাবে, একটি বা দুটি পুরানো মুখের বিদায় হবে, কারো পদ বৃদ্ধি হবে। কেন্দ্র সমসাময়িকভাবে তেজীয়ান হবে। তারপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে তেজ হারিয়ে অলসমন্থর গতিতে গয়ংগচ্ছ ভাবে কাজ করে যাবে।

রাদারফোর্ডের রীতি একই সামাজিক বা রাজনীতিক পরিবর্তন এটমের কেন্দ্রে আনল। আলফা কণা এলুমিনিয়ামের কেন্দ্রে জোরে ধাক্কা দিল—কেন্দ্র আলফা কণাকে গ্রহণ করে নতুন করে সাজিয়ে নিল নিজেকে। পাওয়া গেল তেজীয়ান নতুন কেন্দ্র, নতুন পদার্থ। পদার্থটি তেজস্ক্রিয়। তেজ হারিয়ে আবার স্বাভাবিকভাবে নতুন পদার্থটি অতেজস্ক্রিয় পদার্থে রূপান্তরিত হবে।

একই পদ্ধতিতে নানান কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থের সৃষ্টি হলো। শুধু আলফাকণার পরিবর্তে ব্যবহার করা হলো চার্জবাহী কণা বা আয়ন। ধাক্কার জোর বাড়াবার জন্য তৈরি হলো নানাধরনের এক্সিলারেটার—সাইক্লোট্রোন, ইলেকট্রোস্টেটিক জেনারেটার বা লিনিয়ার এক্সিলারেটার।

আগে ছিল গুলতি দিয়ে ছোঁড়া গুলি। গাদা বন্দুক পার হয়ে গুলি ছোঁড়ার জন্য তৈরি হলো বড় কামান। বাধা যত বেশী হবে ভাঙবার জন্য প্রয়োজন তত বেশী বড় কামানের। এখানেও তাই। বাধা সারফেস টেনসনের, বাধা ইলেকট্রিক চার্জের। সুতরাং শক্তি বাড়ানো দরকার।

বারবাড়ির বাধা পেরিয়ে বাবুর কাছে অন্দরমহলে যেতে হলে অতিথির অনেক শ্রম দরকার। তাছাড়া বাবুর সাবেকি ব্যাপার ওলট-পালট করে নতুন করে সাজিয়ে অতিথি নিজের জায়গা নেবে; সেখানেও দরকার হবে অতিথির শক্তির।

এটমের কেন্দ্রটিকে না ভেঙে, দু'একটা অবাঞ্ছিত উপকরণ সরিয়ে নতুন করে নতুন প্যাটার্নে সাজাতে হলে অতিথি কণাটিকে শক্তিমান হতে হবে বৈকি!

কামান হলো। সুতরাং গোলা বাছাইয়ের দরকার হলো। গোলা কোন্‌টা ভাল যা লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না। দেখা গেল চার্জযুক্ত কণা কেন্দ্রের কাছাকাছি এসে আকর্ষণ-বিকর্ষণের ফলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে। সুতরাং চার্জহীন কণাই গোলা হিসাবে ভাল। নিউট্রনই ভাল গোলা। নিউট্রন দিয়ে আঘাত করলে কেন্দ্রকে নতুন ভাবে ভাঙা বা গড়া যাবে।

গড়া বা ভাঙা যাই হোক না কেন শক্তির আবির্ভাব হচ্ছে।

মূল পদার্থ যখন ভেঙে যাবে তখন তার কেন্দ্রের আঁটসাঁট বাঁধন ঢিলে হয়ে যাবে। যাকে সুবদ্ধ শক্তি বা binding energy বলা হয় তা বেরিয়ে আসবে। কেন্দ্রের একত্রীভূত ভর পৃথক পৃথক ভরে ভাগ হয়ে যাবে। কিন্তু এই পৃথক ভরগুলোর যোগফল একত্রীভূত ভরের চেয়ে সব সময়েই কম। কারণ কিছুটা ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে সুবদ্ধ শক্তি হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসবে।

দল গড়লে শক্তি। দল ভাঙলে শক্তির ঘাটতি হবে। আবার ব্যক্তিগত মতবাদের চেয়ে দলগত মতবাদের আওয়াজ বা ওজন বেশী, একক শক্তি যুক্ত হলে যে সম্মেলক শক্তি পাওয়া যায় তা অনেক বেশী ফলপ্রসূ। সুতরাং তার ওজন বেশী।

ফিসনের ফলে এই সম্মেলনের আলাদা অতিরিক্ত শক্তিরই বহিঃপ্রকাশ হবে। আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুযায়ী যে শক্তি পাব তা $E = mc^2$, এই সমীকরণটি দিয়ে লেখা যাবে।

রূপো থেকে হালকা পদার্থ কিন্তু সহজে ভাঙা যাবে না। এখানে শক্তি পজিটিভ নয়, এর বহিঃপ্রকাশ নেই। এখানে শক্তির শোষণ। সুবদ্ধ শক্তি এখানে নেগেটিভ। এই সব পদার্থগুলোকে ভাঙতে হলে প্রচণ্ড শক্তি বাইরে থেকে প্রয়োগ করতে হবে, তবেই এগুলো ভাঙবে। সুতরাং ভাঙলে আমরা নিউক্লিয়ার শক্তি পাব না। অথচ, পদার্থগুলোকে না ভেঙে যদি গড়তে চাওয়া হয়, তাহলে সুবদ্ধশক্তি বেরিয়ে আসবে। যদি এসব পদার্থ-গুলোর সঙ্গে দুএকটা নিউট্রনের মিল ঘটানো যায়, তবে হালকা পদার্থটির কেন্দ্রটি নতুন নিউট্রন নিয়ে ভারি হয়ে উঠবে। আঁটসাঁট হয়ে সাজিয়ে দাঁড়াবে নতুন পদার্থে, বেরিয়ে আসবে সুবদ্ধ শক্তি।

ফিসনে ভারি ধাতু ভেঙে হালকা হবে, পাওয়া যাবে সুবদ্ধ শক্তি। ফিউসনে হালকা ধাতু ভারি হয়ে গড়ে উঠবে, পাওয়া যাবে সুবদ্ধ শক্তি। ফিসনে পৃথক্ পৃথক্ ভরের যোগ-ফলের চেয়ে মূল সম্মেলক পদার্থটির ভরের ওজন বেশী। ফিউসনের সম্মেলক নতুন পদার্থটির ভরের ওজন মূল পদার্থগুলোর ভরের ওজনের যোগফলের চেয়ে কম। যেটুকু কম, সেটুকুই শক্তির রূপান্তরে পাওয়া যাচ্ছে।

ফিসনে দল ভাঙা। ফিউসনে নতুন করে সাজা। দুটি একসেরি দুধের বালতির চেয়ে একটি দু'সেরি বালতি ওজনে হালকা হতে পারে। এখানে জায়গার সাশ্রয়টাই বড় কথা। নতুন করে সাজানোটাই সুবিধাজনক। অপ্রয়োজনীয় এখানে পাত্রের ওজন। নতুন করে ভাঁড়ার সাজাতে গেলে অপ্রয়োজনীয় কিছু কিছু ফেলে দিতে হবে। ফিউসন নতুনভাবে সাজিয়ে রাখা। অপ্রয়োজনীয় কিছু বার করে দিতে হবে এখানে। সেটিই সুবদ্ধ শক্তি।

ফিউসনের ফলে এই শক্তিই আমাদের প্রাপ্তি।

নক্ষত্রজগতে যে তাপের সৃষ্টি, যে প্রচণ্ড শক্তির বহিঃপ্রকাশ আমরা সূর্যের মধ্যে দেখি, তা সবই ফিউসন পদ্ধতিতে পাওয়া। এখানে চারটি হাইড্রোজেনের কেন্দ্র এক হয়ে তৈরি করছে একটি হিলিয়ামের কেন্দ্র। একটি হিলিয়াম কেন্দ্রের ভরের ওজন চারটি হাই-ড্রোজেন কেন্দ্রের ভরের যোগফলের চেয়ে কম। এই যে ভরের লয়, তারই রূপান্তর ঐ শক্তি। ফিউসন পদ্ধতি শুরু করতে হলে দরকার প্রচণ্ড তাপের। স্বাভাবিক অবস্থায় হাইড্রোজেন কেন্দ্রগুলি মিলে মিশে হিলিয়াম কেন্দ্র গড়ে তুলবে না। যে শক্তি ভরের লয়ে পাওয়া যাবে, সেই শক্তিই তাপ সৃষ্টি করবে। তাপের ফলেই হাইড্রোজেন—হিলি-য়ামের রূপান্তরের শৃঙ্খলের ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে ; শক্তির বিকাশ ঘটবে। এখানেও সেই একই তত্ত্ব : $E = mc^2$।

তত্ত্ব পাওয়া গেল। এখন প্রয়োজন প্রয়োগবিধির।

সমস্যা হলো গোলা নিয়ে। আকাশে যখন ঝাঁক বেঁধে হাঁসেরা যায়, তখন ছররাগুলি ভাল, একটা না একটা ছররা কোনো না কোনো হাঁসকে মারতে পারবে। রাইফেলের

গুলিতে হাঁস মারতে হলে দরকার চাঁদমারির অভ্যাস, নয়তো ভাগ্য। নিউট্রন দিয়ে পদার্থের কেন্দ্রে আঘাত করতে চাইলে, চাঁদমারির অভ্যাস কাজে লাগবে না ; গোলা ও শিকার দুইই অতি ক্ষুদ্র কণা। সুতরাং ভাগ্যের চিন্তা শিকেয় রেখে দরকার হবে ছররা-গুলির বা একঝাঁক নিউট্রনের ধারা।

ব্যাপারটা কিন্তু সহজ নয়। একে নিউট্রন পাওয়া কঠিন, তার উপর নিউট্রনের ধারার কথা ভাবাটা প্রায় অসম্ভব, পাওয়াটা তথৈবচ। নিউট্রনের ধারা তৈরি করতে হলে, একটি পদার্থের সবকটি নিউট্রনকে কেন্দ্র থেকে ছাড়িয়ে আনতে হবে। অর্থাৎ একটি নিউট্রন কেন্দ্র থেকে ছাড়িয়ে আনবে কয়েকটি নিউট্রন, তারা আবার আনবে কয়েকটি। এরা আবার আনবে আরো কটি। এইভাবে নিউট্রন দিয়ে যদি নিউট্রন ছাড়ানো যায়, তবেই নিউট্রনের ধারা পাওয়া সম্ভব।

এ যেন পোস্টকার্ডের চেন গেম (chain game) খেলা। একজন লিখবে চারটি পোস্টকার্ড, প্রাপকেরা প্রত্যেকে লিখবে চারটি করে পোস্টকার্ড। নতুন প্রাপকেরা আবার লিখবে প্রত্যেকে চারটি করে। জ্যামিতিক প্রগতিতে এই হার বেড়ে যাবে।

এমন ব্যাপার যদি নিউট্রনের ধারা সৃষ্টিতে খাটানো যেতে পারত !

রোজ কত কী ঘটে, যাহা তাহা ;
এমন কেন সত্যি হয় না, আহা !

ঠিক এমনটিই হলো। একটি বিশেষ নিউক্লিয়ার প্রক্রিয়ার ফলে নিউট্রনের সংখ্যাবৃদ্ধির নিয়ম জানা গেল। 1938 সালে অটোহান এবং স্ট্রাসমান (Strassman) ইউরেনিয়াম কেন্দ্রের কৃত্রিম দ্বিধাকরণ বা ফিসনের ফলে আণবিক শক্তি পেলেন। ইউরেনিয়াম কেন্দ্রটি ভেঙে গেল। ভাঙা টুকরো দুটি ইউরেনিয়ামের চার্জের অর্ধেক নিয়ে বেরিয়ে গেল বিপরীত দিকে। সুতরাং, তারা আর টুকরো হলো না। তবু, প্রতিটি টুকরো থেকে পাওয়া গেল একটি করে নতুন নিউট্রন।

ইউরেনিয়াম কেন্দ্রের ভাঙা টুকরো দুটি চার্জ নিয়ে বেরিয়ে আসার পর অন্য এটম-গুলোর সংস্পর্শে এসে তার চার্জ হারাবে, গতিও ধীরে ধীরে কমে যাবে ; ভাঙা কেন্দ্রগুলো প্রায় স্থির হয়ে যাবে। এই সময়েই পাওয়া যায় নিউট্রন কণা। ফিসনের শক্তির ফলে যে নতুন নিউট্রন কণা পাওয়া গেল তারা আবার ইউরেনিয়ামের নতুন এটমের কেন্দ্রে ফিসন ঘটাতে পারবে। ফিসনের ফলে ভাঙা টুকরো দুটি প্রচণ্ড কম্পন দিয়ে বেরিয়ে আসে। এই কম্পন নির্ভর করবে ফিসনের শক্তির উপর। যে পদার্থ যত ভারি, ফিসনের শক্তি তার তত বেশী। পর্যায়চক্রের সংখ্যার উপর নির্ভর করবে ফিসনের শক্তি। আর এই ভাঙা টুকরোর কাঁপুনির ফলেই বেরিয়ে আসে নিউট্রন। অতএব ভারি পদার্থ মানেই, ফিসন থেকে নিউট্রন পাবার সম্ভাবনা বেশী। সোনা ভেঙে নিউট্রন না পাওয়া যেতে পারে ; কারণ সোনা ফিসনে যে শক্তি দেবে তা' টুকরোগুলো যথেষ্ট কাঁপাতে বা ঝাঁকাতে পারবে না, ফলে নিউট্রন বেরিয়ে আসতে পারবে না। আবার ইউরেনিয়ামের চেয়ে ভারি কোনো পদার্থ পাওয়া গেলে তার ফিসন থেকে পাওয়া শক্তি প্রচণ্ড হবে—নিউট্রনের

প্রাপ্তিও বাড়বে। শক্তি যত বেশী হবে, ততই নিউট্রন বেরিয়ে আসবে। এই নিউট্রন আবার নতুন ফিসন ঘটাবে—নতুন ফিসনে পাওয়া যাবে নতুন নিউট্রন।

অর্থাৎ মূল নিউট্রন থেকে পাওয়া যাবে একটি ফিসন এবং দুটি নিউট্রন ; এই দুটি নিউট্রন দেবে দুটি ফিসন ও চারটি নিউট্রন। এরা আবার দেবে চারটি ফিসন এবং আটটি নিউট্রন। চেন গেমের খেলাটা নিউট্রন খেলতে পারবে।

চেন গেমের খেলায় একটা অসুবিধা—কোনো প্রাপক তার পোস্টকার্ড না লিখতে পারে। সে যদি না লেখে তবে ধারাবাহিকতার শৃঙ্খল নষ্ট হবে। এখানেও কোনো নিউট্রন ফিসন ঘটাতে না পারে—নিউট্রনটি কেন্দ্রে সোজাসুজি আঘাত না করে হয়তো সামান্য আলোড়ন তুলে কেন্দ্রটিকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারে। ধারাবাহিকতা এখানেও নষ্ট হতে পারে।

দেখা যায়, নিউট্রন ভারি পদার্থগুলিতে বেশী ফিসন ঘটায়। এই ফিসনের হার ভারি পদার্থেই বেশী। অতএব নিউট্রন-ফিসনের ধারাবাহিক শৃঙ্খল স্বাভাবিক ভাবেই ভারি পদার্থগুলিতে বেশী কার্যকরী হবে। কিছু নিউট্রন কাজে লাগবে না। তবু যা পাওয়া যাবে তা' যথেষ্ট। আরও দেখা গেল, এই ধারাবাহিকতা ইউরেনিয়ামের আই-সোটোপ U_{235}-এ সব চেয়ে বেশী।

ইউরেনিয়ামে মূল পদার্থের ওজন 238, আইসোটোপটির ওজন 235। দুটিই এক সঙ্গে পাওয়া যায়। মিশেলের হার U_{238} যেখানে 99·3 ভাগ, U_{235} সেখানে পাওয়া যাবে মাত্র 0·7 ভাগ। ধাতু দুটি আইসোটোপ, অর্থাৎ রাসায়নিক গুণ ও বর্ণালি বিশ্লেষণে এক। তফাত শুধু ভরে বা এটমের ওজনে ; মিশেলে U_{235} পাওয়া যায় খুবই কম ; অথচ ফিসনে এরাই বেশী উদ্যোগী। অতএব চেষ্টা হলো U_{238} থেকে U_{235} পৃথক করা।

U_{238} আর U_{235}-এর তফাত শুধু ভরে, এইটুকু সম্বল করে এদের পৃথক করার চেষ্টা শুরু হলো।

দুটি সমধর্মী প্রায় সমান ওজনের পদার্থকে পৃথক করা সহজে যায় না। একটির ওজন আরেকটির ওজন থেকে মাত্র শতকরা 1·3 ভাগ কম। হাওয়ার দিকে শস্যকে ছড়িয়ে দিয়ে যেমনভাবে শস্য ঝাড়াই হয়, সেভাবে হাওয়ার মধ্যে পদার্থের অণুগুলোকে ছড়িয়ে দিলে হালকা পদার্থটি দূরে ভেসে আসবে। অথবা অণুগুলোকে জোরে ঘুরিয়ে দিলে কেন্দ্রোপসারী (centrifugal) শক্তির তফাত হবার দরুন হালকা আর ভারি পদার্থ পৃথক হবে। তৃতীয় পদ্ধতি হলো পদার্থ দুটির আয়ন যদি চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে যায় তবে তাদের ওজনের তফাত অনুযায়ী বিক্ষেপেরও তফাত হবে ; হালকা পদার্থের গতি পথ বেশী বাঁকবে, ভারি পদার্থের বাঁক হবে কম।

তিনটি পদ্ধতির যে কোনোটাই ধরা হোক না কেন, ওজনের তফাত এত কম যে, মাত্র একবারে পৃথকের কাজটা খুব বেশী সুবিধাজনক নয়। পৃথকীকরণের কাজটা বারবার করতে হবে। তবেই U_{235}-এর হারটা বাড়বে।

একঘেয়ে কষ্টসাধ্য কাজ, তবুও বিজ্ঞানীরা লেগে থাকলেন ; কারণ U_{235} সব পদার্থের তুলনায় ফিসন ঘটাতে ওস্তাদ। U_{238} আর U_{235}-এর হার যথাক্রমে 99·3 আর 0·7 ভাগ অর্থাৎ প্রায় প্রতি 142টি U_{238} এটমের হিসাবে একটি মাত্র U_{235} এটম পাওয়া যাবে। U_{228}-কে সরিয়ে না ফেলতে পারলে এটি যে নিউট্রনেকে বন্দী করে নেবে— ফিসনের হার কমে যাবে।

অন্য কোনো উপায়ে U_{235}-এর কার্যক্রম বাড়ান যায় কিনা ভাবা হলো।

দেখা গেল, নেউট্রনের সঙ্গে ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রের মিলনের একটা অলিখিত আইন আছে। নিউট্রন যদি দ্রুত আসে তবে ইউরেনিয়ামের আইসোটোপ দুটি সমানভাবে বন্দী করবে। অর্থাৎ নিউট্রন ধরা পড়বে 142টি U_{238} এটমে এবং একটি U_{235} এটমে। গতি যদি মাঝারি হয় U_{238}-এর বন্দী করার ক্ষমতা U_{235}-এর চেয়ে বেশী। আর গতি যদি ধীর হয় U_{235} তখন পরমোৎসাহে নিউট্রন বন্দী করে,U_{238}-এর হার কম।

ক্রিকেট খেলায় জুটির খেলোয়াড় ফাস্ট বোলারকে সমানভাবে পিটিয়ে খেলবে, শুধু একজন খেলোয়াড় বেশী বল খেলছে, সুয়িং বা মিডিয়াম ফাস্ট বলে জুটি একটু বেশী অসুবিধা ভোগ করছে, অন্য খেলোয়াড়টি তখন তাকে আগলে নিজেই বেশী বল খেলবে ; স্লো বলে ব্যাপারটা উল্টো। এখানে জুটি তার নিজের কোর্ট পেয়েছে, চুটিয়ে রাণ তুলবে অন্য খেলোয়াড়টি আপেক্ষিকভাবে কম বল খেলছে।

নিউট্রনকে ধরার ব্যাপারে আইসোটোপ জুটির ব্যবহার নিউট্রনের গতির পরিবর্তনের সঙ্গেই পরিবর্তিত হচ্ছে।

এই যে বিশেষ ধর্ম দেখা গেল, তার সার্থক ব্যবহার করলেন ফের্মি। তিনি দেখালেন, কতগুলো অণুর মধ্য দিয়ে যাবার সময় নিউট্রনের গতি হ্রাস পায়। ঐ সব অণুগুলি যেন গতিটির রাশ টানে। যে পদার্থগুলো নিউট্রনের গতির রাশ টেনে গতির হ্রাস ঘটায় তাদের নাম ফের্মি দিলেন নিয়ামক বা moderator। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা গেল ভারি জল, কার্বন বা বেরিলিয়ামের যৌগ পদার্থগুলো মডারেটার হিসাবে ভাল। সুতরাং ইউরেনিয়ামের পিণ্ডকে যদি এই মডারেটারের মধ্যে রাখা যায়, তবে গতিবান নিউট্রন মডারেটারের মধ্যে যাবার সময় তার গতি হারাবে, ধীর গতিতে যাবে। এ অবস্থায় U_{235} তাকে ধরতে পারবে, ফিসন হবে।

ফের্মি এই মডারেটার আর ইউরেনিয়ামের মিশেলটার নাম দিলেন স্তুপ বা পাইল (Pile)। ইংরেজি পাইল মানে চিতাও বোঝায়। এই চিতাতেই U_{235}-এর কেন্দ্র দু'খান হবার সম্ভাবনা বেশী। U_{235}-এর মৃত্যু ঘটবে।

আবার পাইল মানে স্তম্ভ, বড় ইমারত যার ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে। দেখা গেল কিছু U_{238} এই অবস্থায় কিছু কিছু নিউট্রন বন্দী করছে। নিউট্রন বন্দী করে U_{238} রূপান্তরিত হচ্ছে এক নতুন আইসোটোপ U_{239}-এ। U_{239} কিন্তু স্থায়ী পদার্থ নয় ; দুটি ইলেকট্রন ছেড়ে এটি একটি নতুন ভারি পদার্থে রূপান্তরিত হচ্ছে, যার নাম দেওয়া হলো প্লুটোনিয়াম ; এটমের ওজন 239 এবং পর্যায়ক্রমে এর স্থান 94-এর

কোঠায়। এই প্লুটোনিয়ামের ভেঙে ফেলার ধর্ম U_{235}-এর চেয়ে অনেক বেশী। অর্থাৎ প্লুটোনিয়ামের নিউট্রন-ফিসনের শৃঙ্খলের ধারাবাহিকতা U_{235}-এর চেয়ে ঢের বেশী।

আশ্চর্য ব্যাপার! যেখানে গতিবান নিউট্রন হার মানল, ধীরগতি নিউট্রন সেখানে ফিউসন পদ্ধতিতে নতুন পদার্থ প্লুটোনিয়াম তৈরী করল। প্লুটোনিয়াম আবার ভেঙে পড়ার জন্য তৈরী।

একই ব্যাপার দেখা গেল থোরিয়াম Th_{232}-এর বেলা ; নিউট্রন নিয়ে এর এটম নতুনভাবে সাজিয়ে উঠল U_{233} নামে ইউরেনিয়ামের আইসোটোপে। এরও ফিসন গুণ বেশী।

স্বাভাবিকভাবে যে সব পদার্থ পাওয়া যায় তার মধ্যে U_{235}-এর ফিসন গুণ সবচেয়ে বেশী। দেখা গেল, কৃত্রিম উপায়ে তৈরী ভারী ধাতুর ফিসন গুণ অনেক বেশী ; আঁটি থেকে জন্মানো আমগাছের চেয়ে কলম থেকে জন্মানো গাছের ফলন বেশী, স্বাদও ভাল। সেই একই ব্যাপার দেখা যায় ফিসনের ক্ষেত্রে। ইউরেনিয়াম, থোরিয়ামের চেয়ে কৃত্রিম ভারি ধাতু শক্তি সরবরাহ ব্যাপারে অনেক পটু, অনেক উপযোগী। শক্তির ইমারত দাঁড়িয়ে রইল পাইল পদ্ধতির উপর।

এইসব ঘটনা জানা গেল 1939 সালের মধ্যে। 1939 সালে যুদ্ধ বাধল। এটম থেকে যে শক্তি পাবার সম্ভাবনা ছিল, তা বিশ্বত্রাণে ব্যবহারের আগেই বিশ্বনাশের জন্য ব্যবহৃত হলো। 1940 সালে এটম বোমার কল্পনা তখনও দানা বাঁধেনি। মহাযুদ্ধে অক্ষ-শক্তি—জার্মানী, ইতালি আর জাপানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে 1942 সালে এটম বোমার কল্পনা দু'শিবিরেই শুরু হলো। বোর-ফের্মি স্বদেশ ছেড়ে এমেরিকা এসেছেন, এসেছেন আইনস্টাইন। এমেরিকা গভর্নমেণ্টের কাছে এটম বোমা বানাবার অনুমতি এঁরা চাইলেন। মুখপাত্রের একজন আইনস্টাইন। মার্কিন গভর্নমেণ্ট রাজি হলেন। বিজ্ঞানী ওপেনহাইমারের নেতৃত্বে শুরু হলো এটম বোমা তৈরীর গবেষণা। অবশেষে 1945 সালে আলামাস্ক মরুভূমিতে প্রথম এটম বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হলো।

বিজ্ঞানী সেদিন প্রথম দেখলেন সামান্য ইউরেনিয়াম-প্লুটোনিয়ামের বিস্ফোরণের কী ক্ষমতা—কী প্রচণ্ড শক্তি এরা এনে দিল। সে শক্তির প্রকাশ তাপে, আলোকে, প্রচণ্ড জ্যোতিতে।

> বিস্মিত, মুগ্ধ ওপেনহাইমার গীতার বিশ্বরূপ দর্শনের শ্লোক আবৃত্তি করলেন ঃ
> দিবি সূর্য সহস্রস্য ভবেদ্ যুগোপদুত্থিতা ॥
> যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্‌ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥
>
> (একাদশ অধ্যায়, দ্বাদশ শ্লোক)
>
> হাজার সূর্যের আলো একসাথে আকাশে যদি বা ভাতে।
> সেই মহাত্মার জ্যোতির তুলনা মিলিবে তাহারি সাথে ॥

রুদ্রের প্রসন্ন সুন্দর মুখ দেখার আগেই তার ধ্বংস-শক্তি চোখে পড়ল।

দুর্ভাগ্য এটমের! তার মঙ্গলকর রূপ মানুষের চোখে পড়ল না ; তার প্রলয়ঙ্কর

ধ্বংসকারী ক্ষমতা শক্তিমত্ত মানুষের কাছে হাতিয়ার হয়ে এল।

শক্তি পূজোর রাত্রে মঙ্গলের কামনায় ব্রতী না হয়ে মানুষ বাজী পোড়াতে মত্ত হয়ে রইল। জলন্ত তুবড়ির স্ফুলিঙ্গ দিগ্‌বিদিকে ছড়িয়ে রইল, বাতাসে ভেসে থাকল বারুদ-গন্ধ। জীবনকে আবাহন না করে বিজ্ঞানী সেদিন পঞ্চতামস ব্রতে ব্রতী হয়ে মৃত্যুরূপা মাকে আবাহন জানালেন।

শক্তির এই লেলিহান হিংস্রতা, আণবিক বিজ্ঞানীদের, তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীদের বিচলিত করে তুলল। আইনস্টাইন নিজেকে যেন গুটিয়ে নিলেন, সরিয়ে নিলেন।

তেজস্ক্রিয় রশ্মিতে অসুস্থ ফের্মি আত্মহত্যা করলেন।

বিজ্ঞান আত্মহননের মধ্য দিয়ে শুদ্ধ হয়ে উঠতে চাইল।

কথা শেষ

অজানাকে জানার জন্য, অচেনাকে চেনার জন্য, বিজ্ঞানের নিরুদ্দেশ যাত্রা। একটিই প্রার্থনা—আবিরাবির্ম এধি ! হে অপ্রকাশ, তুমি প্রকাশিত হও। অনেক জানা গেছে, অনেক চেনা হয়েছে ; তবু এখনও অগাধ বিশ্বলোক পড়ে রয়েছে—যা জানা হয় নি, যা চেনা যায় নি। এ যেন অসীমের গণিত ; অসীম থেকে অসীম বাদ দিলে অসীমই থাকবে। যা জেনেছে, যা চিনেছে তা বাদ দিলে যা থাকে তাও যে অসীম।

আইনস্টানই বললেন, বিশ্বভূবনে মানুষ জলের মধ্যে মাছের মত বেঁচে আছে। মাছ জানে না জলের খবর, মানুষও জানে না বিশ্বভুবনের রহস্য।

উপনিষদ্ জানাল, যশ্চায়স্মিন্নাকাশে তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষ সর্বানুভূঃ।

যে তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ সর্বানুভূ হয়ে আছেন তিনিই এক। সর্বানুভূ অর্থাৎ তিনি সব কিছুর অনুভব।

আইনস্টাইন জানতে চাইলেন, বিশ্বভুবনের শক্তির, সব রূপান্তরের নিয়ামক সেই একমাত্র সত্যকে সেই সত্য যে সর্বানুভূ—যা সবকিছু অনুভব করবে—সমস্তই তার অনুভূতির মধ্যে হবে।

সনাতন বিজ্ঞান আর কোয়াণ্টাম গতি-বিজ্ঞানের প্রভেদ শুধু একটি অক্ষরে, সেটি h—প্লাঙ্কের ধ্রুবক। সনাতন বিজ্ঞান আর আপেক্ষিকতত্ত্বে প্রভেদ একটি অক্ষরে, সেটি c—আলোর গতিবেগ। দুটি বীজ-অক্ষর, দুটি বীজমন্ত্র আধুনিক বিজ্ঞান জানাল। দুটি পথ দেখিয়ে মানুষকে জ্ঞানের রাজ্যে এগিয়ে নিয়ে গেল। তবু প্রশ্ন থাকে, সব উত্তর কি এই দুই বীজমন্ত্রে পাওয়া যাবে ? সব সমস্যার সমাধান এই দুটি বীজ-অক্ষর করতে পারবে কি। সমস্যার যে অন্ত নেই ; প্রতিটি জানার সঙ্গে বাড়ছে অজানার গণ্ডী।

জানা গেল এটমের উপকরণ। আর তার পরই সমস্যার পালা শুরু হলো।

উপকরণগুলির ভর চার্জের আসল প্যাটার্ন কি জানা যাবে ?

উত্তেজিত অবস্থা কি কণার রূপান্তর ?

সব উপকরণ কি একজাতীয় বা নির্দিষ্ট কয়েক জাতীয় কণায় তৈরি ?

কণারা চার্জের দিক দিয়ে কেন বিভিন্ন হবে ?

নেগেটিভ, পজিটিভ বা নিরপেক্ষ চার্জ সব কণাতে কেন থাকবে না ?

শক্তির রূপান্তর-তত্ত্ব কি সম্পূর্ণ জানা গেছে ?

দেশ-কালের মাত্রায় যে শক্তির প্রকাশ জানা যাচ্ছে, ইলেকট্রিক চার্জ কি দেশ-কালের মাত্রা দিয়ে বোঝানো যাবে ?

তাছাড়া, শক্তির যে বিভিন্ন রূপ দেখা যায়, তারা কি এক ?

প্রশ্নগুলি হয়তো বিভিন্ন ; তারা সব শেষ প্রশ্নটির যেন বিভিন্ন রূপ। এই শেষ প্রশ্ন

আইনস্টাইন নিজেকে করেছেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই প্রশ্নের উত্তর তিনি খুঁজেছেন ; শক্তির একটি মাত্র ক্ষেত্র আছে কি না জানতে চেয়েছেন।

কী সেই শক্তি ? বিজ্ঞান জানাল এরা চারটি শ্রেণীর—মাধ্যাকর্ষণ, বৈদ্যুতিক, চৌম্বক এবং নিউক্লিয়ার বা পরমাণু কেন্দ্রীয়।

মাধ্যাকর্ষণ আকর্ষণের শক্তি। বিশ্বভুবনের সব পদার্থ একটি আরেকটিকে আকর্ষণ করছে। নিউটনের সমীকরণ (যা আইনস্টাইনের সমীকরণেয় আসন্নরূপ) এই শক্তিকে জানাবে—

$$F = G\frac{mm'}{d^2}$$

m এবং m' বস্তু দুটির ভর। d তাদের মধ্যকার দূরত্ব এবং G মাধ্যাকর্ষণের ধ্রুবক। F হলো বল, সেই শক্তির ফলাফল।

বৈদ্যুতিক আকর্ষণ লেখা যাবে একই পদ্ধতিতে—

$$F = C\frac{qq'}{d^2}$$

q কোন বস্তুর নেগেটিভ চার্জের পরিমাণ, q' অন্য বস্তুর পজিটিভ চার্জের পরিমাণ, d তাদের মধ্যেকার দূরত্ব এবং C একটি ধ্রুবক সংখ্যা। নিউটনের মতো কুলম্ব্ (Coulamb) এই নিয়মের ব্যাখ্যাকার—তাই এই সমীকরণটি কুলম্বের সমীকরণ নামেই পরিচিত।

তৃতীয় শক্তি চৌম্বক আকর্ষণের ; লেখা হবে—

$$F = K\frac{MM'}{a^2}$$

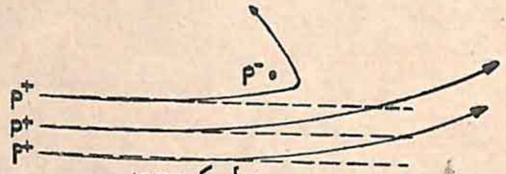
এখানে M চুম্বকের উত্তর মেরুর শক্তির পরিমাপ, M' দক্ষিণ মেরুর শক্তির পরিমাপ, d মেরু দুটির দূরত্ব এবং K আরও একটি ধ্রুবক যা G বা C থেকে ভিন্ন।

এই তিনটি শক্তির মধ্যে একটি সাদৃশ্য আছে—তিনটিরই সমীকরণের চেহারা এক। বৈসাদৃশ্য আবার পাওয়া যায়। মাধ্যাকর্ষণ শুধু আকর্ষণ, বিদ্যুৎ-চুম্বক ক্ষেত্রে আছে আকর্ষণ, আছে বিকর্ষণ। বিকর্ষণের গণিতের সমীকরণ একভাবেই লেখা হবে—

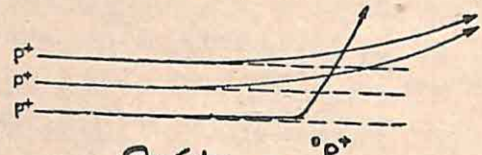
$$F = C\frac{qq'}{d^2} \quad \text{বা} \quad F = K\frac{MM'}{d^2}$$

আকর্ষণের ফলে একটি পদার্থ অন্য পদার্থের আকর্ষণ-ক্ষেত্রে এসে তাকে পরিভ্রমণ করে পরাবৃত্তের পথে বেরিয়ে যাবে। অন্য পদার্থটি আকর্ষিত পদার্থের পরাবৃত্তাকার পথের ফোকাসে বা নাভিতে থাকবে। বিকর্ষণের ফলে বিকর্ষিত পদার্থটি অন্য পদার্থটিকে পরিভ্রমণ করবে না ; কাছাকাছি আসার আগেই পরাবৃত্তের পথে বিকর্ষিত হবে। আকর্ষণের টানে একটি পদার্থ আরেকটি পদার্থের কাছে এসে তাকে পার হয়ে পরবৃত্তের পথে যাবে। বিকর্ষণে পদার্থটি দ্বিতীয় পদার্থকে পার হয়ে যাবে না। তার আগেই সরে যাবে।

এই যে পথের বিকৃতি এ তথ্য আমরা বিশ্বভুবনের গতিতে দেখেছি, দেখেছি ধূমকেতুর গতিতে, বা প্রোটনের ছড়িয়ে যাওয়ায়, গাইগার মার্সডেনের পরীক্ষায়। শক্তির তিনটি সমীকরণই তথ্যের থেকে প্রাপ্ত। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তিনটি সমীকরণ পাওয়া গেছে ; দেখা গেছে, প্রকৃতির নিয়মের রাজত্বে এই তিনটি বিশেষ-নিয়ম।



আকর্ষনের পথ



বিকর্ষনের পথ

মূল কোনো তত্ত্ব থেকে এই তিনটি নিয়মকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা বিজ্ঞানীদের আজকের সমস্যা। এঁরা বললেন সব নিয়মই বিশেষ কয়েকটি সাধারণ নিয়মের অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে পাওয়া যাবে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যে শক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্র পাওয়া যায় তারা একটি শক্তির ক্ষেত্রের রূপান্তর। সেই পরমশক্তির নিয়ম দিয়ে এই শক্তিগুলিকে বোঝা যাবে। এই হোলো একীভূত ক্ষেত্রের তত্ত্ব unified field theory।

বিদ্যুৎ আর চুম্বকের ক্ষেত্রের একাত্মতা বিংশ শতাব্দীর মাঝেই প্রমাণিত হয়েছে। বাকি রয়েছে মাধ্যাকর্ষণ আর নিউক্লিয়ার শক্তি। মাধ্যাকর্ষণ জানা জিনিস ; নিউক্লিয়ার শক্তিটা কী ?

ইলেকট্রনের চার্জ মাপা হয়েছে, চার্জ $1{\cdot}602 \times 10^{-19}$কুলম্ব্। ভরও মাপা হয়েছে এদের ; $9{\cdot}1083 \times 10^{-31}$ কিলোগ্রাম। এসব মাপ-জোক 1900 সালের মধ্যেই শেষ। আর 1900 সালে প্লাঙ্ক জানালেন তার ধ্রুবক h এর মূল্য ; h মানে $6{\cdot}625 \times 10^{-34}$ জুল সেকেণ্ড। কণাদের কৌণিক ভরবেগের স্পিন মাপতে গিয়ে দেখা গেল এরা $\frac{h}{2\pi}$ এর গুণিতকে আসছে। পাই (π) একটি ধ্রুবক, প্রায় $3{\cdot}142\ldots$বা $\frac{22}{7}$-এর সমান। আরও একটা মাপ জানা গেল—হিলিয়ামের দুটো প্রোটনের মাঝের দূরত্ব 10^{-15} মিটার।

মাপে সবই ছোট। অথচ গতিতে প্রচণ্ড, সেখানে এদের মাপ আলোর গতির অনুপাতে। আকারে ছোট, ওজনে খাট, গতিতে বেশী, এই অণুদের জগতে দর্জিদের ফিতের মাপ ইলেকট্রনের ভর আর চার্জ আর প্রোটনের দূরত্ব নিয়ে গড়া হলো। ছোট জগতে ছোটখাটো মাপ।

দেখা গেল, প্রোটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি 10^{-34} নিউটন। মাধ্যাকর্ষণের ধ্রুবক G-এর মান 7×10^{-11} $\frac{\text{নিউটন (মিটার)}^2}{\text{(কিলোগ্রাম)}^2}$।

মধ্যাকর্ষণ শক্তি খুবই কম। কাজেই কেন্দ্রে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কাজ করছে বটে, তবে তাদের কোনো ঘটাপটা নেই।

আরও একটা মাপ বিজ্ঞানীরা ধরলেন ; প্রোটনদের দূরত্ব 10^{-15} মিটার। এখানে এরা দিব্যি আছে। ওদের পৃথক করতে হলে অর্থাৎ দূরত্বটা 10^{-15} মিটারের চেয়ে বাড়াতে গেলে যে শক্তি দরকার হবে তার মাপ 10^{-19} জুলস। এই মাপের নাম দেওয়া হলো এক ইলেকট্রন ভোল্ট বা ev।

কুলম্বের নিয়মে ধ্রুবক C-এর মান জানা গেছে। এর মূল্য 9×10^9 $\frac{\text{নিউটন (মিটার)}^2}{\text{(কুলম্ব)}^2}$। দুটি কণার মধ্যে যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষমতা বিদ্যুৎ-চুম্বক শক্তির। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির 10^{36} গুণ বেশী। অঙ্কের হিসাবে একে লেখা যাবে—

$$F=C\frac{qq'}{d^2}=9\times10^9\frac{(1\cdot6\times10^{-19})^2}{(10^{-15})^2}=2\cdot3\times10^2 \text{ নিউটন।}$$

মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পাওয়া গিয়েছিল মাত্র 10^{-34} নিউটন। অতএব বিদ্যুত-চুম্বকশক্তি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির চেয়ে 10^{36} গুণের চেয়েও বেশী। এত যেখানে শক্তি সেখানে ত্বরণ বা গতির পরিবর্তন অনেক বেশী হবে? কত বেশী?

প্রোটনের ভর জানা গেছে $1836Me$ অর্থাৎ প্রোটনের ভর $1836\times9\cdot1\times10^{-31}$ $=1\cdot7\times10^{-27}$ কিলোগ্রাম।

ত্বরণকে গণিতের নিয়মে লেখা যায় $F=ma$; F যেখানে বল, m ভর এবং a হচ্ছে ত্বরণ বা acceleration।

সুতরাং, $a=\frac{F}{m}$

অথবা $\frac{2\cdot3\times10^2}{1\cdot7\times10^{27}}=1\cdot4\times10^{29}$ $\frac{\text{মিটার}}{\text{(সেকেণ্ড)}^2}$

কী প্রচণ্ড এই ত্বরণ। মাধ্যাকর্ষণের ত্বরণের চেয়ে 10^{28} গুণ বেশী। মুহূর্তে এ পার হয়ে যাবে অনন্ত পথ। শুধু এই ত্বরণের কালমাত্র $10^{\ 22}$ সেকেণ্ড—এই সময়েই প্রোটন দুটি যা তফাত হতে পারবে এবং ত্বরণের হ্রাস পাবে।

এই যে বিদ্যুৎ-চুম্বকশক্তি, অণু-জগতে, প্রোটনের ক্ষেত্রে এ বিকর্ষণ শক্তি। প্রোটন পৃথক হচ্ছে না ; এই প্রচণ্ড বিকর্ষণ শক্তি থাকা সত্ত্বেও হচ্ছে না! হয় না, হচ্ছে না। কারণ আরও একটা প্রচণ্ডতর শক্তি কাজ করছে, যা বিকর্ষণকে জব্দ করছে। সেটাই নিউক্লিয়ার শক্তি।

তিমিকে খায় তিমিঙ্গিল, তিমিঙ্গিলকে খায়, তিমিঙ্গিলগিল। তেমনি অণুর জগতে মাধ্যাকর্ষণ জব্দ বিদ্যুৎ-চুম্বকের বিকর্ষণের কাছে, বিকর্ষণ জব্দ নিউক্লিয়ার আকর্ষণের কাছে।

শুধু এই নিউক্লিয়ার শক্তির টানাটানির গণ্ডীটা খুবই অল্প জায়গায়। প্রোটন-প্রোটনের দূরত্ব সামান্য বাড়ালেই শক্তি কমে যাবে। এইশক্তির হ্রাস $\frac{1}{r^2}$—এর উপর নির্ভর করছে না। ব্যাপারটা অনেক জটিল।

অল্প দূরত্বের দৌড়বাজ সব শক্তি খরচ করছে একশ মিটার দৌড়াতে ; বেশীদূর পাল্লার দৌড় দৌড়াতে হলে তার সময়ের মাপ ঠিক থাকবে না। দূরত্ব যত বাড়বে দৌড়ের দ্রুততা ততই হ্রাস পাবে। এই হ্রাসের হার ঠিক সহজ গাণিতিক নিয়ম দিয়ে মাপা যাচ্ছে না। নিউক্লিয়ার শক্তির ব্যাপারে একই পদ্ধতি খাটছে।

আবার একটা নিয়ম নজরে আসে। এই যে অল্প দূরত্বের মধ্যে যে প্রচণ্ড শক্তি কাজ করছে, যাকে গুরু অন্তঃক্রিয়া বা strong inter-action বলা যাবে, তার উলটোটাও ঘটছে একই অণুর জগতে। পাই-মেসন আর প্রোটন-নিউট্রনের জগতে এই অন্তঃক্রিয়া কাজ করছে। টানের ফলে কণাগুলো বাঁধা পড়ে আছে। গুরুমশায়ের দৃষ্টির প্রভাবে পোড়োরা সব শান্ত হয়ে আছে। গুরুমশায় বড় কড়া।

তবু এই কড়া দৃষ্টির মাঝখানে, ক্ষুদে ক্ষুদে পোড়োরা ডেস্কে-বেঞ্চে চুপিচুপি নাম খোদাই করে, কাটাকুটি খেলে, পেনসিলের শিস ভাঙে। অর্থাৎ ছোট খাটো ভাঙচুরের কাজটা চুপেচাপে ধীরে ধীরে ঘটতে থাকে। অণুর জগতেও একই ব্যাপার। উপকরণগুলো ধীরে ধীরে ভেঙে পড়বে লেপটন বা হালকা ওজনের কণাগুলোর দলে—ইলেকট্রন, মিউমেসন আর নিউট্রিনোর নানা মিলের নানা গুচ্ছে। এই অতি ধীর শক্তির ফলে কা-মেসন স্বাভাবিক ভাবেই ভাঙবে মিউ-মেসন আর নিউট্রিনোতে—শুধু সময়ের ফারাকে। এই শক্তিকে বলা হয় লঘু অন্তঃক্রিয়া বা weak inter-action।

শক্তিরও রকম ফের হলো। জাঁদরেল হলো নিউক্লিয়ার বা গুরু অন্তঃক্রিয়া। তারপর একে একে আসবে বিদ্যুৎ-চুম্বকশক্তি, লঘু অন্তঃক্রিয়া এবং মাধ্যাকর্ষণ।

সবচেয়ে আগে জানা গিয়েছিল মাধ্যাকর্ষণ, সেই দাঁড়াল সবার শেষে। প্রাইমারি স্কুল হাইস্কুলে পরিণত হলে কড়া গুরুমশায় জুনিয়ার টিচার হয়েই থাকবেন। মাধ্যাকর্ষণ অণুর জগতে জুনিয়ারতম শিক্ষক।

আবার নিউক্লিয়ার-শক্তি অবিনাশ। এর বিনাশ নেই, আছে পরিবর্তন। পরিবর্তন ভরের, কিন্তু চার্জ অপরিবর্তনীয়। কণাগুলির যে স্থির-ভর বা স্থির-শক্তি মাপা হবে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে ভাঙাগড়া স্থির হবে। কণা ভেঙে পাওয়া যাবে নতুন কণা। নতুন কণার সৃষ্টি নির্ভর করবে মূল কণাটির কৌণিক ভরবেগের উপর, স্থির-শক্তি আর স্থির-ভরের উপর।

মূলকণা আর নতুন কণাদের কৌণিক ভরবেগের হ্রাস-বৃদ্ধি অপরিবর্তনীয়। অপরি-

বর্তনীয় মূলকণা আর নতুন কণাদের স্থির-শক্তির হিসাব, এবং অপরিবর্তনীয় মূলকণা আর নতুন কণাদের চার্জের হিসাব।

আবার বেরিয়ন কণা ও বেরিয়ন কণার মিলে পাওয়া যাবে বেরিয়ন কণার দলই। লেপটন-লেপটনের মিলনে পাওয়া যাবে লেপটন।

শক্তির বিনাশ নেই, আছে রূপান্তর—এই তত্ত্ব অণুর জগতে পাওয়া গেল।

তাপ, আলো, চুম্বক, বিদ্যুৎ, মাধ্যাকর্ষণ বা নিউক্লিয়ার সব শক্তিই একটি বিশেষ ক্ষেত্রের আসন্ন ফল হিসাবে পাওয়া যেতে পারে। যতদিন যায় বিজ্ঞানের জানার পরিধি বেড়ে চলেছে—ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা থেকে বিশাল নক্ষত্র-জগৎ সব কিছুই জানার জগতে পা রেখেছে। মাধ্যাকর্ষণ বিশাল নক্ষত্রের গতি বোঝাতে সক্ষম, অথচ কোয়াণ্টাম গতিবাদের তত্ত্বে একে খাটানো যায় না। শক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোয়াণ্টাম গতিবিজ্ঞান ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে, কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের ব্যাখ্যায় কোয়াণ্টাম দিশেহারা। মাধ্যাকর্ষণ শুধু আকর্ষণ। নিউটন বলেছেন, দূরের পদার্থের ক্রিয়া মাধ্যাকর্ষণে ধরা যাবে। অজানা লোকের, অসীম দূরত্বের ক্রিয়া কী ভাবে জানা যাবে, নিউটনের তত্ত্বে তা বোঝা যায় নি। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্ব দূরত্বের নির্দিষ্ট সীমা ভেঙে দিল।

যা সাধারণ ভাবে বাস্তব ক্ষেত্রে মাপা যায়, ধরা যায়—যেমন, তাপ, চাপ, গতি ইত্যাদি—তারই জ্ঞানের উপর বিজ্ঞানের তত্ত্ব গড়ে উঠেছিল। অভিজ্ঞতার ফলে জ্ঞান—তাই বিজ্ঞান, এ ছিল এক যুগের ব্যাখ্যা। অভিজ্ঞতার জগতের সীমা ছোট ; অভিজ্ঞতার বাইরেও জ্ঞান আছে। একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বকে অভিজ্ঞতা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না। বিজ্ঞান এখানে দর্শনের ক্ষেত্রে পৌঁচেছে।

নিউক্লিয়ার শক্তি দেখা গেছে শুধু বৈদ্যুতিক নয়, আরও বেশী কিছু। তাকে সারফেস টেনসন বলা হয়েছে, বলা হয়েছে কোনো আকর্ষণের শক্তি, যা বৈদ্যুতিক বিকর্ষণ শক্তিকে জব্দ করতে পারবে। প্রশ্ন উঠল, এই শক্তি যা প্রোটন বা নিউট্রনকে এক সঙ্গে বেঁধে রেখেছে সেটি কি তাদের দূরত্বের উপর নির্ভর করবে? মাধ্যাকর্ষণ আর বিদ্যুৎ-চুম্বক ক্ষেত্রে দেখা গেছে এ শক্তি নির্ভর করে $\frac{1}{d^2}$-এর উপর। এই একই ধারা নিউক্লিয়ার সমীকরণে পাওয়া যাবে কিনা সেটাই হলো সমস্যা।

ফিসনে যখন কেন্দ্র দুভাগ হয়ে পড়ে, দেখা যায়, ভাগদুটি বিকর্ষণের ফলে দুদিকে সরে যায়। হালকা পদার্থে ফিসন নেই। ভারী পদার্থে বিকর্ষণ শক্তি বেশী ; হালকা পদার্থে আকর্ষণ বেশী। অন্যভাবে দেখা যায়, হালকা কেন্দ্র আকারে ছোট, কণাদের মধ্যেকার দূরত্ব কম ; সেখানে আকর্ষণ কাজ করবে। ভারি কেন্দ্রের আকার বড়, কণাদের মধ্যেকার দূরত্বও বেশী ; সেখানে বিকর্ষণ-শক্তি প্রবল। এই তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে নিউক্লিয়ার শক্তির পরিবর্তনের তফাতটা খুবই অল্প জায়গায় হচ্ছে—কেন্দ্রের আকারের উপরেই। আকর্ষণ-বিকর্ষণের পরিবর্তন রূপেপের পরমাণুর দুদিকে। আবার নিউক্লিয়ার-শক্তির হ্রাস—কণাদের মধ্যেকার দূরত্বের উপর নির্ভর করলেও, এটির হ্রাস

অনেক দ্রুত। $\frac{1}{d^2}$-এর সমীকরণে একে লেখা যাচ্ছে না, হয় তো এটি $\frac{1}{d^3}$ বা অন্য কিছু।

কণাগুলির পরস্পরের অন্তঃক্রিয়া (inter-action) কোথাও কম, কোথাও বেশী।

মেসনকে কণা বলা হয়েছে ; মেসন কি নিউক্লিয়ার-শক্তির ক্ষেত্রে কোনো স্তরের অবস্থা ? তাদের আকর্ষণ অতি প্রচণ্ড, বিকর্ষণের ধারাকে এরা জব্দ রাখে। মেসন পরিবারে এরা পাই-মেসন (π-meson) নামে পরিচিত। মিউ-মেসন (μ-meson) অন্তঃক্রিয়ায় কণাগুলি স্বাভাবিকভাবে ক্ষয় হবে। এই ক্ষয়ের হার নিউক্লিয়ার কণাগুলির সময়ের মাপ অনুযায়ী অতি ধীর।

নিউক্লিয়ার শক্তিতে আছে গুরু অন্তঃক্রিয়া বা লঘু অন্তঃক্রিয়া ; গুরু অন্তঃক্রিয়া যে বেঁধে, রাখে. লঘু অন্তঃক্রিয়া যা ক্ষয় আনে।

উপকরণ	বেরিয়ন সংখ্যা	আইসোটোপিক স্পিন	strangeness number কৌলীন্য প্রবর সংখ্যা
পাই মেসন	0	1	0
কাফ্‌ফা মেসন (+)	0	$\frac{1}{2}$	+1
কাফ্‌ফা মেসন (−)	0	$\frac{1}{2}$	−1
প্রোটন, নিউট্রন (নিউক্লিয়ন)	+1	$\frac{1}{2}$	0
এন্টি-নিউক্লিয়ন	−1	$\frac{1}{2}$	0
লেমডা হাইপারন	+1	0	−1
এন্টি-লেমডা হাইপারন	−1	0	+1
সিগমা হাইপারন	+1	1	−1
এন্টি-সিগমা হাইপারন	−1	1	+1
ক্সাই হাইপারন	+1	$\frac{1}{2}$	−2
এন্টি-ক্সাই হাইপারন	−1	$\frac{1}{2}$	+2

অন্তঃক্রিয়ার রীতিনীতি বা নিয়ম-ধর্ম এখনও সম্পূর্ণ বোঝা যায় নি।

নিউক্লিয়ার শক্তি পাওয়া গেছে, তবু জানা যায় নি, মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রে বা তড়িৎ-চুম্বক ক্ষেত্রের মতো নিউক্লিয়ার-ক্ষেত্র আছে কিনা। গতি এবং ভরের বিশৃঙ্খলায় মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পাই, তড়িৎ ও চুম্বক ক্ষেত্র থেকে পাচ্ছি তড়িৎ-চুম্বক শক্তি। অন্তঃক্রিয়ার ফলেও শক্তি পাওয়া যাচ্ছে। অঃন্তক্রিয়া কি নিউক্লিয়ার ক্ষেত্রের বিশৃঙ্খলা থেকে সৃষ্টি ?

বস্তুতে-বস্তুতে, চার্জে-চার্জে, চুম্বক কণায়-কণায় অন্তঃক্রিয়া ঘটছে, পাওয়া যাচ্ছে শক্তি। নিউক্লিয়ার কণাদেরও অন্তঃক্রিয়া পাওয়া যাচ্ছে। মাধ্যাকর্ষণে আছে আকর্ষণ, তড়িৎ-চুম্বক ক্ষেত্রে আছে আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ। আর নিউক্লিয়ার-শক্তিতে আছে গুরু এবং লঘু অন্তঃক্রিয়া। এই যে শক্তির বিভিন্ন রূপ পাওয়া গেল, তারা কি এক ? তারা কি বিভিন্ন ? অথবা তারা একটি অপরটির সমধর্মী, সমাত্মীয় ?

শক্তির অবিনাশ-তত্ত্ব আমরা জেনেছি। আবার এও দেখেছি নিউক্লিয়ার-শক্তির উপকরণগুলি একটি আরেকটির সঙ্গে মিশে নতুন কণা, নতুন পদার্থ সৃষ্টি করছে অথবা ভাঙছে। এই ভাঙা বা গড়া, এও অবিনাশত্ব প্রমাণ করছে। নিউট্রিনো ও ইলেকট্রন মিলে গড়ছে মেসন—মেসন ভাঙবে তার উপকরণে ; গামা-রে সৃষ্টি করছে পজিট্রন ও ইলেকট্রন, আবার ইলেকট্রন ও পজিট্রন ভেঙে তৈরি করে গামা-রে। সৃষ্টি বা লয়, এরও একটা নিয়ম আছে। উপকরণগুলি সকলের সঙ্গে মিলবে না। যাতায়াত, ভাব-ভালবাসা থাকলেও বিয়ের ব্যাপারে মেল-বন্ধনের খোঁজ হবে। অনুলোম মিলনই ঘটবে, প্রতিলোম বিবাহ এটমের সংসারে নেই। উপকরণের ক্ষয়ে কিন্তু এক রীতি পাচ্ছি না। বল্লালী রীতির মতো উপকরণগুলিতে রইবে মেল-বন্ধনের প্রবর সংখ্যা (strangeness number)। পর্যায় রীতি অনুযায়ী এদের কৌলীন্য স্থির হবে। নতুন পদার্থ গঠনে প্রয়োজন হবে মেল-বন্ধনের প্রবর সংখ্যার হিসেব। ক্ষয় মানেই তো পতিত—সেখানে এই হিসেব লাগে না।

এই মিলের দুর্গমতা ভেবে বিজ্ঞানী কবি বললেন,—

A Pi meson said to a mu
Don't go with those hyperons, you
Have a weak inter-action
Feel no strange attraction
And they are strange particles, too.

পাই ডেকে বলে, শোন ওরে মিউ মেসন
যাস নে ওদের কাছে যারা হাইপারন।
লঘু অন্তঃক্রিয়া তোর
সইবি কি টান জোর ?
বস্তু হিসাবে তারা অতি অদ্ভুতম্‌।

তবু কটি উপকরণ পাওয়া যায়। এরা ব্রাত্য, এদের মেল-বন্ধনের সংখ্যা পাওয়া

যায় না। এরা ফোটন, গ্রেভিটন ; এরা নিউট্রিনো, ইলেকট্রন বা মিউ-মেসন। মেল-বন্ধনের ধারায় কেন এদের আনা যাচ্ছে না ? কৌলীন্য বিশেষ গুণ। কী সেই গুণ যা মেল-বন্ধনের মধ্যে আসছে ? কী-বা সেই দোষ যা কিছু উপকরণকে ব্রাত্য করবে ?

দেশ আর কাল এই চতুর্মাত্রার জগতে আরো নতুন মাত্রার কথা ভাবা হলো—চার্জ এবং প্রবর সংখ্যা। চতুর্মাত্রা আনে আকর্ষণ। চার্জ আনবে আকর্ষণ বিকর্ষণ ; মেলবন্ধন আছে, তাই আসবে অন্তঃক্রিয়া।

অথবা এই বিশ্বভুবনের কোথাও আরেক জগৎ আছে, মাধ্যাকর্ষণ যেখানে আকর্ষণ নয়, বিকর্ষণ। লেবরেটরিতে বিপরীত বস্তুকণা যেমনভাবে পাওয়া গিয়েছিল, সেই বিপরীত মাধ্যাকর্ষণকে জানলে মানুষ একদিন এই জগতে সেই একই শক্তি তৈরি করতে পারবে। হয়তো জাগতিক-মহাজাগতিক সব পদার্থের সব উপকরণ জানা গেলে জানা যাবে মেল বন্ধনের সঠিক রীতি কী। বিজ্ঞান এটা বিশ্বাস করে। বিজ্ঞান জানে খুঁজতে-খুঁজতে পরশমণি পাওয়া যায়, ছাই উড়িয়ে পাওয়া যায় অমূল্য রতন। শেষের উত্তর কোথায় আছে জানা নেই, তাকে খোঁজাই তো আনন্দ ;

শুয়ে থাকা মানে কলিকাল। উঠে বসলে আসে দ্বাপর। দাঁড়ালে পরে ত্রেতা। আর চললেই পাওয়া যাবে সত্য। অতএব চল, চল।

বিজ্ঞান মানেই চরৈবেতি।

ক. অর্ধজীবন (Half Life)

রাদারফোর্ড তেজস্ক্রিয় পদার্থের ক্ষয়ের পরিমাণ অর্ধজীবন দিয়ে মেপে ছিলেন। একটা নির্দিষ্ট সময়ের শেষে দেখা যায় তেজস্ক্রিয় পদার্থের ক্ষয় দাঁড়ায় অর্ধেকে, একই সময় পর দেখা যাবে ক্ষয় দাঁড়াবে যা আছে তার অর্ধেক। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় t-এর পর তেজস্ক্রিয় পদার্থটীর তেজ ক্ষয়ে দাঁড়াবে $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{16}$ ইত্যাদি।

রাদারফোর্ড অঙ্ক দিয়ে এটি বোঝালেন। ধরা যাক কোনো পদার্থ প্রতি সেকেণ্ডে 256টি আলফা কণা ছাড়ে। এর অর্ধজীবন সময় যদি 5 দিন হয় তবে এটি 5 দিন শেষে ছাড়বে 128টি কণা প্রতি সেকেণ্ডে, 10 দিন শেষে 54টি, 15 দিনের পর 32টি, 20 দিনের পর 16টি ইত্যাদি।

খ. আইসোটোপ (Isotope)

একই গুণের পদার্থগুলি ওজনে আলাদা হলেও সোডি তাদের পর্যায়চক্রের একই কোঠায় রাখলেন ; এক কোঠার একগুণের ও ভিন্ন ওজনের পদার্থগুলির নাম দিলেন আইসোটোপ বা সমাবস্থান। সোডি মৌলিক পদার্থের আইসোটোপ নিয়ে কাজ করেছিলেন। পরে কৃত্রিম উপায়ে দ্রুতগামী নিউট্রনের আঘাতে বা তেজী প্রোটনের সংঘর্ষে রেডিও আইসোটোপ তৈরি করা গেল। এদের ব্যবহারে চিকিৎসা-জগতে নতুন দিক খুলে দিয়েছে। সাধারণ কোবাল্টের ওজন 59, আর কৃত্রিম উপায়ে তৈরি রেডিও কোবাল্টের ওজন 60। এই আইসোটোপটি থেকে যে শক্তি পাওয়া যায় তা 2·5 মিলিয়ন ভোল্ট এক্স-রের সমান। কাজেই এ ধরনের আইসোটোপ ক্যানসার (cancer) বা কর্কট রোগের চিকিৎসায় খুবই উপযোগী।

গ. নতুন সমীকরণ

নিউক্লিয়ার শক্তির সমীকরণে এটমদের লেখা হয় তাদের ওজন আর এটমিক নম্বর দিয়ে। যেমন ধরা যাক অক্সিজেন, একে লেখা হবে $^{16}_{8}\mathrm{O}$ এইভাবে অর্থাৎ এর ওজন 16 আর এটমিক নম্বর 8 ; এখান থেকে সহজেই আমরা বুঝতে পারি, অক্সিজেনের আছে 8টি প্রোটন, 8টি নিউট্রন এবং 8টি ইলেকট্রন।

আলফাকণা মানে পজিটিভ চার্জের হিলিয়াম। একে লেখা হবে $^{4}_{2}\mathrm{He}$; বিটাকণা মানে ইলেকট্রন। একে লেখা হয় ($-^{0}_{1}\mathrm{e}$) এই ভাবে। নিউট্রন হলো $^{1}_{0}\mathrm{n}$। প্রোটন মানে হাইড্রোজেনের কেন্দ্র। অর্থাৎ $^{1}_{1}\mathrm{H}$।

ঘ. এটমের রূপান্তর

রাদারফোর্ড নাইট্রোজেন পরমাণুকে আলফা কণা দিয়ে আঘাত করে পেয়েছিলেন অক্সিজেনের একটি আইসোটোপ। সমীকরণে এটি লেখা হবে ঃ—

$$^{14}_{7}N + ^{4}_{2}He \rightarrow ^{17}_{8}O + ^{1}_{1}H$$

(নাইট্রোজেন + আলফাকণা)→(ভারী অক্সিজেন + প্রোটন)

রাদারফোর্ডের পর চাডউইক (Chadwick) এ ধরনের অনেক নতুন পদার্থ আলফা-কণার আঘাতে পেলেন, পেলেন নতুন পদার্থ আর দ্রুতগামী প্রোটন।

এ ধরনের একটি পরীক্ষা করেন, ককৃরফট (Cockroft) ও ওয়ালটন (Walton)। তাঁরা লিথিয়াম কেন্দ্রে যখন একটি দ্রুতগামী তেজী প্রোটন দিয়ে আঘাত করলেন, তখন দেখা গেল কেন্দ্রটি ভেঙে দুটি আলফা কণায় রূপান্তরিত হলো। এটাই এটম ভাঙার প্রথম পরীক্ষা। সমীকরণটি এই ঃ

$$^{7}_{3}Li + ^{1}_{1}H \rightarrow ^{4}_{2}He + ^{4}_{2}He$$

ঙ. ফিসন (Fission) ও ফিউসন (Fusion)

ফিসনকে বলা হয়েছে দ্বিধাকরণ আর ফিউসন একীকরণ। কোনো পদার্থের কেন্দ্রে যদি নিউট্রন বা এ জাতীয় পদার্থ দিয়ে আঘাত করা যায় তবে কেন্দ্রটি দুটি ভাগে ভাগ হয় আর পাওয়া যায় শক্তি। 1939সালে অটো হান ও স্টাসমান ইউরেনিয়াম 235-কে নিউট্রনের আঘাত দিয়ে পেলেন দুটি পদার্থ, বেরিয়াম ও ক্রিপটন। তাছাড়া খানিকটা শক্তি ; অটো ফিশ (Otto Frisch) এ ঘটনার নাম দিলেন নিউক্লিয়ার ফিসন।

এটিকে লেখা হবে ঃ

$$^{235}_{92}U + ^{1}_{0} \rightarrow ^{236}_{92}U \rightarrow ^{144}_{56}Ba + ^{90}_{0}Cr + 2.^{1}_{0}n + \text{শক্তি}$$

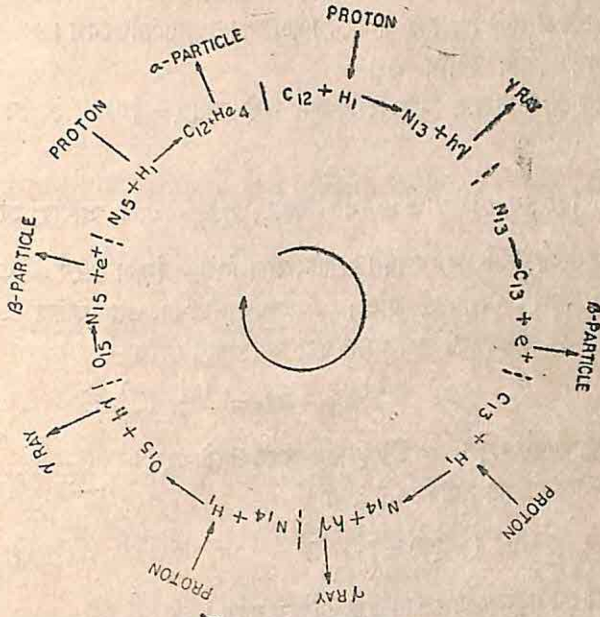
একটি ইউরেনিয়ামের কেন্দ্র ভেঙে পাওয়া গেল দুটি নিউট্রন। এরা আবার দুটি ইউরেনিয়ামের কেন্দ্র ভেঙে চারটি নিউট্রন দেবে ইত্যাদি।

ফিউসন মানে একীকরণ অর্থাৎ কয়েকটা এটম মিলে একটি বড় এটম হবে আর পাওয়া যাবে শক্তি। চারটি হাইড্রোজেন এটম মিলে পাওয়া যাবে একটি হিলিয়াম এটম। হিলিয়ামের ওজন কিন্তু চারটি হাইড্রোজেন এটমের ওজনের চেয়ে কম। যেটা ঘাটতি, সেটাই শক্তি।

সূর্যের কাছ থেকে যে অফুরন্ত তাপ আর আলোক শক্তি পাচ্ছি তা কিন্তু ফিউসনের ফলে। একে বলা হয় কার্বন-চক্র (carbon cycle)। মজার কথা, এই তত্ত্বটি দুজন পদার্থবিদ্ বেথ (H. Bethe) ও ভিৎসাকের (C. Weizsacker) একই সঙ্গে প্রকাশ করেন। এই চক্রের শৃঙ্খলটি নিচে দেওয়া হলো। একটা সাধারণ কার্বন আর চারটি প্রোটন বা হাইড্রোজেনের কেন্দ্রের ব্যবহারের ফলে পাওয়া গেল সেই সাধারণ কার্বন আর একটি আলফা কণা ও প্রচণ্ড শক্তি।

ছবি থেকে দেখা যাচ্ছে একটি কার্বন C_{12} অণু একটি প্রোটনের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে

একটি হালকা নাইট্রোজেনের আইসোটোপ তৈরি করবে আর খানিকটা শক্তি গামা-রে মারফত ত্যাগ করবে। দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার N_{13} পরমাণুটি একটি বিটা কণা ছেড়ে ভারি



সৌর তাপ শৃঙ্খল

কার্বন C_{13} তৈরি করবে। C_{13} আবার আরেকটি প্রোটনের সংঘাতে সাধারণ নাইট্রোজেন N_{14} তৈরি করবে আর আগের মতো খানিকটা শক্তি গামা-রে'র পথে ছাড়বে। এই নাইট্রোজেন আরেকটি প্রোটনের সংস্পর্শে লঘু অক্সিজেনO_{15} তৈরি করবে। এখানেও আবার আমরা গামা-রে শক্তি পাব। O_{15} একটি বিটা কণা ছেড়ে আবার N_1 নাইট্রোজেন তৈরি করবে। N_{15} আরেকটি প্রোটনের সংঘাতে তৈরি করবে সাধারণ কার্বন C_{14} আর একটি আলফা কণা। অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিতে চারটি প্রোটন একটি আলফা কণা তৈরি করছে আর আরও পাচ্ছি তিনটি অংশে গামা রে'র মারফত শক্তি আর দুটি অংশে বিটাকণা। সূর্যেও জ্বালানি হিসাবে কয়লা বা কার্বনের ব্যবহার হচ্ছে।

চ. অনিশ্চয়তাবাদ (Principle of Uncertainity)

কোয়ান্টাম-তত্ত্বে দেখা গেল কণাগুলোর সঠিক অবস্থান নিখুঁতভাবে মাপা যায় না—খানিকটা অনিশ্চয়তা থেকে যায়। এ সূত্র হাইসেনবার্গ প্রচার করলেন। একটা কণা খানিকটা এলাকার মধ্যে যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে—ঠিক কোথায় থাকবে সেটা জটিল অঙ্কেও পাওয়া শক্ত। অনেকটা হ য ব র ল'র গেছোদাদার ঠিকানা বার করার

মতো। গেছোদাদা রাণাঘাট থেকে তিব্বত এই সোয়াঘণ্টার পথে 'যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে। একবার গেছোদাদাকে পেলে আর অনিশ্চয়তা থাকে না। কণারাও তাই— এদের ভাবতে হবে খানিকটা ছড়িয়ে থাকা তাড়িৎ-তরঙ্গের হিসেবে। একটি কণা যেন একটি ছুটেচলা ঢেউ। তার গতিবেগ ঢেউয়ের চূড়োর গতিবেগ।

ছ· আলফা ও বিটা কণার ক্ষয়

আলফা কণাকে লেখা হয়েছে ^4_2He ভাবে আর বিটা কণা ($-^0_1e$)। যে কোনো এটমকে লেখা যাবে—

$^{z+n}_{z}X$ হিসেবে, যেখানে z এটমের নম্বর ; সুতরাং এটা আবার হবে প্রোটনের সংখ্যা আর n হলো নিউট্রনের সংখ্যা। প্রোটন আর নিউট্রন মিলে দেবে X এটমটির ভর। $z+n$-কে সংক্ষেপে z_1 লিখতে পারি ; z_1 হলো পূর্ণসংখ্যা, এর কোনো ভগ্নাংশ নেই।

এটি যদি একটি আলফা কণা ছাড়ে তবে সমীকরণে দেখি—

$$^{z_1}_{z}X - ^4_2He = ^{(z_1-4)}_{(z-2)}X$$

অর্থাৎ পর্যায়-চক্রে নতুন পদার্থটি দুঘর পেছনে হটে যাবে।

বিটা-কণা হারানোর সমীকরণটি হলো—

$$^{z_1}_{z}X - (-^0_1e) = ^{z_1}_{(z_{+1})}X$$

বিটা হারালে নতুন কণা পর্যায়-চক্রে এগিয়ে যাবে।

জ· নতুন মৌলিক পদার্থ

পরীক্ষাগারে নতুন পদার্থ সৃষ্টি করা নিউট্রনের আঘাতে সম্ভব হয়েছিল। ইউরেনিয়ামের পর আমরা প্লুটোনিয়াম পেয়েছিলাম। ইউরেনিয়াম আর প্লুটোনিয়ামের মাঝখানে একটা ক্ষণস্থায়ী পদার্থ পাওয়া গিয়েছিল। যার নাম দেওয়া হলো নেপচুনিয়াম। এছাড়া আরও নতুন পদার্থের সৃষ্টি সম্ভব হলো। ইউরেনিয়ামের চক্র সংখ্যা 92। এর পরের পদার্থগুলোর কতকগুলো হলো—

93 নেপচুনিয়াম (*Np*),	94 প্লুটোনিয়াম (*Pu*)
95 এমেরিকিয়াম (*Am*),	96 কুরিয়াম (*Cm*)
97 বার্কেলিয়াম (*Bk*),	98 কেলিফোর্নিয়াম (*Cf*)
99 আইনস্টাইনিয়াম (*Es*)	100 ফের্মিয়াম (*Fm*)
101 মেণ্ডেলিভিয়াম (*Mv*),	102 নোবেলিয়াম (*No*)
103 লরেন্সিয়াম (*Lw*),	104 কুরচেটোভিয়াম (*Ku*)

মেণ্ডেলিয়ভের Periodic Table নিয়ে পালা শুরু হয়েছিল। Table মানে সারণী অর্থাৎ তার আকার চৌকো বা আয়তক্ষেত্রের। আধুনিক কালে এই টেবিল—গোল। এটমরা গোলটেবিল বৈঠকে বসেছে—পর্যায় সারণী তাই শেষকালে দাঁড়ালো পর্যায়চক্রে। এটমের ওজন মাপা হলো কার্বনের ওজন ধরে—অর্থাৎ কার্বনের ওজন 12 এই হলো মূল।

আধুনিক পর্যায়চক্র

IA	IIA	IIIB	IVB	VB	VIB	VIIB	VIII	VIII	VIII	IB	IIB	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	INERT GASES
1 H Hydrogen 1.0079																1 H Hydrogen 1.0079	2 He Helium 4.0026
3 Li Lithium 6.941	4 Be Beryllium 9.0218											5 B Boron 10.811	6 C Carbon 12.011	7 N Nitrogen 14.0067	8 O Oxygen 15.9994	9 F Fluorine 18.9984	10 Ne Neon 20.179
11 Na Sodium 22.9898	12 Mg Magnesium 24.305											13 Al Aluminium 26.9815	14 Si Silicon 28.086	15 P Phosphorous 30.9738	16 S Sulphur 32.06	17 Cl Chlorine 35.453	18 Ar Argon 39.948
19 K Potassium 39.098	20 Ca Calcium 40.08	21 Sc Scandium 44.9559	22 Ti Titanium 47.90	23 V Vanadium 50.944	24 Cr Chromium 51.996	25 Mn Manganese 54.9380	26 Fe Iron 55.847	27 Co Cobalt 58.9332	28 Ni Nickel 58.71	29 Cu Copper 63.546	30 Zn Zinc 65.38	31 Ga Gallium 69.72	32 Ge Germanium 72.59	33 As Arsenic 74.9216	34 Se Selenium 78.96	35 Br Bromine 79.904	36 Kr Krypton 83.80
37 Rb Rubidium 85.467	38 Sr Strontium 87.62	39 Y Yttrium 88.909	40 Zr Zirconium 91.22	41 Nb Niobium 92.9064	42 Mo Molybdenum 95.94	43 Tc Technetium 98.9062	44 Ru Ruthenium 101.07	45 Rh Rhodium 102.9055	46 Pd Palladium 106.4	47 Ag Silver 107.868	48 Cd Cadmium 112.40	49 In Indium 114.82	50 Sn Tin 118.69	51 Sb Antimony 121.75	52 Te Tellurium 127.60	53 I Iodine 126.9045	54 Xe Xenon 131.30
55 Cs Cesium 132.9054	56 Ba Barium 137.34	* 57 La Lanthanum 138.9155	72 Hf Hafnium 178.49	73 Ta Tantalum 180.9479	74 W Wolfram 183.85	75 Re Rhenium 186.2	76 Os Osmium 190.2	77 Ir Iridium 192.22	78 Pt Platinum 195.09	79 Au Gold 196.9665	80 Hg Mercury 200.59	81 Tl Thallium 204.37	82 Pb Lead 207.2	83 Bi Bismuth 208.9804	84 Po Polonium (209)	85 At Astatine (210)	86 Rn Radon (222)
87 Fr Francium (223)	88 Ra Radium 226.0254	† 89 Ac Actinium (227)															

* Lanthanum Series

58 Ce Cerium 140.12	59 Pr Praseodymium 140.9077	60 Nd Neodymium 144.24	61 Pm Promethium (145)	62 Sm Samarium 150.4	63 Eu Europium 151.96	64 Gd Gadolinium 157.25	65 Tb Terbium 158.9254	66 Dy Dysprosium 162.50	67 Ho Holmium 164.9304	68 Er Erbium 167.26	69 Tm Thulium 168.9342	70 Yb Ytterbium 173.04	71 Lu Lutetium 174.97

† Actinium Series

90 Th Thorium 232.0388	91 Pa Protactinium 231.0359	92 U Uranium 238.029	93 Np Neptunium 237.0482	94 Pu Plutonium (244)	95 Am Americium (243)	96 Cm Curium (247)	97 Bk Berkelium (247)	98 Cf Californium (251)	99 Es Einsteinium (254)	100 Fm Fermium (257)	101 Md Mendelevium (258)	102 No Nobelium (255)	103 Lw Lawrencium (256)

ঝ. লঘু-গুরু অন্তঃক্রিয়া

প্রোটন আর নিউট্রনের পরিবর্তন, পাই-মেসনের দূতিয়ালিতে ঘটে ; প্রোটন একটি পাই-মেসন ত্যাগ করে নিউট্রন হয় আর নিউট্রন পাই-মেসন নিয়ে হয় প্রোটন। এই ভাবে ক্রমাগত প্রোটন আর নিউট্রন, রূপান্তরিত হয়ে চলেছে ; ফলে একটি প্রোটন গড়ে অর্ধেক সময় থাকে প্রোটন, বাকিটা সে নিউট্রন। আবার নিউট্রনেও হরেদরে এক ব্যাপার। প্রোটনের তফাত 10^{-15}মিটার আর পাই-মেসনের গতিবেগ আলোর সমান বা সেকেণ্ডে 10^{8} মিটার। এই বেগ নিয়ে পাই-মেসনটি প্রোটনের কাছে থাকতে পারে মাত্র $10^{-15}/10^{8}$ বা 10^{-23} সেকেণ্ড। (পাই-মেসনের আয়ু 10^{-8} সেকেণ্ড।) মেসনটি ঐ 10^{-23} সেকেণ্ডের সময়ের মধ্যে প্রোটন নিউট্রনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে দেবে। এই সামান্য সময়ের মধ্যে এতটা ক্রিয়া ঘটে বলে একে বলা হয় গুরু অন্তঃক্রিয়া। গুরু অন্তঃক্রিয়া তড়িৎ-চুম্বকশক্তি থেকে 137 গুণ বেশী শক্তিশালী।

আবার একটি নিউট্রন, প্রোটনের সঙ্গে থাকলে সে স্থায়ী। আর একা থাকলে তার জীবন মাত্র সাড়ে পনের মিনিট। এরপর সে ভেঙে পড়ে একটি প্রোটন, একটি ইলেকট্রন ও একটি নিউটিনোতে। এই যে সাড়ে পনের মিনিটে নিউট্রনের ভেঙে যাওয়া, এটা কণারাজ্যের খুবই দীর্ঘ সময়। এই জাতীয় ক্রিয়া গুরু অন্তঃক্রিয়া বা তড়িৎ-চুম্বকশক্তি থেকে অনেক দুর্বল। চুম্বকশক্তি থেকে 10^{13} গুণ দুর্বল। এর নাম হলো লঘু অন্তঃক্রিয়া।

ঞ. স্পিন ও আইসোটোপ স্পিন

কণাদের স্পিন বা ঘূর্ণি ডিরাকের অঙ্কে ধরা পড়েছিল। এই স্পিনের মুখ হয় অক্ষদণ্ডের উপরে বা নীচে আর পরিমাণ সর্বদা হবে $\frac{1}{2}$।

উপরের স্পিনকে বলা হবে $+\frac{1}{2}$ বা ↑ আর নীচের স্পিন—$\frac{1}{2}$ বা ↓ ; কাজেই স্পিনের দুটো সম্ভাবনা। কোয়ান্টাম গণিতে এটিকে লেখা হবে—

$$2J+1-n$$

এখানে J হলো স্পিনের পরিমাণ আর n হলো সংস্থানের সম্ভাবনা।

নিউক্লিয়নের যে প্রোটন-নিউট্রন – এরা কার্যত এক, তফাত শুধু চার্জের। এখানে ভাবা হলো যে ইলেকট্রনের স্পিনের যেমন একটা তফাত আছে প্রোটন-নিউট্রন অবস্থারও একটা তফাত আছে। প্রোটনের চার্জের অবস্থারও একটা তফাত আছে, প্রোটনের চার্জের অবস্থাটাকে ঘুরিয়ে দেখলেই নিউট্রন পাচ্ছি। এই যে ঘুরিয়ে দেখা এটাও যেন স্পিন, আর একে বলা হলো আইসোটোপিক স্পিন। অঙ্কের সমীকরণে লিখলে এটি লেখা হবে—

$$2I+1=n.$$

এখানে I মানে আইসোটোপিক স্পিন। n-এখানে দুটো অবস্থানের কথা জানাচ্ছে।

অতএব নিউক্লিয়নের আইসোটোপিক স্পিন বা আই-স্পিন হবে $\frac{1}{2}$।

পাই-মেসনের তিন অবস্থা—পজিটিভ, নেগেটিভ ও নিরপেক্ষ। কাজেই এর স্পিন হবে $2I+1=3$ অথবা আই-স্পিন হবে এক।

ট. তিনমূর্তি ও একুশ দফা

কণাদের তিনভাগে ভাগ করা হলো, —লেপটন, মেসন ও বেরিয়ন। এরা আবার একুশ-জন ; লেপটন পাঁচ আর বাকি দু'দল আট-আট ক'রে।

ঠ. কণারাজ্যের নিয়ম কানুন

প্রকৃতির রাজ্যে নিয়মকানুনের অভাব নেই। কণার রাজ্যেও নিয়ম আছে, নিয়ম থাকছে। শক্তি, ভরবেগ আর কৌণিক ভরবেগ—এই তিনটি গুণ পদার্থের গতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে, কণা রাজ্যেও এরা আছে। এরা বাইরের গুণ। কণাদের অন্তর্নিহিত গুণও তিনটি —চার্জ, লেপটন সংখ্যা আর বেরিয়ন সংখ্যা।

এছাড়া কণাদের থাকে স্পিন বা ঘূর্ণি আর আশ্চর্য একটা গুণ যাকে আমরা কৌলীন্য প্রবর সংখ্যা বলেছি, (ইংরেজিতে একে বলা হয় (strangeness number) ; এগুলো ছাড়াও আরেকটা গুণের কথা বলা হয়েছে যাকে বলা হয় হাইপারচার্জ (hypercharge) যে কোনো কণার বেরিয়নের সংখ্যার সঙ্গে প্রবর সংখ্যা যোগ করলে পাওয়া যাবে হাইপারচার্জ।

ড. কণাগড়ার উপকরণ

বেরিয়নের সংখ্যা দেখেছি আটটি—প্রোটন, নিউট্রন, লেমডা কণা, পজিটিভ ও নিরপেক্ষ সিগমা কণা, নেগেটিভ ও নিরপেক্ষ ক্যাসকেড কণা ও ওমেগা কণা। মেসনদের সংখ্যাও আট—পজিটিভ, নেগেটিভ ও নিরপেক্ষ তিন জাতীয় পাইমেসন, পজিটিভ, নেগেটিভ, ও নিরপেক্ষ কে-মেসন—নিরপেক্ষ কে-মেসন আবার দুটি আলাদা কণার সম-মিশ্রণ। এদের বলা হয় *Kos* ও *Kol*। এছাড়া আছে এটা-মেসন।

এই আটের ভাগের কণাগুলো এক বংশের—এক পরিবারের। কিন্তু এদের রুচির পরিবর্তন আছে ; সেটি হাইপারচার্জ, স্পিন ইত্যাদি অন্তর্নিহিত গুণগুলো। এদের যদি ঐ গুণের নিয়ম অনুযায়ী এক কোঠায় বা আইসোটোপ করে সাজানো যায়, তাহলে দেখা যাচ্ছে ঐ বংশের পরিবার দুটো একান্নবর্তী হলেও যেন জলখাবারের বেলা আলাদা হাঁড়ির বন্দোবস্ত করছে। এক বাড়ীতে থেকেও যেন কিছুটা আলাদা।

বেরিয়নদের পরিবারে দেখা যায় চার্জের তফাতে কণাদের ভরের তফাত ঘটে আর হাইপারচার্জের তফাতে পাওয়া যায় তিনটি আলাদা দল।

মেসনদের বেলাও একই ব্যাপার। এখানেও পাওয়া যায় তিনটি দল।

এসব দল গড়ার পর ভাবা হলো, কণাদের উপকরণ কী। আসলে সব কণাকেই

তো একটা পরিবারের রকমফের মনে হচ্ছে ; অতএব এই সাদৃশ্যের একটা মূল উপাদান থাকতে পারে।

সাকাতা (Sakata) বেরিয়ন আর মেসন পরিবারের কণাগুলোর উপাদান ভাবলেন, চার্জ নিরপেক্ষ লেমডা কণা। এই লেমডা কণার ভর বেরিয়নদের দলে প্রায় মাঝামাঝি। এই কণার সঙ্গে নিউক্লিয়ন আর এণ্টি-নিউক্লিয়ন যোগ করে সাকাতা বেরিয়ন -মেসনের যৌগিক কণাগুলোর তৈরির হিসাব দেখাতে পারলেন। মেসন-কণার বেলা দেখা গেল, অঙ্কের হিসাবে সাকাতা তাদের অন্তর্নিহিত গুণগুলো মেলাতে পারলেন ; কিন্তু বেরিয়নের বেলা হাইপারচার্জে গোলমাল। সব বেরিয়নগুলোকে ঠিক এক পরিবারে ফেলা যায় না।

লেমডা কণা অনেক কাজ করল। সবটা কিন্তু পারল না।

ঢ. গৌতম বুদ্ধ ও জেমস জয়েস

আটটি মেসন আর আটটি বেরিয়ন এদের মেলা-মেশার ফলে হেড্রন (hadron) তৈরি হয়। হেড্রন মানে গুরু অন্তঃক্রিয়ার অংশ গ্রহণ করে এমন কণা। এদের ভেবে নিয়ে নেমান (Ne'emen) ও গেলমান (Gellmann) একটা নতুন তত্ত্বের কথা ভাবলেন। একে বলা হলো eightfold theory বা অষ্টাঙ্গমার্গ। গৌতম বুদ্ধ এই অষ্টাঙ্গমার্গ অনুসরণ করে গার্হস্থ্য মানুষকে নির্বাণ বা পরম সত্যের দিকে এগিয়ে যেতে বললেন। গেলমানরাও অষ্টাঙ্গমার্গ ধরে মেসন-বেরিয়নের আটের পরিবারের সৃষ্টির রহস্যটার একটা ব্যাখ্যা দিলেন।

মূলকণার উপাদানের জন্য গেলমান একটা কণার কথা ভাবলেন—যার নাম দিলেন 'কোয়ার্ক'। জেমস জয়েস তার Finnegan's Wake উপন্যাসে একটা আজব জীবের কথা বলেছিলেন, তার নাম দিয়েছিলেন কোয়ার্ক। গেলমান এক আজব কণার কথা ভাবলেন, তাই তার নাম কোয়ার্কই হলো।

মজার কথা, কোয়ার্কের বেরিয়ন সংখ্যা একটা ভগ্নাংশ দাঁড়াল। আবার চার্জের হিসাবে ইলেকট্রনের $\frac{1}{3}$ বা $\frac{2}{3}$। কোয়ার্ক যেন সৃটিতত্ত্বের ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর - এই ত্রয়ীর অংশ !

কণার জগতে উত্তর মিলছে না। এই সাময়িক হেরে যাওয়াটা বিজ্ঞানীরা সহাস্যে মেনে নিলেন। রসিক বিজ্ঞানী আশ্চর্য কণার উপাদান হিসাবে ভাবলেন আশ্চর্যতর এক কণার কথা। মুচকি হেসে তাকে বললেন 'কোয়ার্ক'।

অনিশ্চয়তার জগতে বেড়ালকে যে নামেই ডাকি না কেন - বেড়াল, রুমাল বা চশমা— শেষমেশ গণ্ডগোলের হিসেবে মাথা ঠাণ্ডা করতে তিব্বতে যাবার কথা বেড়ালই জানাবে।

কণার জগতে মাথা গরমের হিসেব, অঙ্ক মেলানোর কায়দাটা কোয়ার্ক জানাচ্ছে— তার ভর অসীম। সেজন্য অদ্রষ্টব্য। হ য ব র ল'র বেড়ালের মতো মুচকি হেসে সে অজানার বেড়ার ওদিকে অদৃশ্য হয়ে আছে।

অথবা, হয়তো কোয়ার্ক কণা ব্যাঙ্গমা পাখির মত সঠিক পথের ঠিকানা জানাবে !

তিন মূর্তির ঘাটে হাজির কণা একুশ জন।
ঘাট পেরিয়ে সামনে মেলে অষ্টমার্গীবন ॥
বনের শেষে ঝাপটা মেরে কল্পলোকের ডানা।
কোয়ার্ক পাখি জানাবে কি পথের নিশানা ?
জানার পথের শেষে আছে অনিশ্চয়ের পাট।
সাত সমুদ্দুর, তের নদী, তেপান্তরের মাঠ ॥
পথ জানা নেই, কেবল খোঁজা পথের তালাশ তত্ত্ব।
পথের শেষে লুকিয়ে ব'সে আদ্যিবুড়ো সত্য ॥
পথ হারাবার দুঃখু কোথায় ? পথ খোঁজাটাই জঙ্গম।
বেড়ার পারে মুচকি হাসে কোয়ার্ক, সে কি ব্যাঙ্গম ?

অনুক্রমণী